মণিমঞ্জরী

যাদের দ্বারা অলংকৃত এই বই

বিমল মিত্র * শংকর * সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
সমরেশ মজুমদার * সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় * বুদ্ধদেব গুহ
বনফুল * আশাপূর্ণাদেবী * প্রফুল্ল রায়
অচিন্ত্য সেনগুপ্ত * নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
প্রেমেন্দ্র মিত্র * গজেন্দ্র কুমার মিত্র * মৈত্রেয়ী
দেবী * ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়।

 উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির ★ কলিকাতা-৭

সূচীপত্র

একটি সন্ধ্যা একটি সকাল

—আশাপূর্ণা দেবী—

ছুরিটা এসে প্রথম বিঁধলো ডানদিকের রগে।

তীক্ষ্ম চকচকে ধারালো।

মাথাটা একটু সরিয়ে নিলো শশাংক। তবু কানের গোড়াটায় বিঁধতেই লাগলো। এবার মাথাটা ঝুঁকিয়ে ফেললো প্রায় টেবিলের কাছ বরাবর, হাতের বইটার থেকে আধফুট মাত্র ব্যবধান থাকলো।

পড়ার একটু অসুবিধে হচ্ছে, তা হোক, তবু নড়েচড়ে উঠে গিয়ে আক্রমণের পথটা বন্ধ করার কথা মনে আনছে না শশাংক।

কিন্তু মাথা হেঁট করেই কি সবসময় নিস্তার পাওয়া যায়? এক্ষেত্রে অন্ততঃ যাচ্ছে না, ছুরিটা এবার এসে শশাংকর হাতের বইয়ের পাতাটা বিঁধছে। সমস্ত অক্ষরগুলো আলোয় ঝাঁ ঝাঁ ক'রে উঠলে পড়া চলে না।

শশাংকর মনে হলো পশ্চিমের জানলা দিয়ে আসা পড়ন্ত বেলার ওই রোদের ছুরিটা ঠিক যেন একটা জ্বালাতুনে মানুষের মতো ব্যবহার করছে। একটু নিশ্চিন্ত শান্তিতে বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকতে দেবে না শশাংককে।

অথচ শশাঙ্কর এই নিরুপায়তাটা হাস্যকর অর্থহীন।

ইচ্ছে করলেই এখুনি উঠে গিয়ে জানলাটা বন্ধ ক'রে দেওয়া যায়, উঠতে ইচ্ছে না করলে চাকরদের কাউকে ডেকে বন্ধ ক'রে দেবার হুকুম দেওয়া যায়, চেয়ারটাকে খানিকটা টেনে নিয়ে সরে বসা যায়।

কিন্তু সে-সবের কিছুই না ক'রে শশাঙ্ক বই থেকে চোখ তুলে এই পশ্চিমের জানলাটার দিকেই রুক্ষদৃষ্টি হেনে ব'সে ব'সে ভাবতে লাগলো, জীবনে সে এর বেশী কিছুই চায়নি। একটি নিরুপদ্রব কোণ, আর নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ একটু অবসরের শান্তি। শুধু এইটুকু পেলেই সারাজীবন কেটে যেতে পারতো আনন্দরসের সমুদ্রে তলিয়ে থেকে।

পৃথিবীতে কত বই।

কত ভালো ভালো বই! একটা জীবনে প'ড়ে ফুরোবার নয়। বইগুলো আয়ত্ত করতে যদি নতুন নতুন ভাষার চাবি হস্তগত করতে হয়, তাতে তো আরও আনন্দ, আরও রোমাঞ্চ!

কিন্তু কোথায় সেই দুর্লভ অবকাশ!

কোথায় সেই নিরুদ্বেগ নিশ্চিন্ততা!

এই পড়ন্ত রোদটা যেমন রগে কপালে কানে বইয়ের পাতায় পর্যন্ত এসে উত্যক্ত করছে। সারাজীবনই কে যেন এমনি ক'রে উত্যক্ত করছে শশাঙ্ককে।

ছেলেবেলায় ?
তখন তীব্র আকর্ষণ ছিল গল্পের বইয়ে।
কিন্তু তাতে কী তীব্র বিরোধিতা ছিল বাবার! ছেলের হাতে অথবা তার টেবিলে শেলফে বালিশের তলায় গল্পের বই দেখেছেন কি হুঙ্কার দিয়ে কেড়ে নিয়েছেন! হয়তো বা শুধু কেড়ে নিয়েই ক্ষান্ত হননি, ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছেন, পরের বই ব'লে মানেননি।
শশাঙ্কর মা এ নিয়ে মৃদু প্রতিবাদ করলে সদর্পে বলেছেন, 'এই ঠিক করলাম, জন্মের মতো শিক্ষা হয়ে যাবে। একে কতকগুলো রাবিশগেলার বদভ্যাস, তার ওপর আবার পরের কাছে চেয়ে ভিক্ষে ক'রে আনার বদভ্যাস! দুটোই সমান খারাপ, এইরকম জব্দ হলেই তবে ওই অভ্যেস ছাড়বে।'
কিন্তু না। বাবার শত চেষ্টাতেও সে অভ্যাসটা ছাড়েনি শশাঙ্ক। উত্তরোত্তর গ্রাসই করেছে তাকে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্যতালিকার গতি বদলেছে, কিন্তু মনের গতি বদলায়নি। অধ্যাপনা তার পেশা, কিন্তু অধ্যয়ন তার শুধু নেশাই নয়, আরো অনেক কিছু।
এইটা টের পেয়ে ফেলেছে বলেই বুঝি সোনালীরও শশাঙ্কর এই গ্রন্থজগৎটার ওপর এত আক্রোশ। কিন্তু সোনালীর আক্রোশ শশাঙ্কর বাবার মতো তীব্র বিরোধিতার বেশে দেখা দেয় না, দেখা দেয় ব্যঙ্গ আর অবজ্ঞার মূর্তিতে।
শশাঙ্ককে সে 'বইপোকা' ব'লে সম্বোধন করে। কৌতুকের হাসি দিয়ে নয়, তিক্ত রসাস্বাদিত ব্যঙ্গের হাসি দিয়ে।
এমনিতেই সোনালীর ঠোঁটের গড়নটাই যেন ঈষৎ বাঁকারেখায় রহস্যময়, তার উপর— আঃ, রোদটা ভেবেছে কী!
যাবার আগে মরণকামড় দিয়ে যেতে চাইছে বুঝি! নইলে আবার কোন্ কোনাচে পথ দিয়ে ফের এসে বাঁ রগটায় বিঁধছে।
আশ্চর্য্য! এই এতক্ষণের মধ্যে বাড়ীর কারুর কি একবার এ ঘরে আসতে নেই? একটা চাকরবাকর কিম্বা···না, সোনালীর কথা ভাবছেনা শশাঙ্ক, ভাববার প্রশ্নই ওঠেনা। সোনালী এতক্ষণে তার টেনিস র‍্যাকেট ঘোরাতে ঘোরাতে কখন্ চলে গেছে নিজেহাতে ড্রাইভ ক'রে।
হ্যাঁ, বিকেলে খেলতে যাবার সময় কি বেড়াতে যাবার সময় নিজেই ড্রাইভ করে সোনালী, বলে, এ সময় ড্রাইভারের উপস্থিতিটাই তার বিরক্তিকর। অনেকক্ষণ ধ'রে চোখের সামনে একটা বুড়ো শিখের ঘাড় পিঠ আর পাগড়ী দেখতে রাজী নয় সে।
পশ্চিমের ওই জানলাটা দিয়েই সোনালীর গতিবিধিটা দেখতে পাওয়া যায়। ওই দিকটাই বাড়ীর গেট।
কে জানে কখন্ চলে গেছে সোনালী, হয়তো পশ্চিম আকাশটা লালচে হয়ে ওঠবার অনেক আগেই! কিন্তু একটাও চাকরবাকর কেন আসছে না এ ঘরে?
শশাঙ্কর কি একবার তেষ্টা পেতেও পারে না? চেঁচিয়ে কাউকে ডাকতে ইচ্ছে হলো শশাঙ্কর। যেমন ক'রে সোনালী ডাকে অনন্তকে, বীরসিংকে, 'আছো কোথায় তোমরা? কালা হয়ে ব'সে আছো? সব কাজ ব'লে ব'লে তবে করাতে হবে, নিজেদের ডিউটি সম্বন্ধে জ্ঞান নেই?'

না, শশাঙ্কর সে সাধ্য নেই।

চেঁচিয়ে কাউকে ডাকা শশাঙ্কর সাধ্যের বাইরে। নিজের গলার শব্দ নিজেই ভালো ক'রে চেনে না শশাঙ্ক। তবু ওর ইচ্ছে হচ্ছিল এই মুহূর্তে কেউ এ ঘরে আসুক, অনন্ত কি বীরসিং, নিদেনপক্ষে ঠাকুর। জানলা দিয়ে রোদ আসা নিয়ে তাকেই ব'কে উঠবে শশাঙ্ক।

কিন্তু গেটের সামনে গাড়ীটা এসে দাঁড়িয়েছে কখন্? সোজাসুজি রোদের দিকে তাকিয়েই ভুরু কুঁচকে দেখলো শশাঙ্ক, হ্যাঁ তারই—মানে, তাদেরই গাড়ী। সোনালী তাহ'লে এখনো বেরোয়নি। তার মানে আর একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেই সোনালীকে দেখতে প্াওয়া যাবে। সেই তার চকচকে ঝকঝকে আঁটসাঁট শরীরটা বেরিয়ে আসবে বাড়ীর মধ্যে থেকে, ছোট্ট 'লন'টুকু মুহূর্তে পার হয়ে গাড়ীটার কাছে এসে একবার দাঁড়াবে। আর একবার চোখ তুলে দোতলার জানলার দিকে তাকাবে সে।

এটা নিয়ম।

রোজই তাকায়, টেবিলের ধারে চেয়ারে ব'সে বসেই দেখতে পায় শশাঙ্ক, আর দেখার পর মনে হয়, বোধহয় জানালায় কাউকে আশা করে সোনালী।

কাকে? শশাঙ্ককে? তাছাড়া আর কে আছে বাড়ীতে? অন্ততঃ আশা করবার মতো কে আছে?

কিন্তু কেন? এতবড় দিনটায় একই বাড়ীতে থেকেও স্বেচ্ছায় যে একবারও শশাঙ্কর সঙ্গে চোখাচোখি হবার ক্লেশটুকু স্বীকার করতে চায় না, সে কেন এ আশা করতে যাবে? দেখা এক একদিন সমস্ত দিনে-রাতেই হয় না। দু'জনের গতিবিধি আলাদা ঘুমের সময় আলাদা। রাতের খাওয়াটা একসঙ্গে বটে, তাও সবদিন নয়।

আশ্চর্য্য অঘটন ঘটলো।

সামনের ওই দূর রাস্তায় দেখা নয়, এই ঘরের মধ্যেই পিছনের দরজা দিয়ে এসে প্রবেশ করলো সোনালীর প্রসাধন মার্জ্জিত আঁটসাঁট ছিপছিপে শরীরটি।

সঙ্গে সঙ্গে একটা বিরক্ত কণ্ঠস্বরও ছড়িয়ে পড়লো ঘরের হাওয়ায়, 'পড়ন্ত রোদটার মুখ দিয়ে ব'সে আছো যে?'

শশাঙ্ক চমকে ঘাড় ফিরিয়ে অপ্রতিভ হাসি হাসলো—'এমনি!'

'এমনি! বাঃ, চমৎকার! তার মানে, উঠে জানলাটা বন্ধ ক'রে দেওয়া তো দূরে থাক, একটু স'রে বসবারও ক্ষমতা হয়নি, কেমন? তা বইয়ের মধ্যেও তো ডুবে ছিলে না যে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে গিয়েছিলে, রাস্তায় কি দেখছিলে হাঁ ক'রে?'

শশাঙ্ক এবার মৃদু হাসে। হেসে বলে, 'হাঁ ক'রে দেখার মতো জিনিসের কি অভাব আছে জগতে?'

হুঁ, কথাবার্ত্তা তো বেশ ভালোই শিখছো ক্রমশঃ। ব্যাপারটা কি?'

আমিও তোমাকে ওই প্রশ্নই করবো ভাবছিলাম, ব্যাপারটা কি? এ সময় বাড়ীতে? আবার এ ঘরে?'

সোনালী তার গাঢ় রঙে ছোপানো ভুরু দুটো কুঁচকে বলে, 'কেন, আমি কি কখনো আসিনা এ ঘরে?'

ওকথা থাক্। আজ কি জন্যে?'

কেন, কারণ না থাকলে নিজের বরের ঘরে আসতে নেই?

শশাঙ্ক একবার মুখ তুলে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালো, তারপর মৃদু হেসে হাতের বইখানাতেই চোখ রাখলো।
রোদের সেই ছুরির ধারটা আর নেই, লালচে হয়ে এসেছে। আকাশ কত তাড়াতাড়ি বদলায়!
'শোনো, কিছু টাকা চাই।'
'জানতাম।' আর একবার মৃদু হাসলো শশাঙ্ক।
সোনালীর মুখটা একবার একটু বিবর্ণ দেখালো, একটু বা বিপন্ন, তারপরই সামলে নিলো সে। তীব্র কণ্ঠে ব'লে উঠলো, 'জানাই স্বাভাবিক। আর কোনও সম্পর্ক তো নেই দু'জনের মধ্যে! কেন, বেরিয়ে পড়তে পারো না আমার সঙ্গে? খোলা আকাশের নীচে, পৃথিবীর আলোয়। যেখানে মানুষ থাকে, জলজ্যান্ত রক্তমাংসের মানুষ।'
শশাঙ্ক বিব্রতভাবে বলে, 'ছুটি ফুরিয়ে আসছে পড়াটড়া তো তেমন কিছুই হলো না··'
'তেমন কিছুই হলো না!' প্রশ্ন নয়, ধিক্কার নয়, বিস্ময় নয়, বিস্ময় প্রকাশ নয়, যেন একটা যান্ত্রিক শব্দ উচ্চারিত হলো, 'তেমন কিছুই হলো না! এই দু'দুটো মাস গরমের ছুটি গেল, একখানা খাতা দেখার কাজ পর্যন্ত নিলে না, একবারের জন্যে বাড়ী থেকে বেরোও না, সারাদিন এই বই-ভ্যাপ্‌সা গুমোটি ঘরের মধ্যে প'ড়ে আছো, তবু আশ মেটেনা, তবু পড়া হয় না! আশ্চর্য! যাক্, আমার কিছুতেই কিছু এসে যায় না। পড়ো, আরও পড়ো, প'ড়ে প'ড়ে চোখের নার্ভগুলো ভস্ম ক'রে ফেলো, তারপর চিরতরে পড়ার ক্ষমতা ঘুচে যাক্, মন্দ কি?'
'শাপ দিচ্ছো?'
'পারলে দিতাম। কিন্তু এটা শাপ নয়, শুধু ভবিষ্যৎ পরিণতির ছবিটা চোখের সামনে তুলে ধরা। বইপোকাদের ওই অবস্থাই ঘটে। যাক্, এই ব'লে যাই, নীপার মেয়ের জন্মদিনের নেমতন্ন করেছিল তাই যাচ্ছি। গোটা পঞ্চাশ টাকা দাও, যাবার সময় একটা প্রেজেনটেশন—'
এতক্ষণে শশাঙ্ক কথা বলে।
অথবা এতক্ষণে কথা বলার অবকাশ পায়। তাই বলে, 'টাকার জন্যে সবসময় অসুবিধে পাবার হেতু কি? সব টাকাকড়ি তুমিই রাখো না?'
'নাঃ' ঝিলিক্ দিয়ে ওঠে সোনালী, 'ও আমার ভালো লাগে না। কোথা থেকে তোমার টাকা আসছে, কখন্ তোমার কোন্ বাড়ীর ভাড়াটে ভাড়া দিচ্ছে না, আর কখন্ কোন্ বাড়ীর ভাড়াটে উঠে যাচ্ছে, এইসব হিসেবও তো রাখতে হবে তাহ'লে? উঃ বাপ্‌স্! তাছাড়া এই তোমার সংসারের তেল নুন লকড়ির হিসেব! রক্ষে করো। ওসবের মধ্যে আমি নেই। আমার দরকারমত পেলেই হলো।'
শশাঙ্ক কি কষ্টে একটা রূঢ় কথা সংবরণ ক'রে নিলো? কে জানে! তবে কথা যা বললো সেটা মোলায়েমই।
'এমনও তো হ'তে পারে—দরকার মতো সময়ে আর পাওয়া যাচ্ছে না।'
'তার মানে?'
'মানে অন্য কিছু নয়। জানো তো আমাদের কলুটোলার বাড়ীদুটোর যা অবস্থা

হয়েছিল, এইবেলা মেরামত না করলে কর্পোরেশন থেকে কোন্‌দিন ভেঙে দিয়ে যেতো, তাই ভাড়াটে তুলিয়ে দিয়ে মেরামত করানো হচ্ছে। ওতেই তো মাসে সাড়ে চারশো ক'রে টাকা—'

'তোমার ওইসব দৈন্যদশার কথাগুলো আমার কাছে না বললেই বাধিত হবো। ওসব শোনবার রুচি নেই আমার। দিতে না পারো তো বলো বাইরে কারো কাছ থেকে নিয়ে নিচ্ছি আপাততঃ—'

শশাঙ্ক সহসা একটু দৃঢ় হয়ে উঠলো। বুঝি বা একটু রুক্ষও, 'এই ধরনের কথা তুমিও আমার সামনে না বললেই বাধিত হবো। ধার করাকে আমি কত ঘৃণা করি সেকথা তুমি জানো না তা নয়, তবু—'

'তবু বাধ্য হয়েই করতে হয়, উপায় কি! ধারকে ঘৃণা আমিও কম করি না! কিন্তু প্রয়োজনের সময় নিজের ঘর থেকে না পেলে—'

'প্রয়োজনের পরিধি অবিরত বাড়িয়ে চললে এরকম অভাবও তো মুহুর্মুহু দেখা দেবে।'

সহসা একটু গুম্‌ হয়ে যায় সোনালী, তারপর তিক্তকণ্ঠে ব'লে ওঠে, 'তবে তুমি কি চাও? মানুষের জীবনে প্রয়োজনের সীমা উত্তরোত্তর সংকীর্ণ হয়ে আসবে? তা তোমার মতো ঘরকুনো বইপোকার উপযুক্ত কথাই বলেছো। কিন্তু আমাকে দিয়ে তা হবে না, বুঝেছো? আমি সামাজিক জীব, আমার মানসম্ভ্রম আছে, লোকসমাজে মুখ রাখার দায় আছে, ইচ্ছে বাসনা সখ সাধ আছে—'

শশাঙ্ক হাতের ইসারায় কথাটা থামিয়ে দিয়ে গম্ভীরহাস্যে বলে, 'দ্যাখো ড্রয়ারটা খুলে, এত চাহিদা মেটানোর যোগ্যতা ওর আছে কিনা।'

হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে একটা চাবি ঠেলে দেয় শশাঙ্ক বইয়ের স্তূপের খাঁজ থেকে।

মুহূর্তে সামনের ড্রয়ারটা খুলে ফেলে দ্রুত অসহিষ্ণু হাতে সবকিছু ওলট-পালট ক'রে একটা একশো টাকার নোট তুলে নিয়ে ড্রয়ারটা ফের একধাক্কায় ঠেলে বন্ধ ক'রে দিয়ে সোনালী চলতিমুখো হয়ে বলে, 'খুচরো দেখছিনা, আস্তটাই নিলাম, যাচ্ছি তাহ'লে।'

'দিলীপকে নিচ্ছোনা?'

'নাঃ।'

নীপার বাড়ী তো সেই দমদমের কাছে। ফিরতে রাত হবে অবশ্যই, অত রাত্রে একা আসার চাইতে—'

'না, না।' অসহিষ্ণু কণ্ঠে ঝংকার তোলে সোনালী, 'একা ব'লে দরদ দেখাবার কোনো দরকার নেই। নেমন্তন্ন নীপা আমায় একা করেনি, তোমাকেও করেছিল।'

'আমাকে! আমি কি কোথাও যাই?'

'যাওনা, সেটা বাহাদুরীর কিছু নয়। থাক, এ নিয়ে অনেকদিন অনেক তর্ক হয়ে গেছে, কতকগুলো কথার সৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই হয়নি।'

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল সোনালী, আর বেরিয়ে গিয়েও সহসা আবার ফিরে এসে ব'লে উঠলো, 'জানি দেরী হলেও ব'সে ব'সে ভাববেনা, তবু ব'লে যাচ্ছি, বেশী রাত হতে পারে। অথবা একেবারে না ফিরতেও পারি।'

'না ফিরতেও পারি।'
শশাঙ্কর কথাতেও প্রশ্নের সুর ফুটলো না, না বা ফুটলো বিস্ময়েরও ও শুধু সোনালীর বলা কথাটাই আবার উচ্চারণ করলো।
'হ্যাঁ।' সোনালীর মুখে একটা তিক্তব্যঙ্গের হাসি ফুটে উঠলো, 'তোমার কাছে তুচ্ছ হ'তে' পারি, কিন্তু এখনো একটু কৃপাকটাক্ষে ধন্য হয়ে যায় এমন লোকেরও অভাব নেই জগতে। সেই জগৎটা যাচাই করতে বেরোব ভাবছি।'
গট্‌গট্‌ ক'রে বেরিয়ে গেল এবার সোনালী। সত্যিই গেল।

গাড়ীতে কেউ নেই হাত তুলে চোখ মোছবার দায় নেই, কিন্তু তপ্ত একটা অশ্রুবাষ্পে চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে।
কী লজ্জা, কী অপমান!
নেমতন্ন বাড়ীতে সবাই যাবে যুগলে, শুধু সোনালীকেই যেতে হবে বিধবার মতো একাকিনী। যখন যেখানে যাবে, এই এক পদ্ধতি। সাধারণ নিয়মের ধার ধারবার দায় নেই শশাঙ্কর, তার একমাত্র যুক্তি সবাই তো জানে আমি এইরকমই।'
আমি উৎকট, আমি অদ্ভুত, আমি অস্বাভাবিক—এইটা কি একটা যুক্তি?
প্রথম প্রথম রেগে কেঁদে ঝগড়া ক'রে কোথাও কোথাও সঙ্গে যেতে বাধ্য করেছে শশাঙ্ককে, কিন্তু নিয়ে গিয়ে পাঁচজনের মাঝখানে শশাঙ্কের আড়ষ্ট আড়ষ্ট বন্ধন-দশাগ্রস্ত ভাব শুধু লজ্জাই দিয়েছে সোনালীকে। অতএব সে চেষ্টা ত্যাগ করতে হয়েছে।
সোনালীর জন্যে ভাবনার শেষ নেই বাবুর! ওঃ!
অতমকা একটা রাগের উত্তাপে চোখের জল শুকিয়ে উঠলো, কর্ত্তব্যের মধ্যে কি? না, রাতে একা ফেরার বিপদ কল্পনা ক'রে ড্রাইভারকে সঙ্গে নেবার অনুরোধ। এইতেই আরও হাড় জ্বলে যায় সোনালীর। হলেও দিলীপসিং বয়স্ক লোকটার ভাবভঙ্গী ভালো লাগে না সোনালীর, চোখের চাউনিটাও যেন কেমন ধূর্ত্ত ধূর্ত্ত। হ'তে পারে এটা সোনালীর ভুল ধারণা, কিন্তু ভুল জেনেও কি বদ্ধমূল একটা ধারণার মূল উৎপাটন করা সহজ?
কিন্তু মনের ভয়কে প্রকাশ করা চলে না। সেটা খেলোমি। তাই সোনালী শশাঙ্কর কাছে অকারণ আপত্তি তুলে জানায়—'চোখের সামনে বুড়ো শিখটার পাগড়ীপড়া মাথাটা বেশীক্ষণ বরদাস্ত করতে পারি না।'
গাড়ী চলছে, চলছে চিন্তার ধারা। দ্রুত উদ্দাম। সোনালীর ভাগ্যে সুখের সমস্ত উপকরণ মজুত থাকতেও সুখ নেই। এই তো এখুনি নিমন্ত্রণ বাড়ীতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই স্পষ্ট প্রকট হয়ে উঠবে সেই দৈন্য। যারা প্রত্যেকেই ভালো ক'রে জানে 'শশাঙ্ক ওইরকম', তারাও পরম অমায়িকমুখে হাসিচাপা সহানুভূতিতে বিগলিত হয়ে ব'লে উঠবে, 'ওমা, এলো না! আজও এলো না! আশ্চর্য!'
সোনালীর ইচ্ছে করে সেও ব'লে ওঠে, 'আশ্চর্য, আজও তোমরা আশ্চর্য হও, কিন্তু পারে না। গলা বুজে আসে। সেই বোজা বোজা গলায় যাহোক একটা কৈফিয়ৎ দিয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে বসে সেই সভায়, যেখানে প্রায়শঃই যুগল ছবি।
বাচ্ছা ছেলেমেয়েদের নিয়ে নিমন্ত্রণ বাড়ীতে আসার ফ্যাসান আর নেই, ভাইবোন মা

ইত্যাদির প্রশ্ন তো উঠেই না, নিতান্ত যে বেচারা জোড়ভাঙা, সে বাদে সকলেই জোড়ে আসেন। আর সেই হেন সভায় সোনালী তার অসামান্য রূপ, অটুট বয়েস, আর অনবদ্য সাজ নিয়ে ব'সে ব'সে নিষ্ফল আক্রোশে জ্বলতে থাকে। তবু আসেও তো!

নিজেকে নিজে অনেক সময় এ প্রশ্ন করেছে সোনালী, 'কেন আমি যাই? শুধু খানিকটা দাহ ছাড়া আর কিছুই তো সঞ্চয় হয় না, তবে কেন যাই লোকসমাজে?' এর উত্তর স্পষ্ট হয় না।

প্রতিজ্ঞা করে, আর কোথাও যাবে না, কিন্তু না গিয়েও পারে না। লোকসমাজ তাকে দুর্নিবার আকর্ষণে টানতে থাকে।

আঃ, কি বিশ্রী জায়গাতেই বাড়ী করেছে নীপা!

লোকালয় ছাড়িয়ে গাড়ী যাচ্ছে এখন পথের দু'ধারে ঝোপঝাড় গাছপালা মাঠ জঙ্গলকে রেখে রেখে। মাঝখানে অনেকখানি পথ এইরকমই চলবে, আবার ওদিকে জনবসতি, ভালো ভালো নতুন বাড়ী। যেরকম একখানি বাড়ীর মালিক আজ সোনালীর বাল্যবান্ধবী নীপা।

সোনালীর শ্বশুরের অনেক বাড়ী!

তিনচারটে ভাড়া খাটে, একটাতে বাস করে সোনালীরা। সব থেকে ভালোটাতেই করে, তবু একসময় হতাশ নিশ্বাস পড়ে সোনালীর, নিজের পছন্দমতন ছবির মতো সুন্দর নতুন একটা বাড়ী সে কখনো করতে পারবে না। হয়তো বা তেমন একটা বাড়ী তৈরি করতে পারলে, নতুন ধাঁচে আর নতুন নতুন আসবাবে তাকে সাজাতে পারলে, শশাঙ্ককেও খানিকটা নতুন ক'রে তুলতে পারতো সোনালী। পুরনো অভ্যাসের খাঁজে খাঁজে খাপ খেয়ে যাওয়া ওর স্তিমিত চেতনাকে নাড়া দিয়ে ধাক্কা দিয়ে খানিকটা প্রাণবন্ত ক'রে তুলতে পারতো। কিন্তু তা হবার নয়। এই বাড়ীটাই শুধু দামী নয়, রাস্তাটাও কলকাতার সেরা রাস্তার একটি। কিসের অজুহাত সৃষ্টি করা যায়? অতএব এখানেই কাটাতে হবে সোনালীকে মরণাবধি।

কাটাতে হবে ওই গাঢ় গাঢ় মেহগিনীরঙা বহু বাহুল্য কারুকার্য খচিত আসবাবপত্রের মাঝখানে ওই বইপোকা মানুষটাকে নিয়ে। কত আর ছুটে ছুটে অন্যখান থেকে আহরণ করতে যাবে জীবনের রূপ রস রঙ!

সহসা একটা ধিক্কারের আলোড়নে মনটা উত্তাল হয়ে উঠলো, সহসাই মনে হলো, মানুষের এত নিরুপায়তা কিসে? হাতপা-ওলা আস্ত একটা মানুষের?

আকাশে তখনও আলো, কিন্তু মাঠের ঝোপেঝাড়ে অন্ধকার নেমেছে, ভ'রে যাবে আকাশটাও। টানা বড় রাস্তাটায় খানিক খানিক ব্যবধানে আলোর ব্যবস্থা, কিন্তু বড়রাস্তা ছাড়িয়ে যেদিক সেদিকে ইচ্ছে ওই আলভাঙা মেঠো রাস্তায় গিয়ে পড়লে?

একটা মানুষের হারিয়ে যাওয়া কি এতই কঠিন?

ধরিয়ে দেবে গাড়ীর নম্বর? হারিয়ে যেতে দেবে না? গাড়ীটাই যদি ত্যাগ করা যায়?

দুরন্ত অভিমান বুদ্ধিবৃত্তি আচ্ছন্ন ক'রে দিতে চাইছে।

দমদমের কাছে নীপার বাড়ী। সেই কাছ ছাড়িয়ে আরও অনেকদূর ছাড়িয়ে চলে

গেলে ক্ষতি কি ?
অন্ততঃ এই উত্তপ্ত মন নিয়ে চট্ ক'রে এক্ষুনি নিমন্ত্রণ বাড়ী ঢুকতে ইচ্ছে করছে না। তাছাড়া সবচেয়ে অসুবিধের ব্যাপার বটুয়ার মধ্যে সেই একশো টাকার নোটখানা অভঙ্গ অবস্থাতেই রয়ে গেছে, কিছু কিনে নেওয়া হয়নি। খেয়াল হয়নি।
এখন এই লোকালয়শূন্য জায়গায় কোথায় কি ? অথচ উপহারশূন্য হাতে উৎসব বাড়ীতে ঢোকাও তো অসম্ভব !
জীবনে একবার বেপরোয়া হয়ে দেখলে কী হয় ?
গাড়ীর স্পীডটা বাড়িয়ে দিলো সোনালী। বেপরোয়া বেগে।
তেল আছে, অনেক তেল !

তেল নেই ! এক ফোঁটাও না। টিনটা কাৎ ক'রে উপুড় ক'রে, ঝাঁকিয়ে, কোনো প্রকারেরই একফোঁটা বার করা গেল না।
মুখখানা পেঁচার মতন ক'রে মিনিট দুই ব'সে রইলো অনন্ত, তারপর উঠে পড়লো দুমদুম্ ক'রে। ভালো এক জ্বালা হয়েছে তার ! পুরনো ঠাকুরটা চলে গিয়ে পর্যন্ত তার ঘাড়ে পড়েছে ভাঁড়ারের তদারকী। নতুন ঠাকুরতো উজবুকের রা না। রোজ রোজ কে এত হিসেব রাখে—কখন্ তেল ফুরোলো, আর কখন্ চিনি ফুরোলো ! শুধু হিসেব রাখাই তো নয়, বাবুর কাছ থেকে টাকা চেয়ে এনে আবার জোগান রাখা।
অনাছিস্টি ছিষ্টিছাড়া এই সংসার ! অনন্তর এত বন্ধুবান্ধব আছে, তার মনিব বাড়ীর মতন মনিববাড়ী কারুর নয়। বাড়ীর যিনি গিন্নী তিনি যেন কুটুম্ব, যেন স্বর্গের পরী। তাঁর পান থেকে চুণটি খসবার জো নেই, তারপর তোমাদের যাহয় হোক। ভাঁড়ারের 'আছে নেই' বলতে গেলেই তিনি নাক কুঁচকে বলেন, 'ওসব কথা আমায় বলতে এসেছো কেন ?
এ আবার কেমন আদিখ্যেতা, ভগবান জানেন। বাড়ীর গিন্নী, উনি রাতদিন সাজবেন গুজবেন আর হাওয়াগাড়ী নিয়ে হাওয়া হয়ে যাবেন। ধন্যবাদ !
বাড়ীর কর্তা অবিশ্যি গঙ্গাজল, কিন্তু বই কেতাব নিয়ে ব'সে থাকা মানুষটার কাছে গিয়ে 'টাকা দাও, টাকা দাও' ক'রে উৎপাত করতে লজ্জা করে না ?
টাকার হিসেব ওঁকে দিতে হয় না সত্যি, সেদিকে সুবিধে অনেক. তবু এক সময় ভারী বেজার লাগে অনন্তর। কেন রে বাপু, অনন্তরই বা যত দায় কেন ?
পুরনো ঠাকুর একেবারে সংসার খরচের মাসের টাকা নিয়ে নিতো ! তার থেকে কত গুছিয়েই নিলো লোকটা ! দেশে জমি-জমা চাষবাস মাছের পুকুর ! দু'দুটো মেয়ের বিয়েও দিয়ে ফেলেছে !
অনন্তকে তো কই পুরো মাসের মাসকাবারি টাকা দিয়ে দেয় না বাবু ! বিশ্বাস নেই, না অভ্যাস নেই ? যা থাকে কুল-কপালে, আজ অনন্ত সেই প্রস্তাব ক'রে বসবে। যতদিন না ঠাকুর দেশ থেকে আসছে !
এ বাড়ীর না আছে বাপ, না আছে মা, না আছে ছাদ, না আছে মাটি। এ সংসারে

কাজ করা ঝকমারি !

ঠাকুরের মুখেও সব শোনা, বাবুর মা যখন বেঁচেছিলেন, তখন নাকি সোনার সংসার ছিল। মাইনে-করা লোকজন ভাঁড়ার ঘরে ঢুকতেই পেতো না। গিন্নী নিজে স্নানান্তে তসর-গরদ প'রে তবে ভাঁড়ারে ঢুকতেন। তা সেও ভালো ছিল, সংসারে লক্ষ্মীশ্রী ছিল।
কিন্তু এ কী! সংসার, না মেসবাড়ী! মেয়েমানুষ অলক্ষ্মী হলে কি আর সংসারের আঁটবাঁধ থাকে? আমি তো ওনাদের সোনার সংসারের আমলের নই, তবু এ ভুতুড়ে বাড়ীতে থাকতে ইচ্ছে করে না। বামুন-ঠাকুরের মতন অনন্তর অমন শুধু 'পয়সা গুরু, পয়সা ইষ্ট' নয়।
তাছাড়া সংসারের গিন্নীকর্ত্তার কড়া হুঁসিয়ার চোখের ওপর দিয়ে দু'পয়সা হাতাতে পারলে তবেই না স্ফূর্ত্তি! এ কী বাবা, সমুদ্দুর শুষলেও কেউ তাকিয়ে দেখবার নেই। দশ টাকার নোট ভাঙিয়ে তিন টাকার জিনিস কিনে বাকী সাত টাকা ফেরত না দিলেও কেউ বলবে না, 'সে টাকাটা কই?'
এরকম জায়গায় টাকা সরাতে যেন গা ছমছম্ করে। নিজেকে পাষণ্ড পাষণ্ড লাগে। এমন সংসারে থেকে নিয়েও সুখ নেই, খেয়েও সুখ নেই।

তেলের টিনটা ঠক্ ক'রে বসানোর শব্দে নতুন ঠাকুর চমকে উঠলো, তারপর অনন্তকে দুমদুম্ ক'রে দোতলায় উঠে যেতে দেখে, ব্যাপার বুঝে নিশ্বাস ফেলে মনে মনে ভাবলো, অনন্তটা আছে ভালো! আহা, অনন্ত যদি একবার দেশে যেতো!
উজবুকের রাজা হলেও পয়সা সরানোর ব্যাপারটা বোঝে না এমন নয়!
অনন্ত এসে ঘরের আলোটা জেলে দিতেই চমকে উঠলো শশাঙ্ক!
কী আশ্চর্য্য, এতক্ষণ সে অন্ধকারে বসেছিল? হাতের বইটা হাতেই ধ'রে?
কিন্তু কতক্ষণ? কই, মনে তো পড়ছে না কী ভাবছে এতক্ষণ ধ'রে? কোনো কিছুই ভেবেছে?
'বাবুর কি মাথা ধরেছে?
অনন্তর অপ্রতিভ কণ্ঠের প্রশ্নে আর-একবার চমকালো শশাঙ্ক, 'কেন, মাথা ধরবে কেন? কে বলেছে মাথা ধরেছে?'
'আজ্ঞে, অন্ধকারে রয়েছিলেন তাই'।
'ওঃ তাই। তা তুই আর লোকের বাড়ী ঘরমোছা বাজার করার চাকরি করছিস কেন, যা না ডাক্তারী করগে না, পশার হবে।'
'ডাক্তারী!'
'না তো কি। এত সহজে যখন রোগলক্ষণ বুঝে ফেলিস। কিন্তু এখন আগমনের হেতু?'
'আজ্ঞে বাবু কি বলছেন?'
'বলছি—কি চাই?'
অনন্ত মাথা নীচু ক'রে ঘাড়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলে, 'আজ্ঞে তেল ফুরিয়েছে তাই—'

তেল ফুরিয়েছে! কি বিশ্রী, কী কদর্য্য, কী কটু! শব্দজগতে এর চাইতে কুৎসিত শব্দ আর আছে?

শশাঙ্কর মনে হয়, এর চাইতে কদর্য্য শব্দও আর নেই, আর শশাঙ্কর মতো হতভাগাও বুঝি জগতে আর নেই! সত্যি, এমন কোনো বিবাহিত হতভাগা আছে, যাকে জটিলতম কোনো দার্শনিক চিন্তার মাঝখানে সহসা শুনতে হয় 'তেল ফুরিয়েছে'!

সংসারে অবিরত তেল ফুরোয়, চিনি ফুরোয়, আটা ফুরোয় ময়দা ফুরোয়, হলুদ পাঁচফোড়ন লঙ্কা, সর্ষে, ফুরোয়, শুধু ফুরোয় না মানুষের সংসার করার বাসনা।

নিজের ওপর ভয়ঙ্কর রাগ হয় শশাঙ্কর। কেন সে মার একটু চোখের জল একটু আক্ষেপোক্তিতে ভুলে এই অলাতচক্রের ফাঁদে পা দিয়েছিল!

শুধু সে একা থাকলে একরাশ টাকা ওই বামুনচাকরগুলোর হাতে ধ'রে দিয়ে বলতে পারতো, 'যা, যা খুসি করগে যা। শুধু আমায় দু'বেলা দুটি খেতে দিবি এই শর্ত, ব্যস্। জ্বালাতন করতে আসবি তো পিটুনী খাবি।'

কিন্তু তা হলো না।

এখন বারবার আয় ব্যয়ের হিসেব দেখতে হয়। নইলে সোনালীর সব চাহিদা মিটিয়ে ওঠা শক্ত হয়ে ওঠে।

এ নিয়ে অনেক তর্ক হয়ে গেছে সোনালীর সঙ্গে। সে সাফ্ জবাব দেয়, 'আমারও ওসব ভালো লাগে না। আমারও অসহ্য ওই হলুদ, পাঁচফোড়ন, আলু, মাছ। তোমার যাতে বিরক্তি আসে আমারই বা তাতে আনন্দ আসবে ভাবছো কেন? আমি পারবো না, আমার দায় কিসের?'

গৃহের গৃহিণী যদি বলে, 'আমার দায় কিসের?' কতক্ষণই বা তর্ক চালানো যায় তার সঙ্গে? অথচ মাঝে মাঝেই সে হেসে হেসে বলে, 'তোমার সংসারের ম্যানেজারী ক'রে ক'রে তোমার বামুন-ঠাকুর তো দেশে জমিদারী ক'রে ফেললো!'

'সেটাই স্বাভাবিক', বলে শশাঙ্ক গম্ভীর মুখে।

সোনালী নাক বেঁকিয়ে বলে, 'তা বটে। শুধু আমি টাকার কথা বললেই মুখ শুকিয়ে যায়। ঠাকুরের কত দেশভাই বারোমাস এখানে এসে রামরাজত্বে থাকে, সন্ধান রাখো?'

'ওটা আমার সন্ধান রাখার কথা নয়।'

কথায় কথা বেড়ে উঠেছে, শেষ পর্যন্ত শশাঙ্ককেই থেমে যেতে হয়েছে।

নোটে টাকায় খুচরোয় মুঠো ভর্ত্তি ক'রে অনন্তর দিকে বাড়িয়ে ধরে শশাঙ্ক, 'এই নাও, হবে এতে?'

অনন্ত হাত বাড়ায় না, ভারী মুখে বলে, 'আমাব ওপর রাগ করছেন কেন বাবু? আমার কি দোষ?'

'রাগ? তোর ওপর রাগ করছি', হেসে উঠলো শশাঙ্ক, 'রাগ জিনিসটা কি এতই সস্তা রে অনন্ত?'

'এসব ঝামেলা আমার ভালো লাগে না বাবু।'

'কিসব ঝামেলা রে?'

'এই এটা নেই ওটা নেই, আনতে হবে, পয়সা চাইতে হবে! মা কিছু দেখবেন না।'
'আর টাকার দরকার আছে তোমার?'
অনন্ত সহসা এই গম্ভীর কণ্ঠের ব্যঙ্গে থতমত খেয়ে টাকাগুলো নিয়ে অনুচ্চকণ্ঠে গজ গজ্ করতে করতে চলে গেল।
'চমৎকার সংসার করছি আমি!' মনে মনে বললো শশাঙ্ক। তারপর ভাবলো 'আর সব লোকেদের মতন হতে পারি না আমি? সোনালী যেমন চায়? সোনালীর জামাইবাবুর মতন রোজ সকালে বাজারে গিয়ে বেছে বেছে মাছ তরকারি—
টেলিফোনটা বেজে উঠলো।
বাঁচা গেল, ওই বিদঘুটে কল্পনাটার হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল আপাততঃ। উঃ, কী ক'রে যে মানুষ ইচ্ছে সুখে বাজার যায়।
'কে?'
'আমি নীপা—কথা বলছি। সোনালী এত দেরী করছে কেন, চলে আসুক তাড়াতাড়ি।...কী বললেন বেরিয়ে পড়েছে? কখন?...পাঁচটা নাগাদ?...সে কী? পথে আর কোথাও যাবার কথা আছে?...নেই?...তাহ'লে?...এত দেরী হবার তো কথা নয়।...কি বললেন, প্রেজেনটেশান কিনতে? আঃ কী মুস্কিল, এসব নিয়ে আবার দেরী করা কেন, শুভেচ্ছাই তো যথেষ্ট। যাক্, এসে পড়বে বোধহয় এখুনি। আচ্ছা, ছাড়লাম।'

কিন্তু সেই ছাড়া রিসিভারই যে আবার ঘণ্টাখানেক পরে তুলে নিয়ে ডাকাডাকি করতে হবে নীপাকে, এ কথা কি নীপাই ভেবেছিল, না—শশাঙ্কই ভেবেছিল।
এখনো পৌঁছোয়নি সোনালী—এই সংবাদটাই পরিবেশন করতে হচ্ছে নীপাকে।
'এখনো পৌঁছোয়নি! স্তব্ধ বিস্ময়ে মুহূর্ত্ত কয়েক কাটে, তারপর প্রশ্নাঘাত শশাঙ্কর দিক থেকেই। 'কী বলছেন! আমি কি ভেবে নিশ্চিন্ত হতে পারি না, আপনার বান্ধবী আপনাকে দিয়ে আমার সঙ্গে খানিকটা কৌতুক করছেন?'
'কৌতুক! আপনি বলছেন কি মিষ্টার সেন! এটা কি একটা কৌতুকের বিষয়? আপনার ড্রাইভার কি—কী বললেন? ড্রাইভার ছিল না? সোনালী নিজেই ড্রাইভ করে? ব্যস, আর কিছু ভাবনার নেই, নির্ঘাৎ এ্যাক্সিডেণ্ট কেস। আশ্চর্য, আপনি এই একা আসাটা এ্যালাউ করলেন কি ক'রে? জানেন তো ফিরতে রাত্রে বেশী হয়ে যাবে। এতটা রাস্তা! উঃ, আমার তো ভেবে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। ইস্ কেন যে আমি নেমন্তন্ন করতে গেলুম! ইমিডিয়েটলি থানায় হসপিটালে খবর নিন, আমিও নিচ্ছি এদিক থেকে। কোনখানে যে কি হলো। উঃ, এ কী কাণ্ড।' কিছুক্ষণ পর শশাঙ্ক আবার টেলিফোন করেছিল।
এবার না বলেই ছেড়ে দিল নীপা।
গলার স্বর কাঁপছিল তার, উদভ্রান্ত সুর। এ কখনো কৌতুক হতে পারে না। যেটা একটু আগেও আশা করছিল শশাঙ্ক। শশাঙ্ককে জব্দ করতে সোনালী বান্ধবীকে দিয়ে এই উদ্বেগের চাল চেলেছে।
কিন্তু আর সেকথা মনে করা চলছে না। এ খবর ঠিক, এ বিধাতার অমোঘ দণ্ড।

এবার তবে উঠে পড়ো শশাঙ্ক। খেসারৎ দাও তোমার জড়ত্বের, তোমার অলসতার, তোমার অপৌরুষের। কিন্তু থানায় হাসপাতালে খোঁজাখুঁজি করলে কি হবে? সত্যিই কি এ্যাক্সিডেণ্ট?
বিদ্যুৎ চমকের মতো সোনালীর শেষ কথাটা মনে পড়লো।

দুরন্ত অভিমানে উত্তপ্ত মস্তিষ্ক অনেকক্ষণ ধ'রে খোলা হাওয়া পেয়ে যখন কিছুটা ঠাণ্ডা হয়ে এলো, এলো বিচার বুদ্ধির কোঠায়, তখন কতটা যে রাত হয়েছে বুঝতে পারলো না সোনালী। অবিশ্বাস্য রকমের বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে বসেছে হাতে বাঁধা ঘড়িটা।
যথাসময়ে দম দিতে ভুলে গিয়েছিল কি ঘড়িটাতে? ভুলের কথা মনে করবার উপায় নেই, তবু ঘড়িটার ঠিক এই অদ্ভূত অসময়ে এমন নির্লিপ্ত নিরাসক্ত হয়ে যাওয়াটা যেন পরিকল্পিত হিংস্রতার মতো লাগলো সোনালীর।
সাড়ে ছ'টা বেজে থেমে আছে কাঁটা দুটো, অথচ এখন বেশ রাত মনে হচ্ছে। চারিদিকে ঘন জঙ্গল আশেপাশে বসতির কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। হয়তো দিনের বেলা হলে দেখতে পাওয়া যেতো ওই ঝোপজঙ্গলের মাঝখান দিয়েই এখানে সেখানে বিধবার সিঁথির মতো সাদা সরু একটু পায়ে চলা পথ, সে পথ চলে গেছে লোক বসতির মাঝখানে। দেখা যেতো দূরে দূরে ঘর-বাড়ীর আভাস, যেগুলো সারাদিনের ছিটকে প'ড়ে থাকা মানুষগুলোর দিনান্তের আশ্রয়। যেখানে নিতান্ত দীনদুঃখ মানুষটার জন্যেও প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে আছে উষ্ণ শয্যা, উষ্ণ অন্ন আর প্রেমোষ্ণ হৃদয়।
কিন্তু এখন চারিদিকে নিঃসীম অন্ধকার। এমন কিছু দেখা যাচ্ছে না।
কলকাতার এত কাছাকাছি এত অন্ধকার আছে? আছে এমন জঙ্গল?
রাত্রে ভয়াবহতা বেশীই লাগছে।
গাড়ীর হেড্‌লাইট জ্বালিয়ে আসছিল,—চারিদিকে খেয়াল করেনি, একটা মাত্র খেয়াল মাথার মধ্যে কাজ করছিল—শশাঙ্ককে বুঝিয়ে ছাড়বে সোনালী যে সে একটা অবহেলার বস্তু নয়। তার মূল্য আছে। কিন্তু কী সেই পথ?
গল্পে উপন্যাসে যেমন মাঝে মাঝে পড়া যায়, অন্যের সঙ্গে মিথ্যা প্রেমের ভান ক'রে স্বামীর অথবা প্রেমাস্পদের মনোযোগ আকর্ষণ করা, তেমনি একটা কিছু ক'রে দেখা যায় না? ঈর্ষাই শশাঙ্ককে তার ঔদাসীন্যের দুর্গ থেকে বার ক'রে আনবে তাহ'লে।
কিন্তু সোনালীর এই অভিনয়ের পার্টনার কে হবে?
সম্ভব অসম্ভব নানা কল্পনায় কখন্ যে এতটা সময় কেটে গেছে! এখন প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার বাসনা দূর হয়ে গিয়ে জেগে উঠলো একটা ভয়ের ব্যাকুলতা।
ছি-ছি-ছি, এ কী ক'রে বসেছে সে!
বুদ্ধিসুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়ে গিয়েছিল না কি? কে জানে কোথায়, এসে পড়েছে কে জানে কত রাত হয়ে গেছে? কে জানে কী বলছে তাকে নীপা?

কিন্তু শুধুই কি নীপা ?

উৎসব কক্ষের সকলেই যে আজ সোনালীর সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছে তাতে আর সন্দেহ কি ?

আচ্ছা, নীপা কি খবর নেবে না, তার সবচেয়ে প্রিয়বান্ধবী এলো না কেন ? কারণে অকারণে ফোন করা তো প্রায় একটা ব্যাধি তার। সোনালীর যেতে দেরী দেখলে অবশ্যই শশাঙ্ককে ফোন করবে সে।

হঠাৎ একটা প্রতিশোধের উল্লাস অনুভব করে সোনালী। নিশ্চয় ফোন করেছে নীপা. আর—? ঠিক হয়েছে শশাঙ্কর।

খুঁজুক, সারারাত হন্টোহন্টি ক'রে বেড়াক সে। সোনালী এখন ফিরে নীপার বাড়ীতে আত্মগোপন ক'রে ব'সে থাকবে জানাতে দেবে না সে এসেছে।

দেখা যাক, শশাঙ্ক কতটা কর্মক্ষমতা দেখায় নিরুদ্দিষ্টা স্ত্রীর সন্ধান করতে।

কিন্তু তাই কি হবে ?

হয়তো শশাঙ্ক তার বইবাজ্যের মধ্যে মসগুল অবস্থাতেই ফোনটা ধ'রে বলবে, 'যায়নি ওখানে ? কেন ? বাড়ী থেকে তো বেরিয়েছে অনেকক্ষণ। তা আর কোথাও গেছে বোধ হয়।'

ব'লে স্বামী-কর্তব্য সমাপনান্তে আবার ফিরে যাবে নিজের রাজ্যে।

সহসা চোখে এক ঝলক জল এসে যায়।

আর যদি সোনালী মোটর এ্যাক সিডেণ্ট ক'রে মারা প'ড়ে যেতে পারতো। বাড়ী থেকে অনেক দূরে কোথায় কোনো এক অপরিচিত অখ্যাত গ্রামের ধারে পথের পাশে প'ড়ে থাকতো সেই মৃতদেহ, শশাঙ্ক এসে দেখতো। দেখতো নিজের কীর্ত্তি।

তা নিজের কীর্ত্তি ছাড়া আর কি ? সোনালী কি মরতে উৎসুক ?

তার কত সাধ, কত বাসনা। হঠাৎ বুকটা হু হু ক'রে উঠলো সোনালীর। এই অজানা গ্রামের ধারে পথের প্রান্তে মারা গিয়ে প'ড়ে থাকবার চিন্তাটা যেন ভয়ঙ্কর একটা শোকের মতো হাহাকার এনে দিলো।

না না, জীবনের এমন ভয়ানক পরিণতি চায় না সোনালী।

তাড়াতাড়ি গাড়ী ঘুরিয়ে নিলো সোনালী, আবার ফেলে আসা পথ পাড়ি দিতে, আর—মাত্র কয়েক গজ গিয়েই—হ্যাঁ, কয়েক গজ মাত্র গিয়েই—গাড়ীটাও ঘড়ির মতই একটা অবিশ্বাস্য বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে বসলো। হঠাৎ অচল হয়ে গেল।

বনের মধ্যে ঝিঁ ঝিঁ পোকারা একতানে বেজে চলেছে নিরবচ্ছিন্ন সুরে।

কিন্তু বাজছে শুধুই কি বনের মধ্যে ?

নীপা পাখাটার স্পীড শেষ সীমায় ঠেলে দিয়ে ব'সে প'ড়ে হতাশ স্বরে বললো, 'এই কথা বলেছিল সে ?'

শশাঙ্কও বসেছে, হেঁটমুণ্ডে, মরীয়া হয়েই ব'লে ফেলেছে সে, সোনালীর চলে গিয়েও ফিরে এসে ব'লে যাওয়া শেষ কথাটা। তবু এতর মধ্যেও কাণ্ডজ্ঞানটা একেবারে হারায়নি। সবটা বলেনি। শুধু নীপার বারবার প্রশ্নে একসময় জানিয়ে ফেলেছিল, 'যাবার সময় ব'লে গেল, হয়তো না ফিরতেও পারি।'

'এই কথা বললে, আর আপনি—নীপা প্রায় আর্তনাদ ক'রে উঠলো, 'কেন স্টেপ

নিলেন না ? একলা চলে যেতে দিলেন ?
'ওটাকে আমি একটা কথা বলেই ধরিনি।'
'ধরেননি! আশ্চর্য !'
অবশ্য আশ্চর্য হওয়াটাই নীপার বাড়াবাড়ি। দৈবাৎ একটা অভাবনীয় ঘটনা ঘটলো বলেই না ওই কথার কথাটায় গুরুত্ব আসছে !
শশাঙ্কদের সেণ্ট্রাল এ্যাভিনিউর বাড়ী থেকে নীপাদের দমদমের বাড়ী পর্যন্ত সম্ভাব্য অসাম্ভাব্য সব রাস্তাগুলো গাড়ী ছুটিয়ে খোঁজ নেওয়া হয়েছে কোথাও কোনো মোটর এ্যাক্সিডেণ্ট হয়েছে কি না। গাড়ীর নম্বর জানিয়ে থানায় থানায় খোঁজ নেওয়া হয়েছে, খোঁজ নেওয়া হয়েছে সম্ভাব্য হাসপাতালগুলিতে। আপাততঃ আর কি করবার আছে ? কে আর ভাবতে বসবে নীপার বাড়ীর সামনের রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে গেছে সোনালী নীপার বাড়ী ছাড়িয়ে অনেক অনেকটা দূরে।
'ইচ্ছাকৃতী নিরুদ্দেশ !' বললেন নীপা-পতি মিস্টার দাশগুপ্ত, দেখাই যাচ্ছে স্বেচ্ছায় হারিয়ে যাওয়া। পুলিশ কেসে তো পড়তেই হবে মিষ্টার সেন, এখন ঠিক করুন কি বলবেন।'
'কি বলবো মানে ?'
'আহা, আনুপূর্ব্বিক বলতে তো হবেই ? কোনও রকম কথা কাটাকাটি কলহ অথবা মনোমালিন্য হয়েছিল কিনা, আর কারো সঙ্গে বিশেষ কোনও মেলামেশা ছিল কিনা—'
'আঃ থামো তো তুমি।' ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে নীপা, 'সবাইয়ের সব কিছুই তোমার আদালতের নথিপত্তর নয়। কথা বলার সময় একটু বুঝেসুঝে বলতে হয়।'
'কী আশ্চর্য, আমি কি মন্দ ভেবে কিছু বলেছি', মিষ্টার দাশগুপ্ত হতাশভাবে মাথা নাড়েন, 'ব্যাপারটা গোলমেলে এটা তো ঠিক ?'
'এ্যাক্সিডেণ্ট ছাড়া আর কিছু আমি ভাবতেই পারছি না,' বলে শশাঙ্ক।
'কিন্তু এ্যাক্সিডেণ্ট ঘটাবেই এই সংকল্প নিয়ে সে কি উত্তরপথের বদলে দক্ষিণপথ বেছে নিয়েছিল ? অথবা পূর্বপশ্চিম যে কোনও পথ ? তাহ'লে অবশ্য স্বীকার করতেই হবে, আমাদের অনুসন্ধানটা নিতান্তই আংশিক ব্যাপার হয়েছে। আমরা সম্ভাবাটুকুই দেখছি। দিকে দিকে খোঁজ করতে হলে—'
'আঃ, থামো তুমি, সব সময় আর সবকিছু নিয়ে ঠাট্টা করা তোমার একটা রোগের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে।' বললো নীপা।
উৎসব শেষের গাড়ীটা যেন ভাঙা মেলার মতো দেখাচ্ছে। অতিথি অভ্যাগত সকলেই একে একে বিদায় নিয়েছেন সহানুভূতি আর উদ্বেগ জানিয়ে। অনেকেই আশ্বাস দিয়ে গেছেন সকালবেলাই ফোনে খবর নেবেন, এবং প্রত্যেকেই ঘরে ফিরে এই নিরুদ্দেশ পর্বটিকে একটি রোমান্সের রঙে ছুপিয়ে নিয়ে বহুবিধ রসালো আলোচনায় মুখর হচ্ছেন।
সোনালীর সঙ্গে যে তার স্বামীর সম্পর্কটা খুব একটা আদর্শ নয় কে না জানে ?
নীপাই কি জানে না ?
তাই না নীপার প্রাণের মধ্যেও ভয়ের কাঁপন। কে জানে সর্বনাশা পোড়ারমুখী কি ক'রে বসলো !

কিন্তু নীপা তার একান্ত বান্ধবী, আবাল্যের বান্ধবী, নীপা কিছু টের পেলো না? এই তো আজ সকালেও টেলিফোনে কত উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছে—বাবলীর জন্মদিন নিয়ে। দমদমে বাড়ী করা পর্য্যন্ত দেখাসাক্ষাৎ দূরবর্ত্তী হয়ে গেছে, এইসব নিয়ে করেছে আক্ষেপ। ইতিমধ্যে এমন কি ঘটা সম্ভব?

আর শশাঙ্ক লোকটা আর যাই হোক, হঠাৎ ভয়ানক রকম একটা কিছু ঝগড়া ক'রে বসবার লোক নয়।

নীপা তো বরং মনে করে ওই রকম শান্তশিষ্ট স্বল্পবাক্ স্বামীই সংসার যাত্রার পক্ষে সুবিধেজনক।

কিন্তু সে যাক্, এখন করণীয় কি?

'করণীয় আর কি।' দাশগুপ্ত বলেন, 'গাড়ীর নাম্বারটাই এখন প্রধান ভরসা। সন্ধান নিতে হবে ওই সময়ের মধ্যে ওইরকম একটা গাড়ী শহরতলীর কোনও পেট্রল পাম্প থেকে তেল নিয়েছে কিনা, নিয়ে থাকে তো কোন্‌দিকে গেছে।'

'কেউ যদি ইচ্ছে ক'রে হারিয়ে যায়, তাকে কি খুঁজে পাওয়া যায়?' অদ্ভুতসুরে বলে শশাঙ্ক!

আর সঙ্গে সঙ্গে ধমকে ওঠে নীপা, 'থামুন আপনি! রাখুন মেয়েলি কাঁদুনী। আশ্চর্য্য দায়িত্বহীনতা আপনার, না ব'লে পারছি না একথা—'

বান্ধবীর স্বামী বেপোট অবস্থায় পড়লে যতটা রসনা সঞ্চালন করা চলে তাতে ত্রুটি করে না নীপা।

কিন্তু শশাঙ্কর অবস্থা আর এমন কি? কতটুকুই বা জব্দ হলো সে?

ঝিঁ ঝিঁ পোকা আর শেয়ালডাকা গ্রামের ধারে অন্ধকার আকাশের নীচে অচল গাড়ীর মধ্যে বিমূঢ় সোনালী এই কথাই ভাবলো, ওর আর কতটুকু কি হলো? কি আর এমন জব্দ হলো ও? সোনালী নিজেই যে—

আচ্ছা, এইভাবে সারাটা রাত কাটিয়ে দেওয়া কি খুব শক্ত? কি আর হবে চারিদিকের কাঁচ তুলে নিঃশব্দে ব'সে থাকলে? সকাল হলে যা হয় একটা ব্যবস্থা হবেই।

তাছাড়া উপায়ই বা কি?

নিজেকে ভাগ্যের হাতে সঁপে দিয়ে ব'সে থাকাই যাক।

কিন্তু এ কল্পনা বেশীক্ষণ স্থায়ী হলো না। চারিদিক থেকে শেয়ালের ঐক্যতান শরীরের সমস্ত রক্ত ঝিম্‌ঝিমিয়ে তুললো। হৃৎপিণ্ডের মধ্যে যেন একটা হিমপ্রবাহ বইতে সুরু করেছে, অথচ হাত পা কপাল উঠেছে ঘেমে। জগতের সমস্ত বাঘ, সমস্ত সাপ, আর সমস্ত চোর-ডাকাত খুনে গুণ্ডা বুঝি সোনালীর গাড়ীখানা ঘিরে তাণ্ডব নৃত্য করছে, শুধু একবার ঝাঁপিয়ে পড়বার ওয়াস্তা।

'যা থাকে কপালে' ব'লে আর ব'সে থাকা অসম্ভব, সহসা একটা কাজ করলো সোনালী। গাড়ীর হেড্‌লাইটটা ফের জ্বালিয়ে তীব্রশব্দে হর্ণটা বাজাতে সুরু করলো। মুহুর্মুহুঃ নয়, অনবরত। অবিচ্ছেদ্য এই তীক্ষ্ণ তীব্র চীৎকারটা যেন খণ্ড বিখণ্ড করতে চাইছে গ্রামের নিশ্চিন্ত শান্তি।

কিন্তু সোনালীরও যেন নেশা লেগেছে। যেন বাজিয়েই যাবে শেষ পর্যন্ত, যতক্ষণ ওই যন্ত্রটার ক্ষমতা থাকবে আর্তনাদ করবার। অথবা ওই শব্দটার মধ্যেই বুঝি ভরসা খুঁজছে সে।
সামনের পথটা গাড়ীর আলোয় চোখ ধাঁধানো, কিন্তু পাশের অন্ধকার অনাহত। হঠাৎ যেন বিদীর্ণ হলো সেই নিশ্ছিদ্র প্রাচীর, সরু একটি আলোকরেখা কোথায় যেন চিকচিকিয়ে উঠলো।
সত্যি? না কল্পনা?
কিসের ওই আলোকরেখা, দুলছে কাঁপছে, মাঝে মাঝে স্পষ্ট হয়ে উঠছে, মাঝে মাঝে মিলিয়ে যাচ্ছে? কিসের আলো ওটা? চির শহরবাসিনী সোনালী গল্পে কাহিনীতে পড়া ধারণাকে ছুটিয়ে দেয় কল্পনার ঘোড়ায় চড়িয়ে। ওই বোধহয় 'আলেয়া'।
ওই যে মাঝে মাঝে স্পষ্ট হচ্ছে, মাঝে মিলিয়ে যাচ্ছে। ওই আলেয়াটাই কি সোনালীকে পথভ্রান্ত ক'রে দেবে? কিন্তু কি ক'রে?
সোনালী তো গাড়ী থেকে নামছে না। ওর পিছনে ছুটতেও যাচ্ছে না।
কিন্তু কিসের পিছনে ছুটে এতদূর এলো সে? আর যদিই না উগ্র অভিমানের বশে এসে থাকে, প্রধান রাস্তাটা ছেড়ে এমন অজানা অন্ধকার কাঁচা রাস্তায় চলে এলো কেন?
যশোর রোড দিয়ে অনবরত মালবাহী লরী আসা যাওয়া করে, সোনালীর অচল গাড়ীখানা সেখানে পথজুড়ে প'ড়ে থাকলে নিশ্চয় তাদের দৃষ্টিতে পড়তো, এবং এতক্ষণে নীপার বাড়ী ব'সে সমারোহ ক'রে নিজের খামখেয়ালের এ্যাড্ ভেঞ্চারের গল্প করতে পারতো সোনালী।
কিন্তু তা হলো না। পাকা রাস্তা ছেড়ে কাঁচা রাস্তায় চলে এসেছে সোনালী।
হয়তো বা শুধু এইটুকু চলে আসার জন্যেই জীবনের পাকা রাস্তাটাকে হারালো সোনালী।
চিরকালের মতো কাঁচা রাস্তায় পড়লো।
না, ওটা আলেয়া নয়, লণ্ঠনের আলো। কেউবা এগিয়ে আসছে আলোটা হাতে ঝুলিয়ে।
ছেলেবেলায় শোনা যতসব ডাকাতের গল্প মনে জেগে উঠছে। আলো হাতে ক'রে কাছে আসে তারা, কড়া গলায় বলে, 'গায়ে কী গহনা আছে খুলে দাও চটপট।'
কিন্তু শুধু গহনা পেলেই কি সন্তুষ্ট হয়ে চলে যাবে? তাই কি যায়? যদি আরও কিছু উপরি পাওনার আশা থাকে?
হায় হায়, কেন এই বোকামী করতে গেল সোনালী? কেন শব্দের সঙ্কেত দিয়ে অনিশ্চিতা ক'রে তুললো। কেন আলোর নিশানা দিয়ে জানিয়ে দিলো কোন্‌খানটায় প'ড়ে আছে সে অরক্ষিত একটা অচল গাড়ীর মধ্যে।

আলোটা ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে।
আর বোঝা না বোঝার দ্বন্দ্ব নেই। দুটো লোক আসছে গাড়ীর দিকে। একজনের হাতে একটা হ্যারিকেন্ লণ্ঠন।
মেঠো লোক, গায়ে জামার বালাই নেই, কোঁচার খুঁটটা একটু গায়ে দেওয়া। দু'জন

এসেছে, অর্থাৎ গুছিয়েই এসেছে। কে জানে হাতের ফাঁকে লুকোনো আছে কিনা কোনও ধারালো অস্ত্র।

বাইরে থেকে ভরসার যখন আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না, ভয় বস্তুটা ক্ষুধার্ত হিংস্র জন্তুর মতো দন্ত মেলে উদ্যত হয়ে ওঠে, তখনই বুঝি অন্তর্জগতে একটা ওলট পালট ঘটে যায়। চিরদিনের ভীতু মানুষটা সহসা সাহসী হয়ে ওঠে, চিরদিনের দুর্বল মানুষটা পায় অমিত বল, মন যেন তার আঁকড়ে ধ'রে থাকা, কোনোখানে লুকিয়ে রাখা শেষ ব্রহ্মাস্ত্রখানা প্রয়োজন বুঝে বার করে।

ওরা গাড়ীর কাছে এসে পড়েছে।
হাতের কাছে কোনো ভারী জিনিস থাকলে, ঈশ্বর জানেন সেইটা ছুঁড়ে মেরে বসতো কিনা সোনালী। কিন্তু কিছু নেই। একখানা ভারী বই পর্যন্ত না।
অতএব চীৎকার নয়, অদৃশ্য কারো কাছে সাহায্য প্রার্থনা নয়, শুধু সমস্ত মানসিক শক্তি একত্র ক'রে ব'সে ব'সে প্রতীক্ষা করা মৃত্যুর জন্যে, ধ্বংসের জন্যে।

কিন্তু কই, ওরা তো এসেই গাড়ীর দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে বসলো না, জানলার কাঁচগুলো শাবলের ধাক্কায় ভেঙে সাতটুকরো করলো না! ওরা শুধু হাতের আলোটা তুলে ধ'রে কিছু একটা প্রশ্ন করলো।
কাঁচের ওপিঠ থেকে গলার আওয়াজ ঠিক বোঝা গেল না, তবে ভঙ্গিটা বোঝা গেল—প্রশ্নের ভঙ্গী।
আশ্চর্য্য, একটা ভদ্রলোক জুটলো না সোনালীর ভাগ্যে?
তবু দরজাটা খুললো সোনালী।
আর তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে এমন ভাবে প্রশ্ন করলো যেন ওরা কাঠগড়ার আসামী, আর নিজে সে অপর পক্ষের উকিল।
'জায়গাটার নাম কি?'
হ্যারিকেন ধারী চুপচাপ সেটা উঁচু ক'রে তুলেই রইলো, অপর ব্যক্তি মৃদুস্বরে উত্তর দিল, 'এই পাড়াটাকে শ্যামতলা বলা হয়। টাউন বনগাঁ।'
বনগাঁ! কী সর্বনাশ!
বনগাঁ পর্য্যন্ত চলে এসেছে সোনালী? কিন্তু আসা তো নয়, এ যে এসে পড়া! কে জানে এই এসে পড়তে কতক্ষণ লেগেছে?
কিন্তু না, এদের সামনে বিচলিত ভাব দেখালে চলবে না, তাই ভুরুদুটো আরও কুঁচকে ব'লে ওঠে, 'বেজেছে ক'টা?'
এই খালি গা চাষা দুটোকে 'আপনি' বলতেও ইচ্ছে করছে না, আবার ঠিক 'তুমি'টাও মুখে আসছে না। একটা লোক যেন ঠিক চাষার মতও নয়। যদিচ বেশভূষায় উভয়েই প্রায় অভিন্ন, তবু কোথায় যেন মস্ত একটা পার্থক্য রয়েছে। চোখে, চুলে, মুখের রেখায়।
হ্যারিকেনের আলোটা ওর মুখেই বারেবারে আলোছায়ার আলপনা কাটছে। কিন্তু

ও উত্তর দেবার আগেই আলোধারী ব'লে ওঠে 'ঘড়ি তো আজ্ঞে আপনার হাতেই বাঁধা রয়েছে দিদিমণি !'
অপর ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গেই তেমনি মৃদুস্বরে বলে, 'তুই থাম্ ফণী।'
কিন্তু এ বিনয় নরম করতে পারে না সোনালীকে, যেন সমস্ত ঘটনাটার জন্যে এরাই দায়ী এইভাবে রুক্ষস্বরে বলে, 'সেটা আমার জানা আছে। ঘড়ি বন্ধ হয়ে গেছে বলেই জিজ্ঞেস করা হচ্ছে।'
ফণী অবশ্য আর কথা কয় না, অপরজন বলে, 'পৌনে নটা মতন হবে।'
'পৌনে নটা! মাত্র পৌনে নটা।' সোনালীর যে মনে হচ্ছিল অনন্তকাল এইভাবে ব'সে আছে সে!
সোনালীর এই বিস্ময় প্রকাশে লোকটা মৃদু হাসে, 'পাড়াগাঁয়ের ব্যাপার তো! সন্ধ্যেবেলাই শেয়াল ডাকে। কিন্তু কি হয়েছে বলুন তো? গাড়ী বিগড়েছে?'
লোকটার কথা বলার ধরনটা নেহাৎ চাষাড়ে নয় বটে, কিন্তু ওই 'দিদিমণি' বলা লোকটার সঙ্গী বৈ তো নয়, ওকে 'আপনি' ব'লে হাস্যস্পদ হতে পারবে না সোনালী, তাই সবলে দ্বিধা দূর ক'রে বেশ মনের জোরের সঙ্গে বলে, 'তাই মনে হচ্ছে। কাছাকাছি কোনো মোটর মেকানিকের সন্ধান জানা আছে তোমার?'
আলোধারী যেন একটু চমকে উঠলো, 'তুমি' শুনেই কি? কিন্তু অপরজন অবিচলিত মুখে বললো, 'কাছাকাছির মধ্যে কই? আছে টাউনে।'
'তবে তো সবই হলো', সোনালীর স্বরে অসহিষ্ণুতা, 'সেটা এখান থেকে কতদূর?'
'মাইল তিনেক হবে।'
'ডেকে নিয়ে আসতে পারবে না? বখশীস্ পাবে।'
আলোকধারীর কণ্ঠ থেকে একটা অস্ফুট আওয়াজ উঠলো, আর অবিচলিত ব্যক্তির মুখে ফুটে উঠলো একটা মৃদু হাসি। 'আমি যেতে পারলেও, সে আসতে রাজী হবে না।'
'হবে না মানে? চালাকী নাকি? একজন ভদ্রমহিলা এইরকম বিপদে পড়েছেন জেনেও আসতে রাজী হবে না?'
'মুস্কিল কি জানেন', আবার হাসে সে, 'ওসব লোক এসময় যে অবস্থায় থাকে, সে অবস্থায় স্বয়ং বৈকুণ্ঠের নারায়ণ এসে আবেদন জানালেও তাঁকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে হবে।'
এবার সোনালী যেন থতমত খায়, হোঁচট্ খায়, 'তার মানে?'
'মানে, নেশায় আচ্ছন্ন। তায় আবার আজ শনিবার, লরীওয়ালারা আলাদা বখশীস্ দেয়।'
'চমৎকার। রেল স্টেশন এখান থেকে কতদূর?'
'ওইতো বললাম মাইল তিনেক। স্টেশনের ওপারেই বাজার, সেখানেই যত লরীর আড্ডা। মোটর মেকানিকও—'
'তোমাদের এখানে ট্যাক্সী মিলবে?'
'এখানে? পাগল হয়েছেন!' দস্তুর মতো হেসে ওঠে লোকটা, কৌতুকের হাসি।
'উঃ, আচ্ছা বিপদেই পড়া গেছে। বলি আর কোনও যানবাহন, মানে আর কিছু গাড়ী-টাড়ী আছে?'

'আছে কয়েকখানা সাইকেল রিক্‌সা, কিন্তু সন্ধ্যার পর বেরোয় না।
'সন্ধ্যার পর বেরোয় না! অপূর্ব। ডবল মজুরি দিতে চাইলেও না?'
'সেটা ঠিক বলতে পারি না, কারণ আমার অন্ততঃ জানা নেই কেউ কোনোদিন ওদের ডবল মজুরী দিতে চেয়েছে কিনা।'
সোনালী তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে আর একবার লোকটার আপাদমস্তক দেখে নেয়, মনে হচ্ছে যেন সোনালীকে ব্যঙ্গ করছে। সোনালীর বিপদগ্রস্ত অবস্থায় মজা পেয়েছে যেন। নিশ্চয় কু-মতলবী বদলোক, এইভাবে সোনালীকে আটকে ফেলতে চাইছে। মোটে রাত্তির পৌনে নটা, এক্ষুনি অমনি গাড়ী ঘোড়া সব ঘুমিয়ে পড়লো, আর মেকানিক নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে প'ড়ে রইলো!
সব মিথ্যে কথা! খুব সম্ভব দলের আরও লোকজনের আসার অপেক্ষায় কথা কয়ে সময় ক্ষেপণ করছে! হায় ভগবান, গাড়ী বিগড়ে দেবার আর সময় পেলে না তুমি! আর কিছু না, এ হচ্ছে শশাঙ্কর শাপের ফল। নির্ঘাৎ সোনালী যখন চলে এসেছে, অভিশাপ দিয়েছে সে!
কিন্তু এখন কি করা!
মুখের জোর হারালে চলবে না। হাত পা ঠাণ্ডাই হয়ে আসুক আর বুকের মধ্যে সমুদ্র কল্লোলই উঠুক, মুখের জোর বজায় রাখতেই হবে।
'কোথায় থাকে রিক্‌সাওয়ালারা? নিয়ে এসো দিকি একজনকে।'
'তারা তো সবই গ্রামের মধ্যে। কিন্তু চেষ্টা ক'রে তাদের কাউকে ডেকে এনে রাজী করিয়ে রওনা দিলেও ফল কিছুই হবে ব'লে মনে হয় না, ততক্ষণে লাস্ট ট্রেন চলে যাবে।'
'লাস্ট ট্রেন চলে যাবে?' সোনালীর তীক্ষ্ন স্বর আরও তীক্ষ্ন হয়ে ওঠে, 'লাস্ট ট্রেন ক'টায়?'
'সাড়ে দশটা।'
'ওঃ, সে তো অনেক দেরী। সাইকেল রিক্সায় এই তিন মাইল রাস্তা যেতে এতক্ষণ লাগবে?'
'ওদের বাড়ীতে গিয়ে রাজী করিয়ে নিয়ে আসার সময়টাও যোগ করুন ওর সঙ্গে।'
আবার সেই প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ!
আপাদমস্তক জ্বলে ওঠে সোনালীর। ছেলেবেলায় শোনা ওর মার একটা কথা মনে প'ড়ে যায়, 'হাতী যখন হাবড়ে পড়ে, ব্যাঙে ধ'রে লাথি মারে।'
এ যে প্রায় তাই।
নইলে কোথায় সোনালী, আর কোথায় ওই খালি গা, খাটো কাপড়-পরা গাঁইয়া ভূতটা, ওর সাহস হয় সোনালীকে ব্যঙ্গ করতে!
এবার রুদ্রমূর্ত্তি হওয়া দরকার।
তাই গলা চড়িয়ে ব'লে ওঠে সোনালী, 'আমার মনে হচ্ছে তোমার সমস্ত কথাই মিথ্যে। নিশ্চয় তোমার মতলব খারাপ। ভালো চাও তো হয় একটা মোটর মেকানিক, নয় একটা রিকসাওলা ডেকে আনো বলছি।'
'দাদাবাবু!' ফণী সহসা হাতের আলোটা ঠক্ ক'রে মাটিতে বসিয়ে ব'লে ওঠে, 'আপনি ফিরবেন?'

'আঃ, দাঁড়া না!'
'না দাদাবাবু, ফণীর আর দাঁড়াবার ক্ষ্যামতা নেই।'
'কেন রে, কি আবার হলো তোর?'
'ওকথা শুধোবার আর দরকার নেই দাদাবাবু। আপনি দেবতা হ'তে পার, ফণী রক্তমাংসর মানুষ! উঃ, ধন্যি বলি আপনাকে দিদিমণি! সাধে কি আর শহুরে মানুষদের দূরে থেকে গড় করি আমরা। বলি আপনি এই একা মেয়েছেলে শখ ক'রে রাত দুপুরে গাড়ী চালিয়ে এসে, মাঠের মাঝখানে গাড়ী ভেঙে বেপোটে পড়েছো, এ দোষ কি আমাদের দাদাবাবুর?'
'ফণী!' বিরক্ত গম্ভীর কণ্ঠ ভর্ৎসনা ক'রে ওঠে, 'তুমি যদি চুপ ক'রে না থাকতে পারো আলোটা রেখে চলে যাও।'
'তা জানি। আপনার কাছে তো নেয্য কথা কইবার জো নেই।'
ফণীর 'দাদাবাবু' সম্বোধনটা সোনালীকে একটু যে নার্ভাস ক'রে আনে না তা নয়, বোঝা যাচ্ছে আর যাই হোক, এ লোকটা ফণীর পর্যায়ভুক্ত নয়। কিন্তু এখন আর কি-ই বা করা যায়। বড়জোর সুরটা একটু নরম করা। কিন্তু তাতেও তো মানের হানি। ও যা হচ্ছে হোক।
অতএব সুরের গরমটা কমলো কি না কমলো; নরম আদৌ নয়।
'আচ্ছা, মানছি আমারই সব দোষ। কিন্তু কি ক'রে জানবো যে পৃথিবীতে এখনও এরকম হতচ্ছাড়া জায়গা আছে।'
'পৃথিবীতে যে এখনও আরও কত হতচ্ছাড়া জায়গা আছে সে আপনাদের কল্পনার শুধু বাইরেই নয়, তার থেকে সমুদ্র প্রমাণ দূরে।'
গম্ভীর মৃদু ক্ষুব্ধ এই স্বরটা যেন শুধু সোনালীকেই নয়, সমস্ত সভ্যতাকেই ধিক্কার দিয়ে উঠলো।
সোনালী যদি আজকের বিকেল থেকে এই রাত অবধি সমস্ত ঘটনাটা জীবন থেকে মুছে ফেলতে পারতো!
আবার দেখা দিচ্ছে 'আপনি' 'তুমি'র দ্বন্দ্ব। লোকটার কথাবার্তা বারেবারেই ধাক্কা দিচ্ছে সোনালীকে।
বিমূঢ়ের মতো কয়েক সেকেণ্ড চুপ ক'রে থেকে সোনালী বলে, 'তাহলে কথা দাঁড়াচ্ছে—এখন আমার সারারাত এই অবস্থায় ব'সে থাকা ছাড়া আর কিছু করবার নেই! বাঘেই খাক আর ডাকাতেই ধরুক।'
ক্ষুব্ধস্বর এবার সশব্দে হেসে ওঠে। ব্যঙ্গের নয়, পরিচ্ছন্ন নির্মল হাসি।
'অতদূর পর্যন্ত নয়! একটু কষ্ট ক'রে খানিকটা হেঁটে গ্রামের মধ্যে চলুন, আপনাকে বসিয়ে যাহোক একটা ব্যবস্থা করা যাবে?'
'গ্রামের মধ্যে কোথায় আমি বসতে যাবো?' উদ্বিগ্ন স্বর সোনালীর।
'এই হতচ্ছাড়া গ্রামের কোনও এক হতভাগ্যের ঘরে।'
'তারপর? ব্যবস্থাটা কি হবে?'
'দেখি যদি স্টেশন থেকে ফোন—ফোন আছে অবশ্যই আপনার বাড়ীতে?'
'ফোন!' সোনালী যেন অথই সমুদ্রের কূল পায়। কী আশ্চর্য্য, এতক্ষণ এই সহজ কথাটা মনে আসছিল না কেন তার?

'ফোন আছে বৈকি! এখানে ফোন আছে কারুর বাড়ী?'
'এখানে?' লোকটা কেবলই বুঝি হাসির খোরাক পাচ্ছে, 'এখানে নয়। ওই স্টেশন থেকেই যদি সম্ভব হয়। তাও নিশ্চয় ক'রে বলতে পারছি না। তবে চেষ্টা করে দেখতে হবে তো? বাড়ীতে অবশ্যই সবাই ভাবছেন।'
'আমার জন্যে ভাববার কেউ নেই।' সহসা ব'লে ওঠে সোনালী।

লোকটার কি একটু বিস্ময় বোধ হয় না? একটু বা কৌতূহল? মনে হয় না ভদ্রমহিলা কি রাগ ক'রে বাড়ী থেকে পালাচ্ছিলেন না কি?
কিন্তু কৌতুহল প্রকাশটা অশোভন। তাই একেবারে প্রসঙ্গান্তরে চলে যায় সে, 'তাহ'লে নেমে এসে হাঁটুন একটু কষ্ট ক'রে। ফণী, তুই আলোটা নিয়ে আগে আগে চল্।'
নেমে পড়বার ইচ্ছে অনেকক্ষণ থেকেই করছিল সোনালীর, কিন্তু ঠিক সাহস পাচ্ছিল না। গাড়ীর মধ্যে আছে তবু নিজের কোর্টে আছে। আহা, গাড়ীটা যদি সহসা বিশ্বাসঘাতকতা পরিহার করে! যদি স্টার্ট দিতেই স্টার্ট নিয়ে ছুটতে সুরু করে!
তাহ'লে ওদের নাকের সামনে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যায় সোনালী ধুলোর ঝড় উড়িয়ে।
কিন্তু যেতো কি?
সত্যি বলতে কি, খুব ভয়ংকর ভয় আর করছে না। আর এই মুহূর্তে সমস্ত নাটকটার উপর যবনিকাপাত ক'রে ঠিক যে চলেই যেতে ইচ্ছে করছে তাও নয়। নিজেকে সাংঘাতিক বিপদগ্রস্ত আর মনে হচ্ছে না বরং অনেকটা যেন উপন্যাসের নায়িকার মতো মনে হচ্ছে নিজেকে।
'এই জায়গাটাকে কি যেন বললে?'
'জামতলা।'
'এইখানে থাকো তোমরা?'
'হ্যাঁ।'
'কেন, টাউনে থাকতে পারো না?' এখানে এত অসুবিধে—'
ফণী হেসে ওঠে, 'গাঁয়ের মানুষদের অসুবিধের অত কাতর হলে চলে না। হয়ও না।'
'খাও কি? এখানে নিশ্চয়ই বাজার দোকান নেই।'
'সবই আছে।'
কথা কইবার জন্যেই কথা কইছে, সোনালী নিঃশব্দে নিয়তির নির্দ্দেশে এগিয়ে চলার মতো লোক দুটোর পিছন পিছন এগিয়ে যেতে ভালো লাগছে না। কথা কওয়া ভালো, কথার মধ্যে আশ্রয় আছে।
তবু গেল খানিকক্ষণ।
ফণীর হাতের আলোর রেখাটুকু ধ'রে নীরবে এগিয়ে চলছে দুটো মানুষ—প্রথমজন সোনালী, দ্বিতীয়জন এখনও অজ্ঞাতনামা।
তা সোনালীর নামটাই কি ও জেনেছে?

'আর কতক্ষণ হাঁটতে হবে সেই কোনো একজন যেন হতভাগ্যের বাড়ী পর্য্যন্ত

পেঁছোবার জন্যে ?'
এ লোকটার সঙ্গে নেহাৎ ফণীর মতো ক'রে কথা না বললেও চলবে এটুকু বোঝা গেছে এতক্ষণে।
উদ্দিষ্ট ব্যক্তি হেসে ওঠে।
'এই যে প্রায় এসে গেছি।'
'তোমারই বাড়ী বোধহয় ? না কি তোমার মনিববাড়ী ?
'নাঃ, ফণীর সহ্যের উপর বড্ড বেশী চাপ দেওয়া হচ্ছে, আর পারছে না সে। দাদাবাবুর এই 'অতাত' ভাবে গা জ্বলে যাচ্ছে তার।
কোথা থেকে এক উড়ো আপদ এসে জুটে কী গেরো করছে।
বেশ বাবা, একা মেয়েছেলে বেরিয়ে প'ড়ে পথে বিপদে পড়েছিস, মায়া দয়া করা মানুষের কাজ। আর দাদাবাবুর তো ওই পেশা, লোকের উপকার ক'রে বেড়ানো, লোককে মায়া দয়া করা। করো, ভালো কথা কিন্তু ওই বে-সহবৎ মেয়েটা যে তোমায় চাকরবাকরের মতো তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করছে, এটা বরদাস্ত করবার দরকার কি ? অথচ এটা ফণীর বিলক্ষণ জানা, ফণী যদি মেয়েটাকে দাদাবাবুর মহিমা সমঝে দিতে যায়, জন্মে আর ফণীর মুখ দেখবে না দাদাবাবু।
রাগের চোটে শুধু হাতের আলোটাকে সজোরে আন্দোলিত করতে থাকে সে চলতে চলতে।
'ফণী, আলোটা নিভে যাবে, আস্তে।···হ্যাঁ কি বললেন, ওটাই আমার কর্মস্থল।'
'হুঁ।'
কোনো এক রহস্য আবিষ্কারের আশায় মন চঞ্চল হয়ে ওঠে সোনালীর। 'কি কাজ করতে হয় ?'
'যখন যা পড়ে। যখন যা এসে যায়। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত।
'আর এই ফণী'
'ও ? ও আমার সহকারী।'
'বাড়ীতে আছে কে ?'
'আজ্ঞে গেলেই দেখতে পাবেন।'
আর মুখ বন্ধ ক'রে থাকতে পারে না ফণী, ব'লে ওঠে, 'এইতো এসে গেলাম।'
'এসে গেলাম' ব'লে যে বাড়ীটার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে—আলোটা উঁচু ক'রে তুলে ধ'রে ফণী, সে বাড়ীটার দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে যায় সোনালী।
অন্ধকারে সম্যক ধারণা না হলেও, বাড়ীটা যে অনেকখানি জমি জুড়ে আর অনেকটা উঁচুতে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, তা বোঝা গেল। এই ঝোপজঙ্গলের মাঝখানে হঠাৎ এতবড় একটা বাড়ী দেখতে পাবে তা কল্পনাই করেনি। মনের মধ্যে বারে বারে কল্পনার ছায়া ফেলছিল একখানি মাটির ঘর। একটু বা গোবরলেপা উঠোন একটা বা তুলসীমঞ্চ।
প্রকাণ্ড বাড়ী।
তবে আর একবার ভালো ক'রে চেয়ে দেখে টের পায় সোনালী, নেহাৎই ভগ্নদশাগ্রস্ত। একদিকের খানিকটা ভেঙে প'ড়ে স্তূপের সৃষ্টি করেছে। দেখে গা ছমছম করে।
'মাকে খবর দিয়ে আয় তো ফণী !'

বললো অন্য ব্যক্তি।

মা!

শব্দটা যেন কানে মধুবর্ষণ করলো সোনালীর। আশা হচ্ছে তাহ'লে কোনো একটি নারীচরিত্রের আবির্ভাব ঘটবে।

কিন্তু 'মা' বলতে কি বোঝায়?

সত্যিকার মা, না মনিবগিন্নী? তাই সম্ভব। তবে এ লোকটা যে নেহাৎ চাকর-বাকর শ্রেণীর নয়, তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। কিছু কিঞ্চিৎ লেখাপড়াও জানে সন্দেহ নেই। খুব সম্ভব ধনী বিধবার বিষয়-আষয়ের তত্ত্বাবধায়ক সরকার জাতীয়। তার চাইতে উঁচুদরের হ'লে গায়ে একটা জামা অন্ততঃ থাকতো।

কিন্তু কথাবার্তায় ভব্যতা আছে। কথায় একটা আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারে।

আলোটা নামিয়ে রেখে বাড়ীতে ঢুকে মুহূর্তে অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল ফণী। সোনালী ওর সেই পরিত্যক্ত আলোটা তুলে ধ'রে দেখতে থাকলো—বাড়ীর আকৃতি আয়তন।

'বাড়ীর মালিক বাড়ী সারান না কেন?'

'মালিক ব'লে ঠিক কেউ নেই।'

'তার মানে? থাকে কে?'

'দু'একজন কর্মচারী।'

'মা বললে কাকে?'

'তিনি? তিনি এখানের অধিষ্ঠিতা দেবী। এ অঞ্চলটারই।'

নাঃ, আর একবার না ধমকে পারে না সোনালী। 'আচ্ছা গোলমেলে কথা তো তোমার! এসব কথার অর্থ কী? এ কোথায় এনে তুলছো আমায়?'

'কী আশ্চর্য, এত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন?'

'হবো না? বলো কি তুমি! কী মতলবে এই একটা ভাঙাবাড়ীতে ডেকে নিয়ে এলে আমাকে? আমি ঢুকবো না এ বাড়ীতে।'

'না ঢোকেন জোর নেই।' অভিযুক্ত আসামী মৃদুহাস্যে বলে, 'তবে বাইরে সাপ খোপ—'

'ওঃ আবার ভয় দেখানো হচ্ছে—' সোনালীর আস্ফালনের মধ্যেও উৎকণ্ঠার স্বর গোপন থাকে না, 'এ সময় সাপ বেরোয়?'

'বেরোবেই এমন কথা বলছি না, তবে বেরোনো অসম্ভব নয়।'

'এই ভাঙাবাড়ীর খাঁজে-খোপেই যে সাপ নেই তার প্রমাণ?'

'প্রমাণ দেওয়া শক্ত। প্রমাণের মধ্যে আমরা—যারা এখানে বাস করি, তারা এখনও দিব্যি টিঁকে আছি, এই।'

'হুঁ। তোমরা কে কে থাকো?'

'স্থিরতা কিছু নেই, কখনো তিনজন, কখনো বিশজন।'

সোনালীর বুকটা ক্রমশঃ যেন হিম হয়ে আসছে। বেশ বুঝতে পারছে লোকটা গোলমেলে, জায়গাটা গোলমেলে, আর মতলব ওর খারাপ নিশ্চয়ই। একটা আস্তানায়

কখনো তিনজন, কখনো বিশজন, এর মানে ? ডাকাতের আড্ডা নাকি !
না, এর গহ্বরে কিছুতেই ঢুকবে না সোনালী, বরং খোলা মাঠ ভালো, সাপে খায় খাক।
সহসা রুখে দাঁড়িয়ে বলে, 'আমি ভেতরে ঢুকবো না।'
'বেশ !'
'বেশ ব'লে এভাবে চুপ ক'রে রইলে যে ? আমাকে আমার গাড়ীতে পোঁছে দিয়ে এসো।'
'চলুন।'
'তুমি কি ভেবেছো কি ?' তীক্ষ্ণ চীৎকারে অন্ধকার পরিবেশটাকে যেন খান্ খান্ ক'রে ফেলে সোনালী, 'যেন মজা দেখছো এইভাবে কথা বলছো। ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা কইতে জানো না ?'
আসামী হেসে ফেলে বলে, 'আপনি বড্ড বেশী নার্ভাস হয়ে পড়েছেন, এখন আপনাকে কোনো কিছু বোঝাতে যাওয়া বৃথা।'
'তাই নাকি ? তুমি তো দেখছি অনেক রকম কথা জানো। কিন্তু মনে রেখো আমার সঙ্গে কোনোরকম দুর্ব্যবহার করতে এলে সহজে রেহাই পাবে না তুমি, তোমার দলসুদ্ধু সবাইকে পুলিশে—,
সহসা অন্ধকারের গুহা থেকে বেরিয়ে আসে ফণী, পিছনে খানিকটা ধপধপে সাদা বস্ত্রাবৃতা এক ভদ্রমহিলা সেই শ্বেতবস্ত্রাবৃতার কণ্ঠ থেকে কোমল মধুর একটি ঝঙ্কার ওঠে, 'ছিঃ মা, ওকথা কি মনে করতে আছে ? দুর্ব্যবহার করবে কেন ? কত ভাগ্য যে, এই ভাঙাবাড়ীতে আজ তোমার মতো অতিথির পায়ের ধুলো পড়লো !

থতমত খেয়ে যায় সোনালী। ঠিক এ রকমটা আশা করেনি সে।
কিন্তু আজ সন্ধ্যা থেকে কোন্‌টাই বা তার আশানুরূপ ঘটছে ?
'এসো।'
আলোটা তুলে ধরেন মহিলাটি। তুলে এগোতে থাকেন, আর মন্ত্রমুগ্ধ সাপের মতো সোনালী তাঁর পিছন পিছন এগোয়।
বাইরেটা যেমন ভুতুড়ে ভিতরটা তেমন নয়।
ভিতরে চলন-পথ পার হয়ে দালানে পা দিতেই স্পষ্ট পরিষ্কার আলোর আশীর্বাদ। সীলিং থেকে দু'পাশে দুটো গোল চিমনী ঢাকা বড় বড় কেরোসিন আলো ঝুলছে। সেই আলোয় সমস্ত দৃশ্যটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিল সোনালী।
দালানের একপাশে একহারা একটা চৌকীতে পরিষ্কার চাদর ঢাকা সরু একটি বিছানা, তার মাথার কাছে বয়সে কিছুটা বিবর্ণ হয়ে যাওয়া ছোট্ট একটি পাথরের ত্রিপদী, তার উপব দু'একখানা বই, একখানা চশমার খাপ, একটা চকচকে তামার ঘটিতে কয়েকটি ফল।
দেওয়ালের ধারে ধারে সারিগাঁথা বুক-সেল্‌ফ্। জিনিসগুলো পুরনো সন্দেহ নেই, পালিশ খসে যাওয়া রংজ্বলা, কিন্তু মজবুত সন্দেহ নেই। পুরনো আমলের ফার্ণিচার। কিন্তু আগাগোড়া বইয়ে ঠাসা। এ কী ! এত গ্রন্থ-সংগ্রহ !
এ কোথায় এসে পড়েছে সোনালী ! কোনো রাজনৈতিক দলের গুপ্ত আড্ডায় ?

এ বইয়ের মালিক কে ?   কে পড়ে এত বই ?   ওই মহিলাটি ?   তাই কি সম্ভব ?
ওই লোকটা নয়তো ?
ছদ্মবেশী কোনো দলনেতা হতে পারে— বিশ্বাস কি ?
'বোসো মা।'
মহিলাটির কণ্ঠস্বরে দালানের এপাশটায় লক্ষ্য পড়লো।   এপাশে দেয়াল জুড়ে সরু টানা একটা চৌকী, আশেপাশে কয়েকটি বেতের মোড়া।
এইদিকে সোনালীকে বসতে অনুরোধ করেছেন মহিলাটি।
চৌকীতে বসলো সোনালী।
দেখলো তার ওপর বিছানো চাদরটা ছাপা খদ্দরের।   সামনের বিছানার চাদরটাও বোধকরি তাই।   এতক্ষণে নজর পড়লো মহিলাটি এবং পুরুষ দুটি তিনজনেই খদ্দরমণ্ডিত।

ওঃ, বোঝা গেছে।   এতক্ষণ যেন কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হয় সোনালী।   রাজনৈতিক দল হতে পারে।   কিন্তু ভয়ংকর কোনো দল নয়।
মহিলাটি যে রীতিমত অভিজাত ঘরের তাতে আর সন্দেহ নেই, চলনে বলনে ধরনে চেহারায় বনেদী আভিজাত্যের ছাপ।

আর এই লোকটা ?
স্পষ্ট আলোয় ধরা পড়ছে এবার মহিলাটির সঙ্গে একান্ত সাদৃশ্য।
তার মানে লোকটা ওঁর আপন কেউ।   অর্থাৎ ভদ্রলোক।
কিন্তু কী ভয়ংকর লোক !   এভাবে ছোটলোকের ছদ্মবেশে।

'নিরু, তুই তাহ'লে চেষ্টা দেখ এঁর জন্যে কি করতে পারিস।'   আভিজাত্যের মসৃণ কণ্ঠ ধ্বনিত হয়ে ওঠে, 'আমি ততক্ষণ এঁকে…হাতমুখ ধোবে মা ?'
সোনালী বিচলিত ভাবে বলে, 'না না, ওসব কিছু দরকার নেই।'
মহিলাটি তাকিয়ে দেখেন।
তা সত্যি, দরকার নেই সত্যিই।   এনামেলমণ্ডিত উগ্র আধুনিক সাজের এনামেলটা এত উদ্বেগ উৎকণ্ঠা, এত ঘাম গরম সবকিছুর মধ্যেও যথেষ্ট বজায় রয়েছে।   অতি রঞ্জিত ঠোঁটটাই যা আপাততঃ ঈষৎ ম্লান।
'তাহ'লে থাক।   কিন্তু খেতে তো হবে একটু।'
'না না, আমার কিছু খাবার ইচ্ছে নেই এখন।'
'তা বললে কি ছাড়বো মা, এখন ছাড়া তোমাকে আর পাচ্ছি কোথায় ?   সকাল হ'লে আর কি তুমি আমার ঘরে—'
সকাল হ'লে !
সোনালী চমকে বলে, 'রাত্তিরে এখানেই থাকতে হবে নাকি ?'
মহিলাটি ওর চমকানিতে হেসে ফেললেন, 'তা এই রাতে আর এই ঝোপজঙ্গলের পথে কোথায় যাবে মা ?   কি করেই বা যাবে ?'
'কেন, আপনি যে বললেন উনি কি যেন ব্যবস্থা করবেন।'

'নিরু' নামক ব্যক্তিটিকে এবার 'উনি' সম্বোধনে সম্ভ্রম দেখায় সোনালী। ভেবেচিন্তে নয়, অজ্ঞাতসারে।
মহিলাটি নিরুর দিকে একবার তাকিয়ে আর একটু হেসে বলেন, 'এই রাতে তোমার যাওয়ার ব্যবস্থা আর কি ক'রে হবে মা? কলকাতা থেকে কত দূরে এসে পড়েছো। এখন কলকাতা থেকে গাড়ী আনিয়ে আবার সেখানে ফিরে যেতেও তো রাত ভোরই হয়ে যাবে। ব্যবস্থা করতে বলছি—তোমার বাড়ীতে খবর দেবার। বাড়ীতে সবাই ভাবছেন তো?'
'সবাই ভাবেন তো,' এইটুকু বলেই থেমে গেলেন ভদ্রমহিলা।
সোনালী কোথায় যাচ্ছিল, কেন যাচ্ছিল, এতদূর পথে রাতে এমন একবস্ত্রে একলাই বা যাচ্ছিল কেন. এসব অশিষ্ট প্রশ্নের দিক দিয়েও গেলেন না।
এমন কি নারীর সহজাত কৌতূহল দৃষ্টি নিয়ে দেখলেন না খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।
এই যে সোনালী বললে হাত মুখ ধোবার দরকার নেই, তৎক্ষণাৎ সেই 'অপ্রয়োজনের' ইচ্ছেটাকেই মেনে নিলেন, তার ওপর জোর করলেন না অনুরোধে ভেঙে প'ড়ে।
সোনালী যদি খেতে না চায়, যদি বলে দরকার নেই, নিশ্চয় মেনে নেবেন সে কথা 'খাও খাও' ক'রে পীড়ন করবেন না। অতিশয্য কিছুতেই নেই।
এমন কি চাকরটা পর্যন্ত এত শিক্ষিত যে, মনের বিরক্তি স্পষ্ট প্রকাশ করেনি। তবে চটেছে যে বিলক্ষণ তা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। শুধু মনিবের মান রেখে চলতে চুপ ক'রে আছে।
নাঃ, এদের প্রতি কৃতজ্ঞতার ভাষা নেই সোনালীর। যথেষ্ট কৃতজ্ঞ হয় সোনালী। না, সত্যিই ভদ্ররুচির মানুষ।

'মা, আমি বেরুচ্ছি তাহ'লে—' বলে নিরু (খুব সম্ভব নিরঞ্জন) দালানের মধ্যেকারই একটা দরজা দিয়ে কোন্ ভিতরে চলে যায় এবং মিনিট খানেক পরেই গায়ে একটা মোটা পাঞ্জাবী চড়িয়ে বেরিয়ে আসে। একটু হেসে সোনালীর দিকে তাকিয়ে বলে, 'জানি না আমার অভিযান সফল হবে কিনা, না হবার আশঙ্কাই পনেরো আনা, বাকী একআনার উপর নির্ভর। তবু চেষ্টা করবো। দয়া ক'রে আপনার ফোন নাম্বারটা—'

ফোন নাম্বার!
মুহূর্তে সোনালী অনেকগুলো মাইল অতিক্রম ক'রে পৌঁছে যায় একটা পরিচিত বাড়ীর দোতলার একটা ঘরে। যেখানে টেবিলল্যাম্পের সামনে টেবিলের উপর ঝুঁকে ব'সে এক জ্ঞানতপস্বী। সেই টেবিলের ধারে উঁচু টুলের উপর বসানো আছে টেলিফোন রিসিভারটা।
টেলিফোনের 'কল' লোকটার সমাধির মধ্যে সহজে সাড়া জাগাতে পারে না, বারবার চেঁচাতে চেঁচাতে তবে সমর্থ হয় তার ধ্যানভঙ্গ করতে।
সোনালী দেখতে পায় অলস হাতে রিসিভারটা তুলে নিয়েছে সে, তারপর এ পক্ষের বক্তব্য শুনে অবাক অবাক গলায় বলছে, 'তাই নাকি? এতক্ষণ ফেরেননি উনি? জানতাম না তো! আচ্ছা ঠিক আছে, আছেন তো কোথাও একজায়গায়।...কী

বললেন? কী হয়েছে গাড়ী বিগড়ে? ওঃ। আচ্ছা কাল সকালে যা হয় হবে। ধন্যবাদ, ছাড়লাম।'
এ ছাড়া আবার কি! আর কিছু নয়। এই এরা, এঁরা মনে মনে কত হাসবে! ভাববে, ওঃ মহিলাটির তো এদিকে এত অহংকার, অথচ দেখছি ঘরে ও'র কোনো মূল্যই নেই।
হঠাৎ অকারণ একটা রাগে সমস্ত শরীর জ্বলে ওঠে সোনালীর। থাক্, দরকার নেই খবর দেবার। কী কাজ যার উদ্বেগ নেই তার উদ্বেগ মোচনের চেষ্টায়।
চেয়ে দেখে সামনের ব্যক্তিটির দিকে।
পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে চেহারায় এসে গেছে ভদ্র ছাপ, সন্দেহ নেই ও এতক্ষণ ধ'রে প্রতারণা করেছে সোনালীর সঙ্গে। ওই ফণীটার সঙ্গে এক শ্রেণীভুক্ত ক'রে ওকে 'তুমি' বলেছে সোনালী, বকেছে ধমকেছে, কোনো প্রতিবাদ করেনি ও।
ওর ওপরেও রাগে আপাদমস্তক জ্বলে যায় সোনালীর। আর ঠিক এই মুহূর্তেই বিধবা মহিলাটি আর একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে বলেন, 'আচ্ছা মা, তুমি একটু বোসো, আসছি আমি।...ফণী, তুই আর একটা আলো নিয়ে যা দাদাবাবুর সঙ্গে।'
অর্থাৎ তিনি যাচ্ছেন অতিথি সৎকারের চেষ্টায়।
ফণী বোধ করি এই বেহায়া মেয়েটার সংস্পর্শ যতটা পরিহার করা যায় এই ভেবে নির্দ্দেশের সঙ্গে সঙ্গেই আলোটা হাতে তুলে ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়ায় দাদাবাবুর বেরোবার আশায়।

নিরু পকেট থেকে ছোট্ট একটা নোটবুক বার ক'রে বলে, 'কই বলুন।
'বলবো! কী বলবো?'
'আপনার ফোন নাম্বারটা। টুকে নিয়ে যাওয়াই ভালো। স্মৃতি-শক্তির ওপর বেশী চাপ না পড়ানোই উচিত।'
'ফোন নাম্বার দরকার নেই।'
'দরকার নেই! 'দরকার নেই' কথাটা এত সহজে উচ্চারণ ক'রে ফেলছেন কেন? দুনিয়াটা এমনই জায়গা, একবার যদি উচ্চারণ করেন 'দরকার নেই', তো আর সে দেবে না।'
'দুনিয়ার কাছে আমার কিছু চাইবার নেই।'
'এই সেরেছে! আপনি যে দেখছি মহাপুরুষের পর্যায়ে গিয়ে পড়েছেন!'...কিন্তু বাড়ীর লোকের উদ্বেগের কথা চিন্তা করুন একবার!'...
'আমার বাড়ীর কথা আমি ভাববো', নিতান্ত রূঢ়স্বরে ব'লে ওঠে সোনালী, 'আপনাকে আর ভাবতে হবে না।'
'কি হলো, আবার 'আপনি' কেন? বেশ তো সহজ ডাকটি ধরেছিলেন।'
আপনি। আপনি' ব'লে সম্বোধন ক'রে ফেলেছে বুঝি সোনালী। তাই ফেলেছে বোধহয়। অজ্ঞাতসারেই। কিন্তু অপ্রতিভ সে হবে না। তাই ব'লে ওঠে, 'ভেবেছিলাম মানুষটাও সরল।'
'সে ধারণা ভঙ্গ হবার হঠাৎ কি হলো?'

'জানি না। আমার যখন যা খুসি, তাই বলবো।'

আশ্চর্য, কিছুতেই আহত হয় না লোকটা। এই অকারণ ঔদ্ধত্যেও নয়।

'তাই বলবেন। 'তুই' বললেও আপত্তি নেই। শুধু নাম্বারটা—অন্তত বাড়ীর ঠিকানাটা—'

'না না না। বলছি আমার বাড়ীতে খবর দেবার দরকার নেই।'

'কী আশ্চর্য, এতক্ষণ তাহ'লে ব্যস্ত হচ্ছিলেন কেন?'

নিরু হতাশ ভাবে প্রশ্ন করে!

সোনালী সমান উদ্ধতভাবেই বলে, 'ব্যস্ত হচ্ছিলাম ফিরে যাবার জন্যে। বলেছি তো আমার জন্যে কেউ ভাববার নেই।'

খুব মৃদু একটি হাসির রেখা ফুটে ওঠে নিরুর মুখে, 'যেখানে আপনার অনুপস্থিতিতে উদ্বেগের আশঙ্কা নেই, সেখানে ফিরে যাবার জন্যে এত অস্থিরতা কেন? যাবেন কাল ধীরে সুস্থে গাড়ী ঠিক ক'রে। এসেই যখন পড়েছেন না হয় একটু দেখে যাবেন আমাদের গ্রামটা।'

সোনালী অবজ্ঞার সুরে বলে, 'দেখবার কিছু আছে নাকি?'

'আছে বৈকি' নিরঞ্জন গম্ভীর হয়ে যায়, মানুষ কত হতভাগা আর তার পরিবেশ কত হতচ্ছাড়া হতে পারে সেটাও তো দেখবার জিনিস!'

'দেখে কি হবে? কিছু প্রতিকার করতে পারবো?'

'অন্ততঃ গ্রামের জন্যে কিছু ভাবতেও তো পারবেন।'

'তার জন্যে তো আপনারাই রয়েছেন। খুব সম্ভব গ্রামোন্নয়ন নিয়েই প'ড়ে আছেন এখানে।'

'এটা আমার দেশ, এখানেই বড় হয়েছি, দু'দশ বছর ছাড়া বারবারই এখানে আছি, প'ড়ে থাকা মনে হয় না।'

'দু'দশবছর ছাড়া কেন? পড়াশোনার জন্যে?'

'ওই যাহয় কিছু।'

'হুঁ। তা এবাড়ীতে যদি বাস করেন, এমন পোড়োবাড়ী ক'রে রেখেছেন কেন?'

'এতবড় বাড়ী সারাই, অত পয়সা কোথা?'

'চমৎকার! বাড়ীর ছাতটা মাথায় নেমে আসুক তাও ভালো, কেমন? এই আমাদের দেশ! হতচ্ছাড়া কি অমনি হয়? কেন, এতবড় বাড়ী রাখারই বা দরকার কি? বেচে দিন না।'

'কিনবে কে? যারা আছে সবাই যে হতভাগা। তাছাড়া—'

'কি? কি তাছাড়া?'

'এই পোড়োবাড়ীটায় কিছু পোড়ো ছেলের জটলা হয় দুপুরবেলা।'

'ও ইস্কুল! খুব সম্ভব অবৈতনিক? আর সেটা আপনিই পড়ান?'

বিদ্রূপে ভুরুটা কুঁচকে আসে সোনালীর!

'আশ্চর্য অনুমানশক্তি তো আপনার! আমি কিন্তু আপনার সম্বন্ধে কিছুতেই কিছু অনুমান করতে পারছি না!'

'আপ্রাণ চেষ্টা করছেন নিশ্চয়?'

'না হলেও, করছি।'

আপনার মার কিন্তু এত কৌতূহল নেই।'
'বাঃ, উনি আমার মা একথা তো বলিনি আপনাকে?'
'ভগবান কাউকে কাউকে সহজাত কিছু ক্ষমতা দেন যাতে সে অনেক কিছুই নিজে বুঝে নিতে পারে।'
নিরু হেসে উঠে বলে, 'সব সময় পারে না।'
'ও। সেটা অপরের ছদ্মবেশের মহিমা।'
'ছদ্মবেশ!'
'তাছাড়া আবার কি?'
'বিশ্বাস করুন, ওইটাই আমার সত্যিকার বেশ, সচরাচরের বেশ!'
'কেন? কৃচ্ছ্রসাধন?'
'ওসব বড়-সড় কিছু না, প্রয়োজনের অতিরিক্তে আমার অস্বস্তি।'
'অথচ একজন ভদ্রমহিলার সামনে খালি গায়ে দাঁড়াতে আপনার অস্বস্তি নেই।'
কথাটা বলেই সোনালী স্তব্ধ হয়ে যায়। এ কী! একথা কেন বললো সে? ধরনের রূঢ় কথা বলবার ইচ্ছে তো তার ছিল না!
কিন্তু বেশী অবাক হবার কিছু নেই। ইচ্ছের বাইরেও অনেক কিছু করে মানুষ। গভীর স্তরের কোনও অদৃশ্য ইচ্ছে গোপনে ব'সে ধাক্কা মারে, সেই ধাক্কায় বাইরের ইচ্ছের কাঠামোটা ভেঙেচুরে বদলে যায়।
ধৈর্য্য হারাবো না ভাবলেও ধৈর্য্য বশ মানে না, রূঢ় হবো না ভাবলেও আত্মস্থতার অভাব ঘটে, নিরাসক্ত নিস্পৃহের ভূমিকা নেবো ভাবলেও নেওয়া হয় না।

নিরঞ্জন কিন্তু এবার অপ্রতিভ হয়।
কুণ্ঠিতস্বরে বলে, 'দেখুন বিশ্বাস করুন, ইচ্ছে ক'রে এটা করিনি। খালি-খালি হর্ণ শুনে মনে হলো নিশ্চয় কেউ কোনোরকম অসুবিধেয় পড়েছে, তাই যেমন ছিলাম তেমনিই ছুটে চলে গেছি। ধারণাই করতে পারিনি, আপনার মতো একজন ভদ্রমহিলাকে ওখানে এভাবে—'
'হুঃ থাক্। কই, এত যে পরোপকারের সখ, তা জিজ্ঞেস করলেন না তো যাচ্ছিলাম কোথায়।'
'সাহস হয়নি।' হেসে ওঠে নিরঞ্জন, 'যাচ্ছিলেন কোথাও অবশ্যই। অন্ততঃ এই হতচ্ছাড়া দেশের কোনো এক হতভাগার বাড়ীর উদ্দেশ্যে বেরোননি সেটা তো ঠিক।'
সোনালী সহসা ওর চোখের উপর অদ্ভুত একটা পূর্ণ দৃষ্টি মেলে মৃদুকণ্ঠে বলে, 'কে বলতে পারে সেটাই ঠিক?'
'অসম্ভব কথা কেউ বলে না।'
মাথা নীচু ক'রে বলে নিরঞ্জন ওর চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিলে।
সামান্যক্ষণ গভীর একটা স্তব্ধতা।
'দাদাবাবু!' ফণীর অসহিষ্ণু কণ্ঠ এসে ধাক্কা মারে এই স্তব্ধতার উপর, 'আসবেন, না আসবেন না?'

'দেখুন আমি যাই, একবার ঘুরে আসি। চেষ্টা করতে দোষ কি?'

'দোষ আছে। আমার দিক থেকে। আমার জন্যে আমি আপনাকে অনর্থক এত খাটাতে রাজী নই।'

'অনর্থক বলছেন কেন, আর আপনার জন্যে ভেবেই বা কুণ্ঠিত হচ্ছেন কেন? যে কেউ এভাবে অসুবিধেয় পড়লেই—'

'তার জন্যে এ উপকার করতেন আপনি, এই তো?' তীব্র অসহিষ্ণু স্বরে ব'লে ওঠে সোনালী, 'কিন্তু আমার জন্যে করতে দেবো না।'

রূঢ়তা রুক্ষতা তীব্রতা আর অসহিষ্ণুতা সোনালীর একেবারে মজ্জাগত হয়ে গেছে বলেই হয়তো মুহূর্তে মুহূর্তে কারণে অকারণে সেটা প্রকট হয়ে উঠছে।

কিন্তু এ-পক্ষের বুঝি মৃদুতাই মজ্জাগত, তাই সে মৃদু হেসে ব'লে ফেলে, 'আপনার মেজাজ দেখে মনে হচ্ছে বাড়ী থেকে রাগ ক'রে বেরিয়ে পড়েছেন আপনি। কিন্তু ছেলেমানুষী করবেন না, দিন দয়া ক'রে আপনার ফোন নাম্বারটা।'

বিদ্যুতের মতো একটা দুষ্টুমীর হাসি খেলে যায় সোনালীর মুখে,—তাইতো, এতেই তো ওকে বেশ জব্দ করা যায়। ছেলেমানুষের মতোই মাথা নেড়ে বলে, 'উঁহু, কিছুতেই না। দেখি, আপনি কি ক'রে পরোপকার করেন।'

'নাঃ, হার মানছি। কিন্তু 'আপনিটা'ই চালিয়ে যাচ্ছেন দেখছি। শুনে মনে হচ্ছে, কি যেন একটা লোকসান হচ্ছে আমার।'

কি বলতো সোনালী কে জানে, ঠিক এইসময় আবার মা এলেন হাতে একটা ছোট রেকাবী নিয়ে। আর সেটা যথাস্থানে দিতে ভুলে অবাক হয়ে বলেন, 'একি, তুই যাসনি?'

'কই আর গেলাম। ইনি যে আসল জিনিসটাই দিতে চাইছেন না।'

'আসল জিনিসটা!' আবার অবাক হন মা।

'ওঁর ফোন নাম্বারটা।'

'দিচ্ছেন না। ফোন আছে বাড়ীতে?'

'আছেন তো বলেছেন।'

'তবে?' সোনালীর দিকেই তাকান এবার তিনি।

দ্বিধা ত্যাগ করে মুখ তোলে সোনালী, 'দেখুন, ভেবে দেখলাম পনেরো আনাই যখন অনিশ্চিত তখন বাকী একআনার ওপর ভরসা ক'রে বৃথা এত চেষ্টা করাটা অর্থহীন। স্টেশন তো শুনেছি এখান থেকে অনেক দূর। তাছাড়া ওই জঙ্গল অন্ধকার—'

মহিলা হাসেন, 'জঙ্গল অন্ধকার এখানের লোকের অভ্যাস আছে মা।'

'তা হোক', সোনালী দৃঢ়কণ্ঠে বলে, 'একজনের দোষে আর একজন কষ্ট পাবে কেন? আমি এতক্ষণ ধ'রে নিষেধ করছিলাম ওঁকে।'

'দোষ আর কি। দৈবের কথা। গাড়ী-ঘোড়ায় এমন বিপদ তো ঘটেই। তবু ভগবান রক্ষে করেছেন যে কোনো এ্যাক্সিডেণ্ট বা ওইরকম কিছু হয়নি। কিন্তু বাড়ীতে তো সবাই নিশ্চয়ই সেই আশঙ্কায় অস্থির হচ্ছেন, যদি কোনোরকমে খবরটা—'

'থাক্ না', হেসে ওঠে সোনালী, 'হোক না অস্থির, দাম বাড়ুক আমার।

'তোমার মতো এমন একটি মেয়ের কি আর দাম বাড়বার অপেক্ষা বাছা?' মা হেসে

ওঠেন, 'সেরা দামের জিনিস।'
নিরু হেসে বলে, 'আমার সন্দেহ হচ্ছে মা উনি রাগ ক'রে বাড়ী থেকে চলে যাচ্ছিলেন।'
'রাখ্ তোর সন্দেহ। যাক, যদি স্টেশনে না যাবি তো খাওয়া দাওয়া কর্। তুমি মা, কিন্তু কী ভুল দ্যাখো, তোমার নামটা যে এখনো জিজ্ঞেস করিনি। ভুলটা শোধরাই। বলো শুনি।'
'নাম! আমার নাম সোনালী।'
'সোনালী।'
'হ্যাঁ, সোনালী সেন।'
'চমৎকার নামটি। উপযুক্ত নাম!' আমার এই বাউণ্ডুলে ছেলেটার নাম হচ্ছে নিরঞ্জন। তবে নিরু নামেই বিখ্যাত। কিন্তু ফণী কোথায় গেল? সে কি একাই—'
বাইরের দিকে তাকান তিনি।
'আজ্ঞে বড়মা', ফণী ঘরের মধ্যে এসে উঁকি মারে, একা চলে যাবার হুকুম পেলে এতক্ষণ পৌঁছে যেতাম।'
'আচ্ছা থাক, যেতে আর হবে না তোকে, আয় দিকি আমায় একটু সাহায্য ক'রে দিবি।'
আর যাই হোক, অতিথির প্রতি মন প্রসন্ন নেই ফণীর, তাই ভারী মুখে বলে, 'আবার এখন রান্না চাপাবে তো?'
'চাপাবো।' 'বড়মা' ধমকে ওঠেন তাকে, এখন দু'সের চালের ভাত চাপাবো। আমার জন্যে ভেবে সারা একেবারে।'
সোনালী ক্ষুব্ধস্বরে বলে, 'দেখুন দিকি আমার জন্যে কী অসুবিধেয় পড়া আপনার। ছি ছি। কিন্তু শুনুন, বৃথা আমার জন্যে কোন আয়োজন করবেন না, খাবার মতো অবস্থা নেই আমার।'
'কিছু করবো না, নির্ভয়ে থাকো তুমি বাছা। এখন এই মিষ্টিটুকু খাও দিকি—' ব'লে রেকাবীটা এগিয়ে দিলেন তিনি।
মিষ্টি বললে মিষ্টি! একটু টাটকা ছানা আর চিনি।
সোনালী আর একবার আপত্তি প্রকাশ করে, 'না, সত্যি না।'
'তবে থাক'—ব'লে চলে যান ভদ্রমহিলা।

নিরঞ্জন বলে, 'খেলে পারতেন। বাড়ীর গরুর দুধের! খুব সম্ভব এইমাত্র কাটানো হয়েছে।'
'কি আর করা, জীবনে অনেক জিনিসই 'মিস্' করতে হয়, এটাও নাহয় করলাম। এই বইয়ের কালেকশান কার?'
উঠে গিয়ে দেখতে দেখতে বলে সোনালী।
'কিছু আমার, কিছু আমার বাবার।'
'ও। সুনেত্রাদেবী কার নাম?'
'আমার মার।'

'মার ? আপনার মার নাম ? আশ্চর্য্য তো ?'
'কেন, আশ্চর্য্যের কি আছে ? খুব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চোখ না থাকলে বুঝি আর তাকে 'সুনেত্রা' বলা চলে না ?'
'ধেৎ। কি যে বলেন। নামটা বেশ আধুনিক-আধুনিক তাই বলছি। বইগুলো একটু দেখতে পারি ?'
'নিশ্চয় ! আপনিও কি যে বলেন।'

সেল্‌ফের মাঝখান থেকে এক একখানা বই টানে সোনালী, উল্টোয় আবার রেখে দেয়, তারপর ব'সে প'ড়ে হেসে বলে, 'পড়তে খুব ইচ্ছে করছে, কিন্তু বিদ্যুতের আলোয় ঝলসানো চোখ অক্ষমতা প্রকাশ করছে !'
'অভ্যাসের দোষ।'

সোনালী আবার ফিরে এসে ব'সে প'ড়ে বলে, 'আপনি আমাকে যে তখন কি ভাবলেন ! মনে ক'রে ভীষণ লজ্জা করছে।'
'লজ্জার কি আছে ? চাষাভুষোর মতো চেহারা নিয়ে দাঁড়ালে লোকে আর কি ভাববে তাকে ? আমার তো মজাই লাগছিল।'
'মজা ! আমি হলে কিন্তু রেগে আগুন হতাম।'
'সেটা অনুমান করছি।'
'অনুমান করছেন ? কি ক'রে ?'
'সর্ববিষয়কে অগ্নিশিখার সাদৃশ্য দেখে।'
চমকে মুখ তুলে তাকায় সোনালী, তারপর তীক্ষ্ণস্বরে বলে, 'এভাবে প্রশস্তি গাওয়াটা বোধকরি আপনার অভ্যস্ত বিদ্যা ?'
'না, কোনোদিন না।' নিরঞ্জন গাঢ়স্বরে বলে, 'এইমাত্র দেখছি বিদ্যাটা আপনিই এসে যাচ্ছে।'
'কেন ?
'কি জানি। খুব বেশী অভাবনীয় একটা কিছু ঘটলো ব'লে বোধ হয়। সত্যি স্বপ্নের মধ্যেও একটা অভাবনীয়তা কল্পনা করা যায় না। আপনার আজকের এই দুর্বিপাক আমার কাছে—'
'কি আপনার কাছে ?'
'কিছু না এমনি।'

সহসা দু'জনেই কেমন স্তব্ধ হয়ে যায়।
কে জানে কতক্ষণ ছিল দু'জনে পরস্পরের দিকে না তাকিয়ে, অথচ কাছাকাছি ব'সে ঃ
'দাদাবাবু, দিদিমণি মা ডাকছেন।'
'চলুন।'
'চলুন।'
সহসা অনুভব করে সোনালী, খিদে পেয়েছে বটে।
ভিতর বাড়ীতে নিয়ে যায় ফণী আলো ধ'রে ধ'রে।

দেয়াল ভাঙা ভাঙা, কিন্তু মেজেটা পরিষ্কার। নিকানো মাজা মাজা উঠোন, ধারে ধারে ফুলগাছের সারি, ঝিরঝিরে বাতাস, জানা-অজানা নানা ফুলের গন্ধে সে বাতাস অলস আবেশময়।
এই বাতাসে সমস্ত চপলতা স্তব্ধ হয়ে যায়, সমস্ত বাচালতা মূক হয়ে যায়।
বাড়ীটা নতুন চকচকে হলেই বুঝি এই ছন্দে ছন্দপতন হতো।

কোথায় যেন চলে এসেছে সোনালী, কোনো পূর্বজন্মের অতীতে। কি যেন এক হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি ধরা অধরার লুকোচুরি খেলায় উতলা ক'রে তুলছে তাকে।
সোনালী কি কিছু হারিয়ে ফেলেছে?
সোনালী কি হঠাৎ কিছু পেয়েছে?

খাওয়ার পর সুনেত্রাদেবী নিয়ে এলেন সোনালীকে শোবার ঘরে।
দালানের সংলগ্ন ছোট্ট একটি ঘর, দালানের যেদিকে সুনেত্রার নিজের চৌকী পাতা সেদিকে। হাত বাড়ালে দরজায় হাত ঠেকে।
'বলতে গেলে একই ঘর', বললেন সুনেত্রা, 'নির্ভয়ে শোও তুমি, এই পর্দাটা টানা রইলো, ইচ্ছে করলে দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ ক'রে দিতে পারো। ওদিকে আর একটা দরজা আছে, সেদিকটা ভাঙা—সে দরজা খোলা হয় না। এই পাখা রইলো, এই খাবার জল, শুয়ে পড়ো।'

সুনেত্রা চলে আসতেই দরজাটা সোনালী বন্ধ করেই দিলো। নিভিয়ে দিলো টেবিলে বসানো বাতিদানের জ্বলন্ত বাতিটা। খুলে দিলো সমস্ত জানলা।
ছোট্ট ঘর হ'লে হবে কি—সব দেওয়ালে দেয়ালজোড়া জানলা, সবগুলো খুলে দিতেই জ্যোৎস্নায় ভ'রে গেল ঘরখানা।
এখানেও একহারা একখানা চৌকীতে পরিপাটি একটি বিছানা, মাথার কাছে টেবিল, টেবিলে বাতিদান আর ফুলদানী।
পোড়ামাটির গায়ে ছাঁচের কাজ করা সুন্দর ফুলদানী, তাতে কয়েকটি চাঁপা ফুল।

'রুচি আছে এঁদের।' মনে মনে বললো সোনালী।
বললো কেমন যেন আবিষ্টের মতো খোলা জানলার দিকে তাকিয়ে ব'সে।

আজ সন্ধ্যা থেকে যা কিছু ঘটেছে তা পর্যালোচনা করতে পারলে হয়তো সোনালী মনস্তত্ত্বের নতুন কোনো তত্ত্ব আবিষ্কার করতে পারতো। কিন্তু সেই তীক্ষ্ম মনটার সন্ধান আর পাচ্ছে না সোনালী।
সব কেমন ঝাপসা লাগছে।
এসব কি সত্য?
এই ঘর এই বিছানা, ওই জানলা আর জানলার বাইরের ঝিঁ ঝিঁ ডাকা অন্ধকার, এসব কি বাস্তব, না স্বপ্ন?
আর সোনালী নিজে?

সব কেমন ঝাপসা লাগছে।
এমন অদ্ভূত পরিস্থিতি কবে ক'জনের ভাগ্যে ঘটে?
এই একটু আগে সেই ফুলের গন্ধে উতলা বাতাসে খোলা রোয়াকে পিঁড়ি পেতে ব'সে খেয়ে এলো যে মানুষটা, সে কে? যখন খেয়েছিল তখন কি প্রকৃতিস্থ ছিল? ছিল আত্মস্থ? তবে কেন কিছুই মনে পড়ছে না।
মনে পড়ছে না কি খেয়েছিল, কি বা কথা বলে ছিল।
অথচ এটা মনে পড়ছে বলেছিল কথা, হয়তো খেয়েও ছিল সবই, যা কিছু পরিবেশন করেছিলেন সুনেত্রা।
নেশাচ্ছন্নের মতো সমস্ত চৈতন্য যেন কুয়াসা ঢাকা।
অথচ ঘুমও আসছে না।
পরের বাড়ীতে অচেনা বিছানায় ঘুম কি আসে?

এ ঘরটা কার শোবার ঘর?
চারদিকে তাকিয়ে দেখলো সোনালী মোমবাতির মৃদু আলোয়, বিছানা আর টেবিল বাদে আর বিশেষ কিছু নেই, কেমন যেন রিক্ত রিক্ত চেহারা, কোনো মানুষের স্থায়ী উপস্থিতির চিহ্ন বহন করছে না।
বোধ করি এ ঘর কারুরই শোবার ঘর নয়। অতিথির জন্যে প্রস্তুত থাকে। থাকে সরু খাটে বিছানা পাতা।

কৃষ্ণপক্ষের রাত।
রাত যত গভীর হচ্ছে চাঁদ তত উজ্জ্বল হচ্ছে। জানলার বাইরের ঝোপজঙ্গলগুলো এখন আর জমাট অন্ধকারের চাপ ব'লে মনে হচ্ছে না, ছাড়া ভাবে দেখা যাচ্ছে।
জানলার ধারে এসে দাঁড়ালো সোনালী।
ঠাণ্ডা একটা বাতাসের শিহরণ।
কিন্তু ও কি?
ঠাণ্ডা বাতাসের শিহরণের চাইতে অনেক তীব্র বিদ্যুতের মতো একটা শিহরণ খেলে গেল সর্বাঙ্গে।
ওখানে, ওই মাঠের মাঝখানে এত রাত্রে ঘুরে বেড়াচ্ছে কে?
কী দরকার ওর এমন ক'রে ঘুরে বেড়াবার খালি গায়ে জ্যোৎস্নার প্রলেপ মেখে।
'বিশ্বাস করুন, ছদ্মবেশে নয় ওইটাই আমার স্বাভাবিক বেশ, সচরাচরের বেশ।'
হ্যাঁ, বিশ্বাস করছে সোনালী। বিশ্বাস ক'রে মুগ্ধ হয়ে বলছে, এমন বলিষ্ঠ পুরুষদেহের এই বেশই স্বাভাবিক হওয়া উচিত।

কিন্তু ও জেগে কেন?
ও ঘর ছেড়ে বাইরে কেন?

আস্তে আস্তে তখনকার কিছু কিছু কথা মনে পড়ছে।
সুনেত্রা তাঁর ছেলের গুণের কথা গল্প কর ছিলেন তখন।

একরাশ পাশ ক'রে, দেশ-বিদেশ থেকে বিদ্যে আহরণ ক'রে এসে ছেলে ও'র এখন গ্রাম-সেবা নিয়ে মেতে আছে, এই কথাটাই বোঝাচ্ছিলেন তিনি। বলছিলেন তাই কি গভর্ণমেন্টের সাহায্য নেবে ?
নেবে না।
নিজের চেষ্টায় আর গ্রামের লোকের সহযোগিতায় যা পারবে করবে।
বাপ-ঠাকুর্দার ভিটেটা ছিল তাই চলছে—অনেক কিছু। স্কুল, তাঁতশালা, পোলট্রী ! গোড়ায় কি কম বেগ পেতে হয়েছিল ? গ্রামের লোক বিশ্বাসই করতে চায় না ! তাছাড়া 'শ্রমদানে'র মূল্য তো দূরের কথা, মানেই বোঝে না কেউ।

ছাড়া ছাড়া ছিটে ছিটে ভাবে মনে পড়ছে কথাগুলো।

খাওয়ার পর আবার সেই দালানে এসে বসেছিল খানিকক্ষণ, দেখছিল সুনেত্রার টেবিলের বই দু'খানা উল্টে। না গীতা নয় ভাগবত নয় যোগবশিষ্ঠ রামায়ণও নয়, আধুনিক দু'জন লেখকের দু'খানা অতি আধুনিক উপন্যাস। দেখে একটা সুস্থ হাওয়ায় হাঁফ ফেলে বেঁচেছিল সোনালী।
মাঠে ঘুরে বেড়ানো লোকটার কি প্রাণে সাপের ভয়ও নেই ? ওই বিশ্রী জায়গায় সাপ বেরোতে পারে না রাত্রে ? এত বেপরোয়া কেন !
আশ্চর্য্য, কেউ তো ওকে বারণও করছে না।
কিন্তু কে করবে ?
কে আছে ওর বারণ করবার ?
মা ?
মা কি সারাদিনের কর্মক্লান্ত শরীর নিয়ে জেগে থাকতে পারেন ?

আচ্ছা, সোনালী তো দেখছে।
সোনালীর কি উচিত নয় ওকে সাবধান ক'রে দেওয়া ?
অনেকক্ষণ ধ'রে উচিত অনুচিতের দ্বন্দ্ব চললো, তারপর তাকিয়ে দেখলো দরজার দিকে। ও দরজাটায় নিষেধ, এ দরজাটা সুনেত্রার মাথার কাছে। কোনোটাই সহজ নয়। কিন্তু সহজ হলেই কি সহজ হতো ? অতএব এই জানলাই রইলো শেষ কথা।
জানালায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো সোনালী। কোনো একসময় যেন নিশাচর মানুষটা কাঁটাবন ডিঙিয়ে জানলার কাছ বরাবর এলো, দাঁড়ালো, চেয়ে থাকলো কিছুক্ষণ, আবার চলে গেল। জানলার নীচে দিয়ে চলে গেল। কথা বললে বলা অসম্ভব ছিল না, কিন্তু সাপের জন্যে সাবধান করা হলো না।
অথচ যেতো। একটু চেঁচিয়ে বললে অনায়াসেই শুনতে পেতো লোকটা।
আরো কতক্ষণ চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো সোনালী, তারপর কখন ঘুমে শরীর ভেঙে এলো। কখন যেন শুয়ে পড়লো।
পরের বাড়ীতে অচেনা জায়গায় ঘুম ? তা আসে বৈকি। শ্বাস-প্রশ্বাসের গভীর শব্দ জানিয়ে দিচ্ছে সোনালী ঘুমিয়ে পড়েছে।

ঘুম ভাঙলো অনেক বেলায়।
সুনেত্রার ডাকে।
চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে মৃদু ডাক দিচ্ছেন তিনি।
'কী আশ্চর্য, আপনি! না না ছি ছি, আমায় একটু আগে ডেকে দিলেন না কেন? আমি তৈরি করতাম চা।'
সুনেত্রা হেসে উঠলেন, 'আমাদের চা-টা পরে তৈরি, কোরো এখন খেয়ে নাও। তোমরা বাছা শহরের মানুষ, নিশ্চয় বেড্-টি খাওয়া অভ্যেস।'
'না না, ওসব কিছু না।'
লজ্জিতভাবে বলে সোনালী।
'তা আজ একদিনই নয় খাও।' সুনেত্রা সামনে একটা টুলে ব'সে বলেন, 'এ শহুরে অভ্যেসটুকু আমারও আগে ছিল, কিন্তু গ্রামে বাস করতে করতে কখন যে সে অভ্যেস ঝ'রে পড়লো টেরও পেলাম না। কত অভ্যেসই এমন ঝরলো।'
'আগে বুঝি কলকাতায় থাকতেন?'
সোৎসুকে প্রশ্ন করে সোনালী।
'না কলকাতায় নয়, ওদিকে।' সুনেত্রা বুঝি একটা নিশ্বাস চেপে নিয়ে বলে, 'নিরুর বাবার কাজ ছিল দিল্লী, সিমলে, মান মর্যাদা বজায় রাখবার জন্যে ক্লেশ কত! হাসলেন সুনেত্রা, 'নিজের হাতে নিজের সংসারের কাজকর্ম্ম করবো তার জো নেই। হামেহাল নাকের সামনে চাকর খাড়া। কিন্তু কি আর করবে তারা, বার কতক চা-ই খাওয়াতো সেধে সেধে ডেকে ডেকে।'

স্তব্ধ হয়ে যায় সোনালী, এই সহজ কথাটুকুর মধ্যেকার প্রচ্ছন্ন ইতিহাসখানি অনুভব ক'রে।
আর যখন চেতনা হয়, তখন সমস্ত অন্তরাত্মা আর একবার ছি-ছি ক'রে ওঠে নিজের গত সন্ধ্যার আচরণ স্মরণ ক'রে।

'আপনাদের চা খাওয়া হয় নি?'
বোধকরি নীরবতা ভঙ্গ করতেই এই বাহুল্য প্রশ্ন।
'না, নিরু তো সেই কোন ভোরে বেরিয়ে গেছে। ফণীও গোয়ালের কাজ নিয়ে ব্যস্ত, নিরু আসুক।'
'কোথায় গেছেন।'
যেন কোনো ঔৎসুক্য নেই, নেই কোনো আগ্রহ, শুধু একটু সাধারণ কথা।

সুনেত্রা বলেন, 'ওই যে সেই মোটর মেকানিকের সন্ধানে। সাড়ে সাতটা থেকে যতসব বাস লরী ছাড়তে থাকবে, মিস্ত্রিগুলো তখন কাজে আটকা প'ড়ে যায়, তার আগেই যাতে—'
'আমার জন্যে আপনাদের কত বিব্রত হতে হলো!'
'এর আবার বিব্রত কি মা?' সুনেত্রা প্রসন্ন মুখে বলেন, 'আমার ক্ষ্যাপা ছেলে এটুকুতে বিব্রত বোধ করে না। ওই করতেই তো আছে। কারুর একটু কাজে

লাগতে পারলে—তাছাড়া যদি বিপ্রতী বলো', হাসেন সুনেত্রা, 'তার বদলে কতখানি লাভ হলো আমাদের বলো তো ?'
'লাভ।'
'লাভ বৈকি ! তোমার মতো এমন একটি মেয়ে পাওয়া কি কম লাভ মা ?'
'হয়তো জীবনে আর আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে না।'
যেমন গভীর স্বর জীবনে কোনোদিন বলেনি সোনালী, হয়তো যে গভীরতর স্তরের সন্ধানও জানতো না কোনোদিন সেই গভীর স্বরে কথা বলে সোনালী, সেই গভীরতর স্তর থেকে উঠে আসে একটি ভারী নিশ্বাস।

সুনেত্রা বৃথা হৈ-হৈ করেন না, 'না না সে কি, আবার দেখা হবে বৈকি', ব'লে স্তোক দিয়ে শুধু তিনিও গভীরস্বরে বলেন, 'হয়তো হবে না। তবু এই পাওয়ার জমাটুকু তো রইলো ? আমার ঘরে এমন মেয়ে তো জীবনে কখনো আসবেনা।'
এই আক্ষেপটুকুর মধ্যে রইলো অনেকটা কথা। অনুক্তর মধ্যে উক্ত হলো বাংলার মাতৃমনের আশা আর হতাশা।
আদর্শবাদী সন্তানের মা হওয়া গৌরবের নিশ্চয়, কিন্তু গৌরবের মধ্যেই তো লুকিয়ে থাকে দুঃখ।
সাধারণ হতে না পারার দুঃখ, সহজ হতে না পারার দুঃখ।
সকালের আলোয় সুনেত্রার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দেখলো সোনালী—সুনেত্রার ক্ষেতখামার, ফুলবাগান, নিরঞ্জনের স্কুল, তাঁতশালা।
তারপর এলো নিরঞ্জন।
'ঠিক হয়ে গেছে আপনার গাড়ী।'
ঠিক হয়ে গেছে !
ঠিক হয়ে গেছে।
কথাটা হাতুড়ীর ঘায়ের মতো বুকের মধ্যে এমন ক'রে বাজতে থাকে কেন ?
সোনালী কি আশা করছিল ঠিক হবে না। এত সহজে ঠিক হবে না। থেকে যেতে পারে সোনালী আরও কিছুক্ষণ। গ্রাম্যপ্রকৃতি কি তার সরল সৌন্দর্যের ডালি হাতে নিয়ে দুর্নিবার আকর্ষণে টানছে সোনালীকে ?
'ঠিক হয়ে গেছে ?'
'হ্যাঁ।'
'এত শীগগির ?'
'বিশেষ কিছুই হয়নি। তবে তেলটা ফুরিয়েছিল।' আবার আশায় স্পন্দিত হয় বুক।
'তবে ? এখানে তেল জোগাড় করা তো—' খুব যেন চিন্তায় পড়েছে সোনালী।
'না, ওটা একেবারে সংগ্রহ করেই আনলাম।'
সংগ্রহ করেই আনলাম !
তার মানে যত শীগগির সম্ভব সোনালীকে বিতাড়ন করা !
হঠাৎ ভয়ানক একটা রাগ হয় সোনালীর, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে, 'এসবের জন্যে টাকা ব'লে একটা জিনিসের তো দরকার হয়, যাবার সময় ব'লে গেলে পারতেন।'
সুনেত্রা একটু অবাক হয়ে তাকান।

এতক্ষণের সেই উজ্জ্বল উচ্ছ্বল প্রাণচঞ্চল মেয়ের সহসা এমন রুদ্ররূপ কেন !
ওই মুখের দিকে একবার তাকান সুনেত্রা, একবার নিজের ছেলের মুখের দিকে, একটু স্তব্ধ হয়ে যান, তারপর আস্তে আস্তে বেরিয়ে যান ঘর থেকে।

কিন্তু ওই নিঃশব্দ প্রস্থান বুঝি এদের নজরে পড়ে না। ওরা শুধু পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে কয়েকটি মুহূর্ত।
তারপর নিরঞ্জন বলে, 'টাকা নেবো বৈকি, শুধু টাকা কেন, আনা পাই সবই নিখুঁত হিসেব ক'রে নিয়ে নেবো।'
'তা তো নেবেনই! পাছে আর একটা বেলা আপনাদের অতিথি হতে যাই, তাই তাড়াবার জন্যে ব্যস্ততার সীমা নেই। মানুষ তো অতিথিকে একবার অফারও করে 'এবেলাটা থেকে যান, একমুঠো ভাত খেয়ে যান।'
'হয়তো করে। যে অতিথি সহজপ্রাপ্য তাকে হয়তো করে। দুর্লভ অতিথির জন্যে কি সাধারণ ব্যবস্থা চলে?'
'ছাই দুর্লভ। কাল থেকে খালি জ্বালাতন করলাম।'
'দোহাই আপনার, ওই সাধারণ কথাগুলো থাক্।'
'তবে কি বলবো বলুন?' সোনালী যেন হতাশ সুরে বলে, 'অসাধারণ কথার স্টক কোথায়?'
'নাই বা কথা হলো! কথা সকলের মুখে মানায় না। নীরবতা অনেক বেশী অর্থবহ। কিন্তু থাক্ কতকগুলো অর্থহীন কথায়, কি বলুন?' হেসে ওঠে নিরঞ্জন, 'চলুন। উঠবেন চলুন আপনার রথে। তারপর এই হতচ্ছাড়া দেশের হত-ভাগাদের চোখে ধুলো উড়িয়ে এগিয়ে যান তাদের নাকের ওপর দিয়ে।'
সোনালী অদ্ভুত একরকম হেসে বলে, 'ধরুন যদি না যাই?'
'আহা। অপূর্ব!'
'ঠাট্টা করছেন? কিন্তু আপনাদের এই গ্রাম দেখে ইচ্ছে হচ্ছে থেকে যাই।'
'ওটা শহরবাসীদের প্রচলিত কথা। আবার স্বস্থানে ফিরে গেলেই মনে হবে 'ইস্ অমন হতচ্ছাড়া দেশে মানুষ থাকে কি ক'রে।'
'ওঃ, ওই কথাটা আর ভুলতে পারছেন না দেখছি।'
নিরঞ্জনও বুঝি সোনালীর দেখাদেখি অদ্ভুত হাসি হাসতে শিখেছে, তাই সেই হাসির সঙ্গে একটি বঙ্কিমগভীর দৃষ্টি ফেলে বলে, 'সব কথা কি ভোলা যায়?'

না, সব কথা ভোলা যায় না।
সোনালী কি জীবনে কখনো ভুলতে পারবে এই জামতলা গ্রামকে?
শূন্য রাস্তায় ধুলো উড়িয়ে উড়িয়ে ছুটে চলেছে সোনালী নতুন মেরামত করা নতুন তেল ভরা গাড়ী ক'রে। গাড়ীটার গতিতে উদ্দাম প্রাণের আবেগ।
যন্ত্র জিনিসটা সহসা বিকল হ'য়ে থেমে গেলেও ভয় নেই, আবার মেরামত করা যায়। আবার চালানো যায় তাকে সহজ পথে, নির্ভুল পথে।

সেই নির্ভুল পথ ধ'রে চলেছে সোনালী। যে পথে কাল সন্ধ্যায় যাবার কথা ছিল।

শুধু যে জিনিসটাকে সহজ পথে নির্ভুল পথে চালানো নিজের হালের বাইরে, সে চলেছে আপন খেয়ালে।
তাই বান্ধবী নীপার বাড়ী যাবার পথে সোনালীর আর মনে হচ্ছে না উপহারের জিনিস নেই তার হাতে।
একশো টাকার সেই নোটখানা ভাঙিয়ে গাড়ীর তেলের দাম দিয়েছে সোনালী, দিয়েছে মোটর মেকানিকের মজুরি, বাকী ফেরতটা নিয়েছে হাত পেতে নির্ভুল হিসাবে, তবু বারে বারে হিসেবের গরমিল হয়ে যাচ্ছে যেন।
আচ্ছা, আসার সময় সুনেত্রার কাছে কি তেমন ক'রে বিদায় নেওয়া হয়েছিল? না কি ত্রুটি থেকে গেল? একটুখানি ব্যঙ্গ হাসি ফুটে উঠবে না তো তাঁর মুখে 'মেয়েটা কি অকৃতজ্ঞ' ভেবে?
আর নিরঞ্জন?
সুনেত্রার নেত্রের নিধি!
সে কী ভাবলো সোনালীকে? বাচাল? বেহায়া? বেশী 'গায়ে-পড়া'?
সোনালী বলেছিল, 'চলুন না আমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবেন। কত ট্রেন আছে ফেরবার।'
কই আর কথা রাখলো সে?
মৃদু হেসে বললো, 'কেন, এইতো বেশ দৃষ্টিপথ আচ্ছন্ন ক'রে ধুলো উড়িয়ে চলে যাওয়া।'
না কেউ বলেনি 'আবার আসবেন'। বলেনি 'যাবেন ওখানে'।

নীপা মিনিটখানেক স্তব্ধ থেকে ওর আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে গম্ভীরভাবে বলে, 'তুমি না তোমার প্রেতাত্মা?'
'যা বলিস।'
'চেহারাটি তো দেখছি একেবারে তাজা ঝকঝকে। চুলে একটু বিশৃঙ্খলা নেই, শাড়ীতে নেই একবিন্দু ধুলো, মনে হচ্ছে সকালবেলা সাবান ঘ'ষে স্নানও ক'রে এসেছিস।'
'ধারণা ভুল নয়।'
'ভুল নয়?'
'না।'
'গিয়েছিলি কোথায়?'
'কোথাও না।'
'ন্যাকামী রাখো। এ্যাক্সিডেন্ট যে ঘটেনি তা তো দেখা যাচ্ছে, গাড়ী আস্ত, তুমি আস্ত, ব্যাপারটা কি?'
ব্যাপার কিছুই না। কাল তোর নেমন্তন্নে এসে উঠতে পারিনি, আজ বাসি খেতে এলাম।'
'কোথায় গিয়েছিলি বলবি না?'
'কোথাও তো যাইনি, তা বলবো কি?'

'আমার সঙ্গেও এরকম চালাকী খেলবি? বেশ। কিন্তু গৃহকলহ যদি থাকে, আমার সঙ্গে কি? আমার কাছে এলি না কেন?'
'গৃহকলহ? এ কথা কে বললো?'
'ভয় নেই, গৃহস্বামী নয়। আহা, বেচারার কী অবস্থা কাল থেকে। বোস, সব কথা শুনবো পরে, আগে ওনাকে একটা খবর দিয়ে দিই। স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল এক ক'রে বেড়াচ্ছে ভদ্রলোক।'
'বড্ড বেশী অত্যুক্তি হয়ে যাচ্ছে না নীপা?'
'অত্যুক্তি?'
তা ছাড়া আর কি? যার যা অসাধ্য, সে তা—'
'অসাধ্য সাধন করিয়ে ছেড়েছো তুমি', ব'লে টেলিফোনটা তুলে নেয় নীপা।
'কে? ও তুমি। বাবু বাড়ী নেই?···কতক্ষণ বেরিয়েছেন?···ভোরবেলা? আচ্ছা এলেই ব'লে দিও তোমাদের মা এসেছেন···হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানেই আছেন।···হ্যাঁ ভালো আছেন।···ও সে কথা পরে শুনো। বাবুকে বলবে বাড়ী ফিরেই যেন সোজা এখানে চলে আসেন। হ্যাঁ হ্যাঁ আমার এখানে। বুঝতে পেরেছো তো আমি কে?···পেরেছো? ঠিক আছে। তোমাদের বাবু আজ এখানেই খাবেন ব'লে দিও সে কথা। এসেই চলে আসেন যেন।'
স'রে এসে বলে নীপা, 'এত ক'রে অনুরোধ করবার কথা নয়, হারানিধি পাওয়া গিয়েছে শুনে উন্মত্ত হয়ে ছুটে আসবার কথা, কিন্তু যা উদোমাদা মানুষ! হয়তো ভাববেন, 'যাক্, এসেছে ভালো আছে আর চিন্তার কি।'

'তা সত্যিই তো—আর চিন্তার কি?'
'বটে, প্রাণ থেকে বলছিস?'
'প্রাণ মন আত্মা সব থেকে বলছি।'
'তবে বৃথাই লোকটা কাল থেকে অস্থির হয়ে বেড়ালো?
'একেবারে বৃথা।'
'দেখ সোনালী, তোর রকম-সকম রীতিমত সন্দেহজনক, বল্ পোড়ারমুখী কোথায় গিয়েছিলি?'
এ জোর নীপা করতে পারে বটে। নীপা সোনালীর আবাল্যের সখী। নীপার কাছে কোনও দিন কোনও কথা গোপন করেনি সোনালী। এমন কি শশাঙ্কর ঔদাসীন্য অবহেলার কথাও।
নীপা অবশ্য বলে, 'অবহেলা নয়, ওকে বলে অন্যমনস্কতা,' কিন্তু সোনালী তা বলে না।
'কই, বললি না?'
সোনালী ওর উগ্র কৌতূহলে ভরা উৎকণ্ঠিত তাকিয়ে হেসে বলে. 'পৃথিবীর বাইরে।'
ভুরু কুঁচকে ওঠে নীপার।
'তুই ভেবেছিস কি? কাল থেকে কি ঘোড়দৌড়টা করিয়েছিস আমাদের তার ধারণা আছে? নিশ্চিত ভেবে ব'সে আছি কোন্ চুলোয় কোন্ খানাখন্দরের ধারে হাত পা

ভেঙে প'ড়ে আছিস, চোরে গায়ের গহনাগুলো খুলে নিয়ে গেছে—'
'আহা হা, ব'লে যা ব'লে যা। শেয়ালে কুকুরে চোখ নাকগুলো খুবলে খাচ্ছে! সত্যি, এত ভালোবাসিস আমাকে, যে কিছুতেই ভাবতে ইচ্ছে হলো না, আমি বেশ আছি খাসা আছি, নরম বিছানায় শুয়ে ঘুমোচ্ছি, কেমন? ভালোবাসার দাপটে আমার হাত পা ভাঙা রক্তাক্ত কলেবর ছাড়া আর কিছুই তোর চোখে ভাসলো না।'
'কথা দিয়ে কথা ঢাকিসনে সোনালী, এবার সত্যিই ভাবনা হচ্ছে আমার, কোথায় কী একটা ক'রে এসেছিস তুই।'
'আমার ওপর তো তোর অগাধ আস্থা দেখছি।'
'আস্থা ছিল, সত্যিই ছিল। কিন্তু আর থাকছে না। মনে হচ্ছে পোড়ারমুখী তুই নিশ্চয় শশাঙ্কবাবুকে বোকা বুঝিয়ে 'নেমন্তন্ন যাচ্ছি' ব'লে বেরিয়ে অভিসারে গিয়েছিলি।'
'যাক এতক্ষণে রহস্য উদঘাটন করলি তাহ'লে?'
'আচ্ছা, এ রকম করছিস কেন বল্ তো?' নীপা করুণ সুরে বলে, 'আমাকে না ব'লে পারবি তুই?'
'দেখি না চেষ্টা ক'রে পারি কি না।'
'কিন্তু তাতে তোর লাভ? বলতে বাধা কি? চেহারাখানি দেখে তো মনে হচ্ছে না বাপু অসহায়া রমণী কোনো দুর্বৃত্তের কবলে পড়েছিলে, অথবা ডাকাতের কবলে। সাপ, বাঘ, নেকড়ে, শেয়াল ধারে কাছেও আসেনি; এ্যাক্সিডেন্ট তো নয়ই, তবে এই—' আঙুল গুণে সময় হিসেব ক'রে বলে নীপা, 'আঠারোটি ঘণ্টা ছিলে কোথায়, করলে কি, তার হিসেব দিতে হবে না?'
'দিতেই হবে?' সোনালী একটি দুর্ভেদ্য হাসি হেসে বলে, 'এতবড় এই জীবনটা থেকে মাত্র আঠারো ঘণ্টা সময় চুরি ক'রে সরিয়ে রাখা যায় না?'
নীপা এবার গম্ভীর হয়ে যায়, সোনালীর আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলে, 'নাঃ এতক্ষণে বুঝতে পারছি কেস্ সিরিয়াস! 'অভিসার'টা আর ঠাট্টার কথায় থাকছে না। কিন্তু আমার অগোচরে তলে তলে কবে কি করলি?'
'ভাবো ব'সে ব'সে। নিষ্কর্মা মাথা তবু খানিক কাজ পাবে।'
'উচ্ছন্নে যাও তুমি, গোল্লায় যাও।'
ব'লে রাগ ক'রে উঠে যায় নীপা।
যায় রান্নার তদারকে।
শুধু সোনালী নয়, আপ্যায়িত করতে হবে শশাঙ্ককেও। সহজে যাকে ধ'রে এনে খাওয়ানো দাওয়ানো যায় না। 'আজ বড় প্যাঁচে পড়েছেন বাছাধন', নীপা ভাবে, গিন্নীটিকে আটকেছি, ছুটে আসতেই হবে।
কিন্তু আশ্চর্য্য। কিছুতেই কেন কোনো কথা বলছে না সোনালী। রহস্যকে জীইয়ে রাখবারও তো একটা সীমা আছে। তবে কি শশাঙ্ককেই প্রথম বলতে চায়? নিশ্চয় এই নেমতন্ন আসা নিয়ে শশাঙ্কর সঙ্গে কিছু একটা ঘটেছিল। তাই রাগ ক'রে কোথাও গিয়ে বসেছিল।
কিন্তু কোথায়?
সম্ভব অসম্ভব কোনো আত্মীয়-বন্ধুর বাড়ীই তো কাল থেকে খবর নেওয়া বাকী

থাকে নি। আর নীপা বা শশাঙ্কর অজ্ঞাত, কোথায় এমন আত্মীয় বন্ধু—

চিন্তায় ছেদ পড়লো নীপার।
ফোন এসেছে।
করছে শশাঙ্ক। সবিনয়ে জানাচ্ছে মধ্যাহ্ন ভোজনের নেমন্তন্ন নেবার সময় নেই তার। কিছু যেন মনে করে না সে আর সোনালী। ওই নেমন্তন্ন জিনিসটা ধাতে সয়ওনা তার। সোনালী এসেছে ভালো আছে, কোনো রকম বিপদ আপদ হয়নি, এটা যখন জেনেই যাওয়া গেল তখন আর শশাঙ্কর ব্যস্ততা কি? দুই সখীর সারাদিন প্রেমালাপ চলুক। সন্ধ্যায় তো আসছে সোনালী নিজের বাড়ী।

নীপা ব'সে পড়ে, রেগে বলে, 'এই লোককে থোড়াই কেয়ার ক'রে অভিসারেই যাওয়া উচিত তোর! ছি ছি, একটু ইয়ে নেই? কাল তো একেবারে মুখচোখ ব'সে শুকনো আম্‌সি হয়ে উঠেছিল। আর যেই শুনলেন নিরাপদে ফিরেছে, হয়ে গেল সব উদ্বেগ ঠাণ্ডা? এই মুহূর্তে ছুটে আসতে ইচ্ছে হলো না দেখবার জন্যে?'
সোনালী শ্রান্ত হাসি হেসে বলে, 'অবাক হবার কি আছে? ও তো ওই রকমই।'
'জানি না বাবা,' রাগে ঝলসে ওঠে নীপা. 'এতসব রাঁধতে দিলাম ঘটা ক'রে—'
'ভালোই তো। আমরা বেশী ক'রে খাবো।'
হেসে ওঠে সোনালী।
'রাগ হচ্ছে না তোর?'
সোনালী তেমনি শান্ত হাসি হেসে বলে, 'কই, টের পাচ্ছি না তো?'

না, সত্যিই টের পাচ্ছে না সোনালী।
অনুভব করতে পারছে না কোথাও কোনোখানে কোনো ক্ষোভ আছে কিনা তার। বুঝতে পারছে না কোথায় হারিয়ে গেল তার সেই সদাবিক্ষুব্ধ হৃদয়ের উত্তাল অভিযোগ, যে উত্তাল অভিযোগ উত্তাপ গতকালও তাকে রাগে অন্ধ ক'রে তুলেছে, ছুটিয়ে নিয়ে গেছে দিশাহীন বেপরোয়া পথে।
কোন্ মন্ত্রে সহসা বদলে গেল মনের সেই অন্ধকার রং?
সহসা সমগ্র পৃথিবীটা সোনালীর করায়ত্ত হয়ে গেল কি ক'রে? তাই সোনালীর আর অভাব নেই অভিযোগ নেই ক্ষোভ নেই। তাই কিছুই এসে যাবে না তার কারো আগ্রহে কি ঔদাসীন্যে।
যে জিনিসটা প্রতি মুহূর্তে যন্ত্রণা দিয়েছে সোনালীকে, ক'রে তুলেছে উগ্র অসহিষ্ণু হিংস্র, সে জিনিসটা সহসা এত তুচ্ছ এত মূল্যহীন হয়ে গেল কি ক'রে ভেবে পায় না সোনালী। অথবা ভাবেও না। শুধু অপূর্ব এক পূর্ণতার প্রশান্তিতে ভ'রে থাকে মন। যেন বাকি সমস্তটা জীবন জীবনে রয়ে যাবে এই পূর্ণতার স্পর্শ: অবোধ শশাঙ্কর কোনও ত্রুটিই সেখানে বিদারণ রেখা আঁকতে পারবে না।
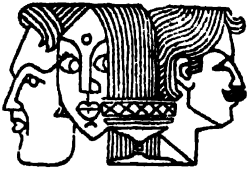
স্মারক

—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

বারো বছর। পুরো বারো বছর পরে লোকটা এই ছোট ঘরটিতে ফিরে এল।

স্টেশনের সামনের শিরিষ-গাছটা একটু বুড়িয়ে গেছে কেবল। হালকা হয়ে গেছে পাতাগুলো, একটা মোটা ডাল ভেঙে পড়বার পরে তার গোড়ার দিকটা কুঁজের মত উঁচু হয়ে আছে। কয়েকটা টিনের চালা ছিল, সেখানে একতলা বাড়ী উঠেছে গোটা-দুই। কাঁকরের রাস্তাগুলোতে পিচ পড়েছে, আর যেখানে একটা রেলিঙের ধার ঘেঁষে ঘোড়ার গাড়ীগুলো দাঁড়িয়ে থাকত, সেখানে সারি সারি সাইকেল রিক্শ অপেক্ষা করছে।

সুটকেস আর ছোট বিছানাটি হাতে লোকটা বেরিয়ে এল স্টেশনের বাইরে।

—আসুন, আসুন বাবু—কোথায় যাবেন ?

কতকগুলো সাইকেল রিক্শর ভেঁপু বাজল—সেই সঙ্গে সাদর আহ্বান।

—রিক্শ দরকার নেই, হেঁটেই যাব।

অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে লাগল লোকটা।

একটি চেনা-মুখ চোখে পড়ল না—একজনও চিনল না তাকে। তেরো বছরের সেই রোগা ছোট ছেলেটি আজ পঁচিশ বছরের জোয়ান। এর মধ্যে অনেক পোড় খেয়েছে সে, অনেক রোদে-জলে তাকে গড়ে উঠতে হয়েছে। বাবা হঠাৎ মারা গেলেন মোটর-অ্যাক্সিডেণ্টে, আই-এস্-সি পাশ করেই তাকে পড়া ছাড়তে হ'ল। তারপর এই ওষুধ-কোম্পানির চাকরি। সারা ভারতবর্ষ তাকে চক্কর দিয়ে ঘুরে বেড়াতে হয় ; রাত কাটাতে হয় কখনো ধর্মশালায়, কখনো ওয়েটিং রুমে, কখনো সুটকেস মাথায় দিয়ে ওভার-ব্রীজের ওপর, কখনো যে-কোনো রকমের যে-কোনো হোটেলে। এখন সারা শরীরে একটা রুক্ষ কর্কশতার ছায়া পড়েছে, চওড়া হয়েছে বুক—মোটা হয়েছে হাতের হাড়। তার ছেলেবেলার সেই ছ'টি বছর এই শহরের বুক থেকে কয়েকটা ঝরা-পাতার মতো হাওয়ায় হাওয়ায় কোথায় উড়ে গেছে, সে-ও আর এখানকার কেউ নয়।

এই তো রঘুবীরের পান-সিগারেট-সোডা-লেমনেডের দোকান।

দোকানের সামনে একবার সে দাঁড়িয়ে পড়ল। ছেলেবেলায় এখানে কিনেছে পিপারমেণ্ট, লজেন্স, লেমনেড খেয়ে গেছে সামনের আধভাঙা বেঞ্চিটায় বসে। নিকেলের চশমা-চোখে বুড়ো রঘুবীর পান সাজাতে সাজাতে হাতের খয়ের একটা লাল কাপড়ে মুছে ফেলে কাঁচের বোয়াম থেকে লজেন্স বের করে দিয়েছে, চার পয়সার কিনলে একটু হেসে দুটো ফাউ-ও দিয়েছে। কিন্তু আজ দোকানের সে

চেহারা নেই। অনেক বড় হয়েছে, টাঙানো রয়েছে আয়না—রঙিন ক্যালেণ্ডার আর ছবি ঝুলছে। আর ফর্সা গেঞ্জী গায়ে যে কুড়ি-বাইশ বছরের লোকটি বসে আছে—সে রঘুবীর নয়।

নন্দ? রঘুবীরের সেই বাচ্চা ছেলেটা? হয়তো সে-ই হবে। এখন রঘুবীরের সঙ্গে মুখের খানিকটা আদল আসে।

—সিজার্স দাও এক প্যাকেট—

সিগারেট কিনে আবার চলতে লাগল। একটা আস্তানা কোথাও খুঁজে নিতে হবে।

ছেলেবেলার স্মৃতির ভেতরে হাতড়ে হাতড়ে একটা কোনো হোটেলের কথা চিন্তা করতে লাগল! বাজারের সামনে সেই মুসলমানী হোটেলগুলোর কথা মনে আসছে। সেই কালো কালো চাটুর ওপর পাকানো পাকানো মোগলাই পরোটা—আর-একটা উনুনে লোহার শিক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কাবাব তৈরী করছে। ঘি আর ভাজা মাংসের গন্ধে ভরে গেছে চারদিক। কিন্তু সে নয়। একটা হোটেল তার চাই। এই শহরে কোথায় হোটেল ছিল? 'বিশুদ্ধ হিন্দু হোটেল'—এমনি একটা ভাঙা সাইনবোর্ড যেন স্মৃতির ওপর ভেসে উঠতে চাইল। কিন্তু কোথায়? কিছুতেই মনে আসছে না।

তখন চোখ পড়ল বাঁ-দিকে।

এই তো—এইখানে ছিল কামারশালাটা। হাপরের আগুনে থেকে থেকে আবছায়া টিনের ঘরটা লালচে হয়ে উঠত, গনগনে লোহা হাতুড়ীর ঘায়ে চারদিকে ঠিকরে দিত ফুলকি। ঘোড়াকে মাটিতে চিৎ করে ফেলে তার খুরে নাল ঠুকে দেওয়া কতদিন দেখেছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

সে কামারশালা নেই। হয়তো ঘোড়ার গাড়ীদের সঙ্গে-সঙ্গেই বিদায় নিয়েছে। তার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে একটা সাদা দোতলা বাড়ী। 'স্টেশন রোড হোটেল। আহার ও বাসস্থানের সর্বপ্রকার বন্দোবস্ত'।

তাহলে এখানেই আশ্রয় নেওয়া যাক্।

দোতলায় ডবল-সীট ঘর। সঙ্গী ইনসিয়োরেন্সের এক ভদ্রলোক হাসিখুশি চেহারার মাঝবয়েসী মানুষ।

—ক'দিনের জন্যে?

—তিন দিন।

—আমায় থাকতে হবে আরো সাতদিন।—ইনসিয়োরেন্সের লোকটির খুশিমুখে একটু বিরক্তির ছায়া পড়ল, বাজে জায়গা মশাই। তবে পুরোনো রাজবাড়ীটা একবার দেখে আসতে পারেন—ওদের মন্দিরটা চমৎকার। তাছাড়া আর কিছুই নেই।

ওষুধ-কোম্পানির এজেন্ট একটু হাসল। এই শহরে তার ছেলেবেলার অনেকগুলো দিন কেটে গেছে—সে-কথা বলবার উৎসাহ সে খুঁজে পেলো না।

—আর নিদারুণ মশা। মশারি এনেছেন তো?

—এনেছি।

—আচ্ছা, পরে কথা হবে। একটু কাজ আছে—বেরুচ্ছি।—ইন্সিয়োরেন্সের ভদ্রলোকটি ফোলিও-ব্যাগ বগলদাবা করে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেলেন।

দু'দিন ট্রেন-জার্নি করে শরীর ক্লান্ত। জামা-কাপড়ে কালি। একমুখ তীক্ষ্ণ বুনো-দাড়ি গজিয়েছে। বিছানাটা নেটের খাটিয়ার ওপর ছুঁড়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল লোকটা। বাইরের জানলা দিয়ে চোখে পড়তে লাগল দূরে সারি-সারি নারকেল-গাছের মাথা। বারো বছর আগে ওই গাছগুলো কি ওখানে ছিল? কে জানে!

তারপর চোখ ভরে ঘুম নেমে এল। একেবারে বেলা বারোটা পর্যন্ত। চাকর এসে স্নানের জন্য তাড়া না দিলে হয়তো বিকেল পর্যন্তই ঘুমিয়ে কাটত।

বেরোতে হ'ল বেলা দুটোয়। চোখ জ্বলছে—মাথা ভারী। তবু বসে থাকলে চলে না। একটা সাইকেল-রিক্শ নিয়ে বেরোলো বাজারের দিকে।

পুরোনো দোকানগুলো কয়েকটা টিঁকে আছে এখনো। গোটা দুয়েকের বেশ উন্নতি হয়েছে—বাকীগুলো যেন ভাঙনের মুখে। স্টক নেই—দোকানদারের চোখে-মুখে ক্লান্তি।

—আচ্ছা, রেখে যান স্যাম্পল্—দেখব।

নতুন দোকানগুলো ঝকঝক করছে। উজ্জ্বল সাইনবোর্ড—উৎসাহী তরুণ ডাক্তার। নতুন ওষুধগুলো নিয়ে আলোচনা তুললেন কেউ কেউ। দু'জন চা-ও খাওয়ালেন।

আর লোকটা তীক্ষ্ণ চোখ মেলে তাদের মুখগুলো চিনবার চেষ্টা করতে লাগল। এদের মধ্যে কেউ কি তার সহপাঠী ছিল—কেউ কি ছিল খেলার সঙ্গী? কিন্তু কাউকে সে চিনল না—কেউ তাকে চিনতে পারল না।

ঘণ্টা-তিনেক ঘুরে আবার সে পথে নামল। ছড়ানো চওড়া শহর—আর দিন-দুয়েকের কমে কাজ শেষ হবে না। কিন্তু আজ আর ভালো লাগছে না। অতৃপ্ত ঘুম আর ক্লান্তি সমস্ত শরীরকে যেন আচ্ছন্ন করে আনছে।

থাক্ আজ।

পথ চলতে চলতে মনের ভেতর একটা বিপুল শূন্যতা অনুভব করতে লাগল লোকটা। ভাবতে লাগল, এই শহর তাকে চিরদিনের মতো হারিয়ে ফেলেছে, চিরকালের মতো ভুলে গেছে তাকে। অথবা সবটাই তার স্বপ্ন। সে এখানে কোনোদিন আসেনি—কখনো ছিল না। নিছক অবাস্তব কল্পনার জাল বুনে নিজের অস্তিত্বটাকে এখানে সে তৈরী করে নিয়েছে—যেমন করে ছোট ছোট ছেলেরা রূপকথার রাজপুত্র হয়ে যায়।

একবার দাঁড়িয়ে পড়ল। সিগারেট ধরাতে গিয়েও ধরালো না—গলাটা জ্বালা করছিল। একটা সাইকেল-রিক্শ ডাকল, তারপর উঠে বসে বললে, হেন্রি-ময়দান।

হেন্রি-ময়দান?—রিক্শওলা একটু বিস্মিত হ'ল, তারপর বললে ওঃ—বুঝেছি। বাপুজী পার্ক!

সব বদলে গেছে। ইংরেজ জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের স্মৃতি আজ নিশ্চিহ্ন। অথবা হেন্রি-ময়দান কোনোদিনই ছিল না। সব তার অলস কল্পনা দিয়ে গড়া।

রিক্শ এগিয়ে চলেছে। বিকেলের পড়ন্ত হলদে আলোয় সব কেমন অদ্ভুত মনে হয়।

এই ছোট সাঁকোটা চিনি—কিন্তু ওই বড় লাল বাড়ীটা তো ছিল না। এখনকার সেই আমবাগানটা কোথায় গেল? ওই তো সুরমা ব্যানার্জি গার্লস স্কুল। কিন্তু কবে উঠল অতবড় তেতলা বাড়ী? হেড্‌-মিস্ট্রেসের কোয়ার্টার্সের সামনে ছোট মাঠটায় পায়চারী করতেন মোটা মানুষ তরুদি—তিনি কি এখনো আছেন? ছোট মাঠে অত ফুলগাছ কে লাগিয়েছে—দরজা জানালার পর্দাই বা ঝুলছে কেন।
চিনি মনে হয় আবার হারিয়ে যায় অচেনার ভেতরে। যেন খানিকটা স্বপ্ন, খানিক জাগরণ। কিছু বাস্তব-কিছু কল্পনা দিয়ে গড়া। সত্যিই কি আমি এখানে ছিলাম? ছিলাম কোনোদিন?
—এই তো বাপুজী পার্ক বাবু। কোনদিকে যাব?
—কোথাও যেতে হবে না। এখানেই নামব।
রিক্‌শর পয়সা মিটিয়ে দিয়ে সে মাঠের পাশের রাস্তা দিয়ে চলতে লাগল। মাঝখানের বড় বটগাছটা এখনো দেখা যায়। ওই টাউন ক্লাবের খেলার মাঠ—ওদিকে জেলা-স্কুলের গোল পোস্ট। একটু দূরে সার্কিট হাউসের মাথার ওপর এখনো ওয়েদারকক ঝুলছে। আর—
আর ডানদিকে 'হীরক কটেজ'।
একটু পুরোনো হয়েছে—গেটের গাঢ় সবুজ রঙ উঠে গেছে, বারান্দায় চেনে বাঁধা রয়েছে নেকড়ের মতো বিরাট এক আলসেশিয়ান। গেটের পাশে নামের ছোট একটি বোর্ড ঝুলছে: 'আর. কে. চৌধুরী, ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিসার'।
না—এইটুকু অন্তত স্বপ্ন নয়।
সেদিন এখানে থাকতেন মুনসেফ প্রশান্ত চক্রবর্তী—বাবার বন্ধু। আর—আর এগারো-বারো বছরের সেই ফুটফুটে মেয়েটি—ললিতা যার নাম!
ললিতা।
একসঙ্গে লুডো আর ক্যারাম খেলা—পেছনে নিমগাছের কোটরে বসে-থাকা প্যাঁচার জ্বলজ্বলে চোখদুটো দেখতে যাওয়া! তারপর—
মাঠের ভেতরে ওই তো সেই ছোট প্যাভিলিয়নটা! মিউনিসিপ্যালিটি কতদিন ওতে রঙ দেয়নি—এখন ফাটল ধরছে আস্তর পড়া দেওয়ালে। কিন্তু—
স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো লোকটা এগোলো সেইদিকেই।
এখন আর ভেতরে কেউ বসে না—বেদীটা ভাঙাচুরো। সে কাছে যেতেই দু-তিনটে ছাগল দৌড়ে পালিয়ে গেল।
একবারের জন্যে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। সেই লেখাটা। অনেক চেষ্টা করে কপিয়িং পেন্সিল দিয়ে লিখেছিল ছাতের গায়ে। আছে এখনো?
সঙ্গে ছিল বীরেন আর নীলু। প্রথম কৈশোরের যৌন-চেতনার অশ্লীলতায় কয়েকটা অস্বচ্ছ খারাপ কথা লিখেছিল দেওয়ালে। সেদিন তারও উৎসাহ দেখা দিয়েছিল, আর মনের কাছে আর কাউকে দেখতে না পেয়ে কপিয়িং পেন্সিল দিয়ে ছাতে লিখে দিয়েছিল—'আমি ললিতাকে ভালোবাসি'।
কিন্তু লজ্জায় মরে গিয়েছিল তারপরই। আর ললিতার দিকে তাকাতে পারেনি ভালো করে—কথা বলতে সাহস পায়নি। গ্লানিতে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল মন। যদি ওই লেখা ললিতা দেখে থাকে—যদি চিনতে পারে তারই হাতের লেখা বলে?

প্রশান্তবাবুদের বাড়ীর ত্রিসীমানাতেও আর সে এগোতে পারেনি—ললিতাকে স্কুলের রাস্তায় দেখলে অন্যদিকে পালিয়ে গেছে।

কয়েক মাস পরেই বাবা বদলি হয়ে গেলেন। জটিলতার বাঁকে বাঁকে ঘুরে এগিয়ে চলল জীবন? কোথায় একটা জলের বিন্দুর মতো নিশ্চিহ্ন হ'ল ললিতা। এখন সে কোথায় আছে—কার ঘর করছে কে বলতে পারে!

কিন্তু সেই লেখা—সে কি আজো আছে ওখানে?

ধীরে ধীরে সে পা দিলে প্যাভিলিয়নের ভেতরে।

শ্যাওলা-ধরা পুরোনো দেওয়ালে আজও নানা রকম লেখা, নামের স্বাক্ষর—তার সঙ্গে আজকের কিশোর-তরুণের টুক্‌রো টুক্‌রো মনোবিকার। মাথা তুলে সে তাকালো ওপরে। শ্যাওলা জমেছে, কিসের কতকগুলো শিকড় নেমেছে, আর তার ভেতরে আজো কপিয়িং পেন্‌সিলের বেগুনী রেখা একটু একটু করে চেনা যায়: 'ললিতাকে ভালো'—

সেদিনের সেই গ্লানি কোথায় মুছে গেল—জল নেমে এল চোখে। ওই লেখার টুকরোটুকু এক মুহূর্তে বারো বছর আগে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে—যেখানে নিজেকে সে অনধিকারী ভেবেছিল, সেখানে চকিতে তাকে আপন করে নিয়েছে। অশ্লীলতা? সারা জীবনের সঞ্চয়ের মধ্যে ওর চাইতে পবিত্র কিছু সে আর খুঁজে পেলো না।

মাঠের ওপর হলদে আলো এখন দিনান্তে লাল। ঝাপসা জলভরা চোখে সে ঘাসের ওপর এসে বসল। আর বারো বছর আগেকার পুরোনো হাওয়া ঘাস আর মাটির গন্ধ নিয়ে তাকে প্রদক্ষিণ করতে লাগল ঘিরে ঘিরে।

পুচ্ছা
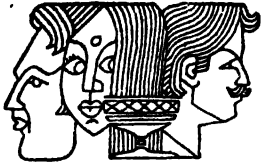
—বনফুল

অনেকদিন আগেকার কথা। তখন বোধ হয় ইণ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব। মণিহারী গ্রামে এখন যাঁহারা বাস করিতেছেন তখন তাঁহারা কেহ ছিলেন না। যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের কোনও ইতিহাস নাই। অত্যাচারিত নিপীড়িত লোকেরা লুপ্ত হইয়া যায়, কোনও চিহ্ন রাখিয়া যায় না। কিন্তু একেবারে যে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় একথাও নিঃসংশয়ে বলা শক্ত। মানুষের স্মৃতিতে ক্বচিৎ কখনও বাঁচিয়া থাকে তাহারা। মুখে মুখে তাহাদের কাহিনী অমর হয়। অনেক সময় সত্য রূপকথায় পরিণত হয়। কে জানে তেপান্তরের মাঠের গল্প, ঘুমন্ত রাজকন্যার স্বপ্নময় মোহ নিদ্রা, সোনার কাঠি রূপার কাঠির কাহিনী, রাক্ষস-খোক্কস—রাজপুত্রের গল্প এসব সত্য ইতিহাসেরই রূপান্তর কি না।

আমি এই গল্পটি শুনিয়াছিলাম আমাদের গাড়োয়ান পুচ্ছার মুখে। তাহার আকৃতি দেখিলে তাহার কথা কেহ বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে করিবে না। কুচকুচে কালো চেহারা। রোগা, সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকিয়া থাকে। গাড়ির গরু দুইটার সহিত ঝুঁকিয়া কথা বলিতে বলিতে তাহার সমস্ত দেহটার ঝোঁকই সামনের দিকে হইয়া গিয়াছে। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল কদম-ছাঁট। নাপিত পাইলে একেবারে মুড়াইয়া কাটিয়া ফেলে। লোচন-নাপিত ছাড়া আর কাহারও নিকট সে চুল কাটাইত না। কুৎসিৎ চেহারা লোচনেরও। গলায় প্রকাণ্ড গল-গণ্ড, একটা চোখ ছোট, আর একটা বড়। বেশ বড়, মনে হইত এখনই বুঝি ছিটকাইয়া বাহির হইয়া আসিবে। কিন্তু তাহার একটি প্রধান গুণ ছিল। জীবন্ত খবরের কাগজ ছিল সে। আশপাশের সমস্ত গ্রামের নিখুঁত সত্য খবর তাহার কাছে মিলিত। তাহার নিকট মাথাটি পাতিয়া দিয়া পুচ্ছা চোখ বুজিয়া চুল কাটাইত এবং গল্প শুনিত। লোচনের বাক্য বেদবাক্য ছিল তাহার কাছে। পুচ্ছার চেহারার আর-একটি বৈশিষ্ট্য ছিল—তাহার দুইটি চোখেরই বাহিরের কোণে সামান্য সামান্য পিঁচুটি জমিয়া থাকিত। মনে হইত দুইটি মুক্তার পুঁতি কে লাগাইয়া দিয়াছে যেন। একদিন পুচ্ছাকে বলিয়াছিলাম, পিঁচুটি মুছিয়া ফেল। পুচ্ছা রাজী হইল না, বলিল, লোচন মুছিতে মানা করিয়াছে। বলিয়াছে, চোখের বাহিরের কোণে ওইরকম পিঁচুটি জমিলে চোখের দৃষ্টিভঙ্গীই আলাদা হইয়া যায়। পুচ্ছা বা লোচন আফিং, গাঁজা বা কোকেন খায় না। স্বভাবতই তাহারা কল্পনা-প্রবণ। তাহারা যে একেবারেই নেশা করে না, তাহাও নয়। খৈনি খায়। পুচ্ছা বেশী কল্পনা-প্রবণ। সে যদি লিখিতে পড়িতে জানিত, কিম্বা ছন্দ মিলাইতে পারিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই কবিখ্যাতি জুটিত তাহার ভাগ্যে। কিন্তু তাহার বিরাট কল্পনা সত্ত্বেও সে গাড়োয়ানই রহিয়া গেল। তাহার পিঠ-ভরা দাদ ছিল। কাঁধ হইতে কোমর পর্যন্ত। গাড়ি হাঁকাইতে হাঁকাইতে সে কাঁধ দুইটা নাড়াইত মাঝে মাঝে। তাহার পর হঠাৎ গাড়ি থামাইয়া বলিত—ভাগ্, ভাগ্ আব্। পালা, পালা এবার বলিয়া হাতের

দাঁঠিটি দিয়ে চুলকাইতে। প্রথম প্রথম আমি বুঝিতে পারিতাম না, ব্যাপারটা কি। দাদের সহিত কথা কহিতেছে কেন? একদিন জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলাম তাহার দৃষ্টি-ভঙ্গী কবিজনোচিত। পিঠের দাদকে সে দাদ বলিয়াই মনে করে না। তাহার বদ্ধ ধারণা, তাহার পিঠে লাল পরী এবং নীল পরী আসিয়া নাচে। ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচে বলিয়া পিঠে গোল গোল দাগ। ডাক্তাররা যাহাকে রিং-ওয়ার্মের রিং বলিয়া মনে করেন, পুচ্ছার মতে তাহা পরীর পায়ের দাগ! তাহাদের পায়ে না কি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নখ আছে, সেইজন্যই তাহারা যখন নাচে তখন সমস্ত পিঠটা চুলকাইয়া ওঠে। নৃত্য উদ্দাম হইলে পুচ্ছা আর সহ্য করিতে পারে না, বলিয়া ওঠে, 'ভাগ্, ভাগ্ আব্' এবং লাঠি দিয়া পিঠ চুলকাইতে থাকে।

যে গল্পটি বলিতে যাইতেছি, এই পুচ্ছার মুখেই সেটি শুনিয়াছিলাম। খুব সম্ভবত ইহা ইতিহাস-সম্মত সত্য নয়, কিন্তু ইহার সত্যতা সম্বন্ধে পুচ্ছার কোনও সন্দেহ নাই। সে যাহা বলিয়াছিল তাহার মতে তাহা খাঁটি সত্য।

অন্ধকার অমাবস্যা রাত্রে গরুর গাড়ি করিয়া ফাঁসিয়া-তলার মাঠে যাইতেছিলাম। সেখানে আমাদের কিছু জমি ছিল এবং সে জমিতে মকাই বোনা হইয়াছিল। মকাই শুধু মানুষের খাদ্য নয়, শৃগালেরও খাদ্য। কচি মকাই খাইতে তাহারাও ভালবাসে। অন্তত, পুচ্ছা তাই বলে। মকাই-ক্ষেতে রাত্রে পাহারা দিবার জন্য পুচ্ছা রোজ গরুর গাড়ি চড়িয়া যাইত। একদিন আমিও তাহার সঙ্গী হইলাম।

'ফাঁসিয়া-তলা' এবং তাহার কাছে 'কাটাহা' এই দুইটি স্থানই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। পূর্ণিয়ার নবাব শওকত্ জঙ্গের সহিত সিরাজদ্দৌলার যুদ্ধ হইয়াছিল ওই 'কাটাহা' প্রাঙ্গণে। কাটাকাটি হইয়াছিল বলিয়া স্থানটার নাম 'কাটাহা'। 'কাটাহা'তে একটি প্রাচীন তালগাছ ছিল, তাহার গায়ে গোলা-গুলির দাগও দেখা যাইত। এই যুদ্ধে শওকত্‌জঙ্গ পরাজিত হইয়াছিলেন। পূর্ণিয়া জেলার মণি এখানে হারিয়াছিলেন বলিয়া গ্রামটার নামও মণিহারী হইয়াছে, এইরূপ জনশ্রুতি। ফাঁসিয়াতলায় যে অশ্বত্থগাছটি আছে সেই গাছেই শওকত্‌জঙ্গের বন্দী সৈন্যদের ফাঁসি দিয়েছিলেন সিরাজদ্দৌলার সেনাপতি মোহনলাল। এই কারণেই স্থানটি ফাঁসিয়াতলা বলিয়া প্রসিদ্ধ। এ-সব ঐতিহাসিক কাণ্ড-কারখানা অনেকদিন হইল চুকিয়া গিয়াছে। কিন্তু পুচ্ছার মতে চুকিয়া যায় নাই। সে মেঘ-চাপা জ্যোৎস্না রাত্রে ওই অশ্বত্থ গাছের ডাল হইতে মড়া ঝুলিতে দেখিয়াছে। স্বচক্ষে দেখিয়াছে। যাহারা বলে ও-গুলো বাদুড় তাহারা বাদুড় চেনে না। শুধু ঝোলা নয়, মাঝে মাঝে আর্তনাদও করে। যাহারা মনে করে উহা শৃগালদের সম্মিলিত কলরব তাহাদেরও বুদ্ধির উপর পুচ্ছার তাদৃশ আস্থা নাই।

অন্ধকারে মাঠের ভিতর দিয়া গাড়ি চলিতেছিল। সামনে পিছনে দুইদিকে মাঠ। মাঠে পড়িতেই পুচ্ছা আমাকে কথা বলিতে মানা করিয়া দিল। এই বিরাট মাঠটা সে নিঃশব্দে পার হইতে চায়। এই মাঠ দেখিয়া হঠাৎ আমার 'চামা' মাঠের কথা মনে পড়িয়া গেল। সেখানে একটা প্রেত্নী মাথায় আগুনের মালসা লইয়া উদ্দাম নৃত্য করে। পুচ্ছা বলিয়াছিল একদিন আমাকে সেখানে লইয়া যাইবে। ফিস্‌ফিস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "পুচ্ছা, আমাকে চামা-মাঠে কবে নিয়ে যাবে?" পুচ্ছাও নিম্নকণ্ঠে উত্তর দিল, "যেদিন কাঠ আনতে টালে যাবো সেইদিন নিয়ে যাবো,

যদি মাইজি তোমাকে যেতে দেন—"

"মাকে তুমি বোলো না। আমি লুকিয়ে তোমার সঙ্গে চলে যাবো—"

সহসা পুচ্ছো চাপা কণ্ঠে তর্জন করিয়া উঠিল, "চুপ।"

চুপ করিয়া গেলাম।

তাহার পর পুচ্ছো আমার কানের কাছে মুখ লাগাইয়া বলিল, "সামনে দ্যাখো। সেই যোগলালের ঘরটা দেখা যাচ্ছে--" সামনে চাহিয়া দেখলাম পুঞ্জীভূত গাঢ় অন্ধকার। আর কিছুই চোখে পড়িল না।

"কিছু দেখতে পাচ্ছি না তো।"

"ভাল ক'রে দেখ। চোখ দুটো বড় বড় ক'রে একদৃষ্টে চেয়ে থাকো, দেখতে পাবে।" বিস্ফারিত নয়নে অন্ধকারের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলাম। একটু পরে দেখিতে পাইলাম, এক জায়গায় অন্ধকারটা একটু গাঢ়তর। ওইটেই কি যোগলালের ঘর? পুচ্ছোকে ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। পুচ্ছোও ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া বলিল, "হাঁ। একটি কথা বোলো না। চুপ ক'রে থাকো।" পুচ্ছো গাড়িটাকে অনেক দূর দিয়া ঘুরাইয়া লইয়া গেল। বুঝিলাম, যোগলালের ঘরের কাছে সে যাইতে রাজী নয়। সেই জায়গাটা যখন পার হইয়া গেলাম তখন জিজ্ঞাসা করিলাম, "যোগলাল কে?"

পুচ্ছো খানিকক্ষণ কোনও উত্তরই দিলে না। মনে হইল, সে তন্ময় হইয়া কি ভাবিতেছে। আমি আবার প্রশ্ন করিলাম। তখন সে যাহা বলিল তাহা রূপ-কথা। অন্তত, আপনারা তাহাই মনে করিবেন।

বহুকাল আগে এই মাঠে যোগলাল বলিয়া একটি গরীব লোক বাস করিত। লোকটি গরীব, কিন্তু অনেক রকম তন্ত্র-মন্ত্র জানা ছিল তাহার। দেখিতে সুদর্শন ছিল না। কালো রং, মুখটা কুমীরের মুখের মতো, ছোট ছোট চোখ। গা-ময় লোম। কিন্তু তাহার বউটি ছিল পরমা সুন্দরী। লোকে বলিত, মন্ত্রবলে সে বউকে উড়াইয়া আনিয়াছে এবং তন্ত্রবলে বশীভূত করিয়াছে। কিন্তু তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী জুটিয়া গেল ছত্তর সিং। পুরানাম ছত্রপতি সিং। সে ছিল এ অঞ্চলের জমিদার। যথেচ্ছাচারী জমিদার। শুধু জমিদারই ছিল না সে, সুদখোর মহাজনও ছিল। জমিজমা বন্ধক রাখিয়া চড়া সুদে টাকা ধার দিত। সুতরাং এ অঞ্চলের অনেক লোকেই কেনা গোলাম হইয়া পড়িয়াছিল তাহার। সকলকেই প্রায় মুঠোর মধ্যে আবদ্ধ করিয়াছিল। যোগলাল তন্ত্র-মন্ত্র লইয়া থাকিত, রোজগার করিত না। বলিত, পয়সার পিছনে ছুটিলে তন্ত্র-মন্ত্রের সাধনা বিঘ্নিত হয়। ফলে, কিছুদিন পরে তাহাকেও ছত্তর সিংয়ের কবলে পড়িতে হইল। কারণ, অন্নবস্ত্রের জন্য তাহাকে টাকা কর্জ করিতে হইত। ছত্তর সিং অবশেষে তাহার বাড়িটিও গ্রাস করিল। ঋণের পরিমাণ নাকি পাঁচশত টাকার কাছাকাছি হইয়াছিল। কিন্তু সে আর-একটি প্রস্তাবও করিল যোগলালের কাছে। বলিয়া পাঠাইল, সে যদি তাহার রূপসী পত্নী সুখিয়াকে তাহার হাতে সমর্পণ করিয়া দেয়, তাহা হইলে ঋণের একটি পয়সাও আর দিতে হইবে না। শুধু তাহাই নয়, তাহার বাকি জীবনের গ্রাসাচ্ছাদনের ভারও ছত্তর সিং লইবে।

যোগলাল বলিল, সুখিয়া যদি স্বেচ্ছায় যাইতে চায় যাক্‌ আমার আপত্তি নাই।

সুখিয়া কিন্তু গেল না। তখন ছত্তর সিং একদিন লোকজন পাঠাইল সুখিয়াকে জোর করিয়া আনিবার জন্য। লোক লস্কর সিপাহী শান্ত্রী আসিয়া তাহার বাড়ি ঘেরাও করিল। কিন্তু সুখিয়া ও যোগলালের নাগাল তাহারা পাইল না। তাহারা দুই-জনেই ঘরে খিল দিয়া বসিয়াছিল। মন্ত্রের জোরে ঘরের খিল এমন ভাবে আঁটিয়া বসিয়াছিল যে, অনেক ধাক্কাধাক্কি অনেক গুঁতাগুঁতিতেও খুলিল না। তখন তাহারা যাহা করিল তাহা ভয়ঙ্কর। ঘরে আগুন লাগাইয়া দিল। সকলের ধারণা হইল, সুখিয়া ও যোগলাল পুড়িয়া মরিয়াছে। কিন্তু তাহাদের মৃতদেহ পাওয়া গেল না। সকলে ভাবিল, একেবারে ছাই হইয়া গিয়াছে বুঝি। কিন্তু তাহা যে হয় নাই ইহার প্রমাণ দুই বৎসর পরে পাওয়া গেল। ছত্তর সিং খুব ঘটা করিয়া যোগলালের ভিটার উপর বাড়ি বানাইয়াছিল একটি। বাড়ি নয়, অট্টালিকা। আগাগোড়া পাকা, কাঁচের বড় বড় জানলা। সেই বাড়িতে সে গৃহপ্রবেশ করিল এক বাঈজি লইয়া। সেইদিন রাত্রেই লোমহর্ষক কাণ্ডটি ঘটিল। ছত্তর সিং বাঈজিকে লইয়া ঘরে খিল লাগাইয়া শুইয়া আছে হঠাৎ তাহার নজরে পড়িল, ছাতের উপর দুইটা লাল রঙের সাপ আঁকিয়া বাঁকিয়া বেড়াইতেছে। তাহার পর ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, এ কি —ঘরের দেওয়ালেও বেড়াইতেছে। সাপ নয়, আগুনের শিখা। লক্‌লক্‌ করিয়া লক্ষ লক্ষ শিখা সারা বাড়িময় ঘুরিতেছে। কাঁচের জানলাগুলো লালে-লাল হইয়া গেল। ছত্তর সিং বাঈজিকে লইয়া পালাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু পারে নাই। ঘরের কপাট খুলিল না। যোগলালের মন্ত্রবলে কপাট আঁটিয়া বসিয়া গিয়াছিল। পরদিন সকালে দেখা গেল অট্টালিকা নাই, ভস্মস্তূপ পড়িয়া আছে। তাহার পরই প্রচণ্ড ঝড় উঠিল। ভস্মস্তূপও উড়িয়া গেল। ইহার কিছুদিন পরে পুচ্ছার পিতামহ একদিন দেখিতে পাইল অন্ধকারের মধ্যে যোগলালের ঘর আবার মূর্ত্ত হইয়াছে। অন্ধকারেই উহা দেখা যায় এবং যাহার চোখ আছে সে-ই দেখিতে পায়।

আমি পুচ্ছাকে আর কোন প্রশ্ন করিতে সাহস করি নাই। দুইজনেই নীরবে গাড়িতে বসিয়াছিলাম। গাড়ির চাকা দুইটা হইতে আর্ত্তনাদের মতো শব্দ উঠিতেছিল মাঝে মাঝে।

পুচ্ছার মৃত্যুর পর আমরা পুচ্ছার ভাগনা মাদারিকে বহাল করিয়াছিলাম। তাহার মুখেও একদিন ছত্তর সিংয়ের গল্প শুনিয়াছি। দিবালোকে একদিন কাটাহার মাঠ দিয়া যাইতেছিল। মাদারি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বলিল, "মাঠে এককালে আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা থাকিতেন।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার পূর্ব্বপুরুষ ?"

"না, ঠিক আমার নয়, আমার মামার পর দাদার (প্রপিতামহের) বাড়ি ছিল এখানে।"

"কার, পুচ্ছার ?"

"জি। ছত্তর সিং জমিদার তাদের পুড়িয়ে মেরে ফেলেছিল।"

গল্পটা মনে পড়িল তখন।

বলিলাম, "ছত্তর সিংও এখানে একটা বাড়ি বানিয়েছিল নাকি ? সে বাড়িও আপনা-আপনি পুড়ে যায় ?"

মাদারি বিস্মিত হইল।

বলিল, "না, সে সব তো কিছু হয়নি।"

ত্রাণ

—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

'এবার বলতে হয়।' প্রায় কানে কানে বলার মত বললে সুগত।

'ওরে বাবাঃ।' মালিনী আঁতকে উঠল।

'সে কী। বলতে তো হবেই।'

'তা হবে। কিন্তু এখন নয়।' দু-চোখে মিনতি পুরে তাকাল মালিনী।

'বা, শুভস্য শীঘ্রং।'

'তা ঠিক। তবু, আগে বিয়েটা হোক।'

'বা, বিয়ের আগেই তো বলে। কত আগে থেকেই জানাজানি হয়। চিঠি ছাপায়
সুগত বললে ভরাট গলায়, 'আমরা যখন স্থির করেছি, বলতে পারো আমরা যখ
স্থির হয়েছি, তখন আর গোপন করে রাখবার কী দরকার।'

'কিন্তু এই কাঁচা অবস্থায় বাবাকে বলতে সাহস হচ্ছে না।' মালিনী মুখ মেঘল
করল।

'কাঁচা অবস্থা মানে?'

'কাঁচা অবস্থা মানে, বিয়েটা তো এখনো রেজেস্ট্রি হয়নি—'

'হয়নি তো হবে।' অনিবার্যের সুর আনল সুগত।

'তা আগে হোক। নিশ্চিন্ত হই। সিদ্ধ হোক, সমাধা হোক বিয়েটা।'

'কিন্তু এখন বললে কী হবে?'

'তুমি তো আমার বাবাকে জানো না। এখন বললে বাবা আমাকে মারবে।'

'মারবে?' অন্ধকারে যেন ভূত দেখেছে এমনি হতজ্ঞানের মত চেঁচিয়ে উঠল সুগত।

পথ চলছিল দুজনে। চরকডাঙার মোড় থেকে সুরু করে রাসবিহারী পর্যন্ত এসেছে
কোথাও বসবার জায়গা পায়নি, না পার্কে বা কোনো রেস্তোরাঁয়। ভিড় আর ভিড়
লাইন আর লাইন। যত সব জটিল জটলা। টালিগঞ্জের ব্রিজের মাথায় রে
লাইন ধরে নির্জনে যাওয়া যায় বটে কিন্তু নির্জনে আবার গুণ্ডার ভয়। গুণ্ড
ধরা পড়লেও ভয়। কোর্টের কেলেঙ্কারি। একটা ট্যাক্সি নেওয়া যায় বটে, কিন
দৈবাৎ দুর্ঘটনা ঘটলে খবরের কাগজের হেডলাইন। সেই জানাজানির লজ্জা।
তার চেয়ে এই টানা লম্বা হাঁটাই ভালো। আলস্যে ঘনীভূত হলেই লোকে সন্দে
করে। এ বেশ ছাড়াছাড়ি রেখে পথ চলা। কেউ অনুমানও করবে না তার
বাজারের কথা, অফিসের কথা বা আবহাওয়ার কথা না বলে বিয়ের কথা বলছে।
গানের ইস্কুল থেকে বেরিয়েই সমানে তারা হাঁটছে দক্ষিণে।

কিন্তু, যে যাই ভাবুক, এবার হাঁটা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে পড়ল সুগত। 'মারবে ক
'? গায়ে হাত তুলবে? এত বড় মেয়ের গায়ে হাত কেউ তুলতে পারে কখনো?

মালিনীকেও দাঁড়াতে হ'ল কাছ ঘেঁষে। বললে, 'তুমি জানো না—'
'জানি না মানে?'
'যেই বাবা শুনবেন, নিজের জাতে বিয়ে করছি না, খেপে যাবেন, তুমুল করবেন—' মুখখানি ম্লান করল মালিনী।
'নিজের জাতে বিয়ে করছ না মানে?' সুগত দাঁড়াবার ভঙ্গিতে দৃপ্তি আনল। 'পৃথিবীতে তো শুধু এক জাত আছে। সে জাতের নাম মানুষ জাত। মানুষে-মানুষে বিয়ে হতে বাধা কী।'
'ওসব কথা বাবা কানেও তুলবেন না।' শীর্ণ রেখায় হাসবার চেষ্টা করল মালিনী। 'যেই শুনবেন বামুন হয়ে কায়েতের ছেলেকে নির্বাচন করেছি অমনি রেগে চণ্ডাল হয়ে উঠবেন। আর জানো তো, রাগীমানুষের চোখও নেই কানও নেই। তাই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে দু'-ঘা বসিয়ে দেবেন এটা মোটেই আশ্চর্য নয়।'
'বা, তুমি সাবালক নও?'
'তা কে অস্বীকার করবে? আর আইনে যে অসবর্ণ বিয়ে সিদ্ধ, এই বা খণ্ডাবে কে? তবু বাবা না শুনবে যুক্তি না বুঝবে আইন। ঝপ করে কোপ বসিয়ে দেবে।'
কেন, তিনি কি তোমার গার্জেন?'
'আইনের চোখে হয়তো নন, কিন্তু শত হলেও তাঁর বাড়িতে তাঁর আশ্রয়ে আছি, তিনি জোর খাটাবার একটা সুবিধে পাবেন নিশ্চয়ই।' মালিনী সন্নিহিত হবার কৌশলে ইলেকট্রিক পোষ্টটার ওপাশে গিয়ে দাঁড়াল, যেন পোষ্টের ব্যবধানের দরুন ওদের অসম্পৃক্ত দেখাবে। 'তা ছাড়া মারধোর কী, হয়তো ঘরে আটক রাখবে, বাইরে পাচার করে দেবে, নয়তো জোর করে ধরে-বেঁধে অস্থানে-অপাত্রে বিয়ে দিয়ে দেবে।'
'বদ্‌নার মুলুক চলে গিয়েছে, এ কি এখন মগের মুলুক?' সুগত ঘাড় বাঁকা করে তাকাল।
'তার চেয়েও খারাপ, গাড়ুর মুলুক।' চোখের সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে মালিনী বললে, 'ওজনে ভারী, ঠাটে সনাতন আর জলের বেলায় ছিড়িক-ছিড়িক।'
'তা হলে কি বলছ তোমাকে নিয়ে পালিয়ে যাব।'
'ছি, পালিয়ে যাব কেন? আমরা বিয়ে করতে চেয়ে কি কোনো অপরাধ করেছি?'
'তবে?'
আবার হাঁটতে সুরু করল দুজনে।
'আমি বলছি আগে বিয়েটা হোক', দু-চোখ উজ্জ্বল করল মালিনী, 'তারপর একদিন আস্তে-সুস্থে বাবাকে বলি।'
'আস্তে-সুস্থে বলবে, কিন্তু তোমার বাবা যদি শোনামাত্রই দেন দু-ঘা বসিয়ে।'
'সাহস পাবেন না। কেননা, আমি তখন একজনের স্ত্রী। মানে, তোমার স্ত্রী।'
'তা দু-ঘা বসিয়ে দিতে আপত্তি কী। বসিয়ে দিলে তুমি কী করতে পারো?'
'বা, তখন তুমি করবে।'
'আমি করব?'
'হ্যাঁ, তোমার স্ত্রীকে যদি কেউ আঘাত করে সে তো তোমার স্বামিত্বকে, তোমার স্বত্বকে আঘাত করা। তখন তার প্রতিকার তোমার হাতে।'
'ঠিক বলেছ। তা হলে চুপিচুপি বিয়েটা আগে শেষ হয়ে যাক। তারপরে মিউজিক

ফেস করা সহজ হবে।'
'সহজ হবে যেহেতু যা অনিবার্য তাকে আর বারণ করা যাবে না। কিন্তু', চলতে চলতে ঘেঁষে এল মালিনী : 'সাক্ষী পাবে কোথায় ? তারা যদি বলে দেয় ?'
'তোমার কী বুদ্ধি! সাক্ষী তো নোটিশে নয়, সাক্ষী একেবারে পাকা দলিলে। তখন তো কর্ম ফতে। তখন তো জানাবেই, জগজ্জনকে জানাবে।' এবার সুগত ঘেঁষে এল, 'আমার অফিসের বন্ধুরা সাক্ষী হবে। ইন্দ্রনাথ তো আবার তোমার দাদারও বন্ধু।'
'রেজেস্ট্রির আগে কিন্তু ভেঙো না তার কাছে।'
'মাথা খারাপ!' সুগত সরে গেল। আচ্ছা, তোমার মার কথা তো কিছু বললে না—'
'তাঁর শুধু কান্না। স্বামীর জন্যেও কাঁদবেন, মেয়ের জন্যেও কাঁদবেন।'
'আর তোমার দাদা ? শশাঙ্ক ?'
'জানি না। চুপচাপই থাকবে বোধহয়।'

চুপচাপই বিয়ে হয়ে গেল।
দলিলে সই করে মালিনী এমন সহজে বাড়ি ফিরল যেন গানের ইস্কুল থেকে গিটার বাজিয়ে আসছে আর সুগত যেন ফুটবল ম্যাচ দেখে।
একটা ফুল নয়, এক কণা আলো নয়, এক পেয়ালা চা পর্যন্ত নয়। শুধু একটা দস্তখতেই কিস্তিমাত। মানচিত্রে একটা দাগ টেনে দিয়েই স্বাধীনতা।
এবার বলতে হয় মালিনীর বাবাকে, কান্তিবাবুকে। কান্তিবাবু একটা অনুষ্ঠান করতে চান তো করুন, নয়তো প্রণামের বিনিময়ে তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে সুগত মালিনীকে তার ঘরে তুলুক।
ইন্দ্রনাথ কথাটা প্রথমে শশাঙ্ককে বললে।
'তুমি জানলে কী করে ?'
'আমি যে দলিলে সাক্ষী। সার্টিফিকেটটা দেখবে ?'
'বাবাকে দেখাও গে।' ফেটে পড়তে চাইল শশাঙ্ক।
'তোমার বোনের কীর্তি তুমি বললেই তো ভালো হয়।'
'সব কীর্তি সে বলুক।' শশাঙ্ক এমন ভাব দেখাল যেন মালিনীর মুখদর্শনও পাপ। 'আমি সাতেও নেই পাঁচেও নেই, কিছুর মধ্যেই নেই।'
অগত্যা ইন্দ্রনাথই কান্তিবাবুর সম্মুখীন হ'ল।
শশাঙ্কর বন্ধু হিসেবে এ-বাড়িতে আসা-যাওয়া ছিল ইন্দ্রনাথের, তাকে তাই চিনতেন কান্তিবাবু। কিন্তু এমন বিরলে সরকারী ভাবে তাঁর ঘরে ঢুকবে ভাবতে পারতেন না। কী খবর ? এটুকু প্রশ্ন করাও নিষ্প্রয়োজন মনে করলেন। যদি বক্তব্য থাকে ও-পক্ষই বলবে। না থাকে চলে যাবে।
যেন কী এক ভয়াবহ শোকের সংবাদ ভাঙতে এসেছে এমনি একটা স্তব্ধ মুখ করে দাঁড়িয়েছে ইন্দ্রনাথ। তা থাকো দাঁড়িয়ে। কৌতূহলের খোঁচা মারবার মত উৎসাহ নেই কান্তিবাবুর।
'আপনাকে একটা খবর দিতে এসেছিলাম।' পরিবেশ এমনিতেই যথেষ্ট থমথমে, তার

ইন্দ্রনাথ স্বর গম্ভীর করল।
'কী খবর?' এবার চঞ্চল হলেন কান্তিবাবু।
ইন্দ্রনাথ চুপ করে রইল? তারো চেয়ে বেশি, নত চোখে তাকিয়ে রইল মেঝের দিকে।
'কী খবর? কার খবর?' কান্তিবাবু উত্তেজনায় পিঠ খাড়া করলেন চেয়ারে। একবার ভাবতে চেষ্টা করলেন কোন্‌দিকে অনুমান পাঠাবেন। ঘড়ির দিকে তাকালেন, ঠিক কাঁটায় কাঁটায় দশটা। ছুটির দিন, অফিসের তাড়া নেই। খানিক আগেও বাড়ির সবাইকে বহাল তবিয়তে দেখেছেন। স্ত্রী, এক ছেলে আর মেয়ে এই নিয়েই তাঁর ঘনিষ্ঠ সংসার। সকলে তাঁর চোখের উপরে। বাইরে এমন কেউ নেই যার সম্পর্কে তিনি উচাটন হতে পারেন, হতে পারেন শশব্যস্ত।
'কী, কিছু বলছ না কেন? কার খবর?'
'মালিনীর খবর।' হাসতে চেষ্টা করল ইন্দ্রনাথ।
'তার আবার কী খবর?' কান্তিবাবু ভুরু কুঁচকোলেন: 'সে তো বি-এ পাশ করেছে—'
'না পাশ-ফেলের খবর নয়।'
'তবে তার আর খবর কী! এম-এ যদি পড়তে চায় তো পড়বে—'
'না, তাও নয়।'
'তবে?'
'সে বিয়ে করেছে।'
'কী করেছে?' হিব্রু শুনছেন না গ্রীক শুনছেন সহসা ঠাহর করতে পারলেন না কান্তিবাবু।
'বিয়ে করেছে।'
হো-হো করে হেসে উঠলেন কান্তিবাবু: 'আমি জানলাম না, শুনলাম না, আর তার বিয়ে হয়ে গেল?'
'একরকম বিয়ে আছে, যা মা-বাপকে না জানিয়ে-শুনিয়েও করা যায় আজকাল। সেইরকমই একটা বিয়ে করেছে মালিনী।' লঘু হবার চেষ্টা করল ইন্দ্রনাথ।
'সে আবার কী বিয়ে!' কান্তিবাবু হতভম্বের মত মুখ করলেন।
'জানেনই তো, রেজেস্ট্রি বিয়ে।'
'মিথ্যে কথা।' স্বরূপে গর্জন করে উঠলেন কান্তিবাবু।
'মিথ্যে নয়। বিয়ের ডকুমেন্ট আমার পকেটে আছে। আমি তাতে সাক্ষী।'
'বাজে কথা।' নিচের ঠোঁটটা কাঁপতে লাগল কান্তিবাবুর: 'ডকুমেন্ট জাল। মালিনী অমন ঘৃণ্য কাজ করতে পারে না।'
'ঘৃণ্য কাজ?'
'একশোবার ঘৃণ্য। বাপ-মাকে না জানিয়ে, তাদের মত না নিয়ে গোপনে পারে না সে বিয়ে করতে। না, পারে না। বিশ্বাস করি না।' হুঙ্কারে প্রবলতর হলেন কান্তিবাবু।
ইন্দ্রনাথের ইচ্ছে হ'ল সার্টিফিকেটটা বার করে পকেট থেকে। কিন্তু যেমন ক্ষিপ্ত হয়ে আছেন, হয়তো ভালো করে না দেখে না বুঝেই ছিঁড়ে ফেলবেন টুকরো টুকরো করে।

'কেন, এতে অবিশ্বাসের কী আছে?'

আগাগোড়া অবিশ্বাস্য। মালিনী এত খারাপ নয়। অসৎ নয়।'

ইন্দ্রনাথ এবার তপ্ত হ'ল। বললে, 'তাকে স্বাধীনতা দেবেন এটা খুব সৎ, আর সে সেই স্বাধীনতার ফল নিতে গেলেই সেটা অসৎ হয়ে যাবে?'

'বলি, কাকে বিয়ে করেছে? তোমাকে?' তাক-করা পিস্তলের মত উদ্যত হয়ে রইলেন কান্তিবাবু।

'সে কী কথা। আমি তো সাক্ষী।'

'তা স্বাধীনতার যুগে সাক্ষীকে বিয়ে করতেই বা বাধা কী।' কান্তিবাবুর ক্রোধ এবার বিদ্রূপের চেহারা নিল: 'বিয়ের সভায় কনে বললে বরকে নয়, সাক্ষীকে বিয়ে করব।'

'আমার কথা ওঠে না। আমি বিবাহিত।'

'হিত-মিত উঠে গেছে আজকাল। একটা কিছু ধরে ঝুলে পড়লেই হ'ল।' চোখের দৃষ্টি আগুন করলেন কান্তিবাবু: 'তোমাকে নয় তো কাকে বিয়ে করল?'

'আমাদেরই অফিসের এক অ্যাসিস্টেন্ট সুগত ঘোষকে।' স্পষ্ট বললে ইন্দ্রনাথ।

'কি বললে, ঘোষাল?'

'না, ঘোষ।'

'অ্যাবসার্ড। বামুনের মেয়ে হয়ে কায়েতের ছেলেকে বিয়ে করে কী করে?'

আহা কী প্রশ্ন। যেন হাবড়ার পোলের তলা দিয়ে জল যায় কী করে।

'কেন, অমন বিয়ে তো আইনে অসিদ্ধ নয়।'

'বহু কুকর্মই তো আইনে অসিদ্ধ নয়।' রাগে দুলতে লাগলেন কান্তিবাবু। 'যাদের জন্যে ল্যাম্পপোস্ট ফাঁসিকাঠ হবার কথা ছিল তারা আজ ফাঁসিকাঠকেই ল্যাম্পপোস্ট বানিয়েছে। কথাটা আইনের নয়, নীতির। কী নাম বললে?' নাম নয়, যেন পদবীটাই শুনতে চাইলেন।

নামটা আবার বললে ইন্দ্রনাথ।

'মরে গেছে, আমার মেয়ে মরে গেছে।' চেয়ারে গা ছেড়ে দিলেন কান্তিবাবু। চোখ বুজলেন।

না, নিশ্বাস পড়ছে। ইন্দ্রনাথ আশ্বস্ত হ'ল। বললে, 'সুগত বেশ ভালো ছেলে। এম-এ পাশ। মাইনেও বেশ ভালো পায়। দেখতেও সুদর্শন। মোটামুটি স্বচ্ছল অবস্থা—'

দেখল, দু-হাতে কান চেপে ধরেছেন কান্তিবাবু। বলছেন আর্তস্বরে, 'আর কিছু শুনতে চাই না। ঘোষ—ঘোষ। মেয়ে আমার মরে গেছে, মরে গেছে—'

'মরে যাবে কেন? ঐ তো এসেছে আপনার কাছে। দোরগোড়ায় মালিনীকে এসে দাঁড়াতে দেখে অনেকটা হালকা হ'ল ইন্দ্রনাথ।

'বেঁচে আছে? কোথায়?' ঘরের চারদিকে তাকাতে লাগলেন কান্তিবাবু, 'তা হ'লে ও বলুক এতক্ষণ যা শুনেছি সব বাজে কথা। ইন্দ্রনাথের পকেটে যে ডকুমেন্টটা আছে বলছে, সেটা বিয়ের ডকুমেন্ট নয়। বলুক সেটাতে মালিনী সই করেনি—'

এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে সহসা মালিনীর উপর দৃষ্টি স্থির হ'ল কান্তিবাবুর।

জিগগেস করলেন, 'কী, কী বলছে ইন্দ্রনাথ ?'
'সব ঠিক বলেছেন, বাবা ।' বাধ্য মেয়ের মত শান্ত মুখে বললে মালিনী ।
'ঠিক বলেছে ?' এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে থেকে কান্তিবাবু হঠাৎ টেবিলের উপর কী একটা কাজে মন দিতে চাইলেন । নিচু চোখেই লক্ষ্য করলেন ইন্দ্রনাথকে । বললেন, 'তবে আর দেরি করছ কেন ? যখন সব শেষ হয়েই গিয়েছে তখন আর মিছিমিছি শোক কিসের ? নিয়ে যাও মেয়েটাকে ।'
'কোথায় নিয়ে যাব ?'
'কোথায় আবার ! শ্মশানে ! মরলে পর যেখানে নিয়ে যায় বেঁধে-ছেঁদে ।' কান্তিবাবু কাজে চোখ ডোবালেন ।
'বা, আমি নিয়ে যাবার কে ।' ইন্দ্রনাথ আহত স্বরে বললে, 'যার জিনিস সে এসে নিয়ে যাবে ।'
'তাহলে ঐ ডোমটাকে ডাকো । বা, ডাকবারই বা কী দরকার !' খাতাপত্রের পৃষ্ঠা ওলটালেন কান্তিবাবু : 'মেয়েটাই যাক না বেরিয়ে । যখন একবার গেছে তখন আধখানা পা বাইরে, আধখানা পা ভেতরে কেন ? পুরোপুরিই আউট হয়ে যাক ।'
কী আশায় দাঁড়িয়েছিল কে জানে, মালিনী দ্রুত পায়ে চলে গেল ভিতরে ।
তবু এখুনি হাল ছাড়ল না ইন্দ্রনাথ । বললে, 'এ প্রায়ই দেখা গেছে যে, এরকম ব্যাপারে গোড়ায় সব বাপ-মাই কঠিন হয়, বিমুখ থাকে, কালক্রমে সংকল্পের ধার ক্ষয়ে যায়, মেয়ে-জামাইকে স্বীকার করে নেয় । ভবিষ্যতে তাই যখন হবে তখন এ নির্দয়তা কেন ?'
'হবে না ।' হুংকার ছাড়লেন কান্তিবাবু ।
ইন্দ্রনাথ আরো বললে, 'আইনে যখন এ বিয়ে বৈধ তখন একটা অনুষ্ঠান করাই শোভন হবে । কান্তিবাবুর সম্ভ্রান্ততাও তাই দাবি করে । অনুষ্ঠান করে তার আত্মীয়বন্ধুবর্গের একটা প্রকাশ্য সমর্থনই তো তাঁর আদায় করা উচিত । তা ছাড়া মেয়েটার মনেও তো একটা উৎসবের বাসনা আছে । তাকে উপবাসী রাখা কেন ?'
কান্তিবাবু আবার হুংকার ছাড়লেন : অসম্ভব ।'
'বেশ, তবে সুগতকে ডাকি, ও এসে আপনাদের প্রণাম করে আশীর্বাদ চেয়ে নিক ।'
'খবরদার । ওর স্পর্ধা কী, ও আমাদের পা ছোঁয় ।' লাল চোখ তুললেন কান্তিবাবু : 'ও যদি এ বাড়ি ঢোকে, বলে দিও, অপমান হয়ে যাবে ।'
নিজেই হুড়মুড় করে উঠলেন চেয়ার ছেড়ে । বাড়ির ভিতর এসে পড়লেন । মালিনীকে বললেন, 'যেখানে বিয়ে করেছ, সোজা সেখানেই চলে যাও । যদি আগে আমরা নেই, পরেও আমরা নেই ।'
'এখুনি চলে যাব, বাবা ?'
'এখুনি । একবস্ত্রে ।' হুকুম দিলেন কান্তিবাবু ।
হাতে গলায় কানে যে সামান্যতম গয়না ছিল তাও খুলে দিতে যাচ্ছিল, মা কেঁদে উঠলেন ।
কান্তিবাবু বললেন, 'সব খুলে দিয়ে যাবে । শ্মশানে পাঠাবার আগে গা থেকে সমস্ত গয়না খুলে রাখে সংসার । নইলে ছিটেফোঁটা যা থাকবে সব ডোমে নেবে । ডোমে নিলে আমার সহ্য হবে না ।'

গয়নার ছোঁয়াচটুকুও না রেখে একবস্ত্রে চলে গেল মালিনী।
ইন্দ্রনাথ শশাঙ্ককে এসে ধরল। বললে, 'ভেবেছিলাম তুমি মেয়েটার পক্ষ নেবে। তাকে এই লাঞ্ছনার থেকে বাঁচাবার জন্যে তার হয়ে লড়বে তুমি।'
'ওরে বাববাঃ, আমি লড়ব? বাবার বিরুদ্ধে?' শামুকের মত গুটিয়ে গেল শশাঙ্ক।
'একশোবার লড়বে। বিদ্রোহ করবে। সমাজের ওসব সনাতনী ফসিলকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে সমুদ্রে। নইলে আর তুমি এ যুগের যুবক কী?'
'যাও, বাজে কথা বোকো না। নিজের চরকায় তেল দাও গে যাও।' শশাঙ্ক মুখ ফিরিয়ে নিল।
সেই রাত্রেই কান্তিবাবু নিশ্চিন্তমনে উইলের খসড়া করলেন। এমনিতে মেয়েটাকে প্রত্যাখ্যাত করতেন কী করে, যদি জাতে-ধর্মে ঠিক ঠিক করত? প্রত্যাখ্যাত করলেও মেয়ের মনে ক্ষোভ থাকত, পাছে কোথাকার কে পরের বাড়ির ছেলে এসে সম্পত্তিতে ভাগ বসায় তারই জন্যে আমাকে ঠকিয়েছে? সে-ক্ষোভে ভাইয়ের সঙ্গে সদ্ভাব দূরের কথা, মুখ দেখাদেখিও থাকত না। কিন্তু এখন? এখন মালিনীকে উৎখাত করবার সুন্দর অজুহাত পাওয়া গিয়েছে। ঘোষাল হলেই বুক চচ্চড় করত, আর এ তো ঘোষ!
মালিনী এক্ষেত্রে সহজেই ভাবতে পারবে, বাবা তাকে ন্যায্য কারণেই প্রত্যাখ্যান করেছেন। শত হলেও বাবা সেকেলে মানুষ, যুগের প্রয়োজনে প্রেমের প্রয়োজনেই তাঁর সে-সংস্কার সে মান্য করতে পারেনি, তাই সব সময়ে নিজেকে সে অপরাধী বলে ভাববে। আর তাই তখন সে দেখবে বাবা তাকে সম্পত্তির কাণাকড়িও দেয়নি, উইল করে সব-কিছু একা দাদাকেই দিয়ে গিয়েছেন, তখন সে এতটুকুও ক্ষুব্ধ হবে না। নিজেকে বঞ্চিত ভেবে প্রার্থনাও করবে না ঈশ্বরের কাছে।
সম্পত্তি পায়নি বলে যদি মনে ক্ষোভ রাখে তা হলে আর প্রেম কী।
গভীর রাত্রে পায়চারি করছিলেন কান্তিবাবু। স্ত্রীকে জাগালেন ঘুম থেকে। বললেন, 'মালিনী আমাদের খুব ভালো মেয়ে, লক্ষ্মী মেয়ে—'
ধড়মড় করে উঠে বসলেন মহামায়া।
আমাদের একটি পয়সাও খরচ করাল না।' অন্ধকারে হেসে উঠলেন কান্তিবাবু।
'প্রায় কুড়ি-পঁচিশ হাজার টাকা বাঁচিয়ে দিল। হয়তো বা আরো বেশি। আর এত লক্ষ্মী—'
মহামায়া অন্ধকারে দেখতে লাগলেন চারদিক।
'আর এত লক্ষ্মী গায়ের শেষ সোনাটুকুও ফিরিয়ে দিল।'

তারপর কী হ'ল?
বলা নেই কওয়া নেই, একদিন শশাঙ্ক অপর্ণা নাগকে বিয়ে করে ঘরে আনল।
'কাকে?' কান্তিবাবু বুকফাটা আর্তনাদ করে উঠলেন।
'নাগকে।'
'তুই—তুই—' কথা শেষ করবার আগে কান্তিবাবুর মুখ সবলে চেপে ধরল মহামায়া। বললে, 'তুমি মেয়েকে পর করে দিয়েছ, ছেলেকে পর করে দিতে পারবে না। কখনোই না। ছেলেই তো সব। ছেলের জন্যেই তো যত কিছু। ছেলে না হ'লে আমাদের

দেখবে কে, নামধাম-বংশ রাখবে কে? না, আর তুমি নিষ্ঠুর হতে পারবে না। কিছুতে না।'

বেখিয়ে যা বলতে পারলেন না কান্তিবাবু। কথাটা গিলে ফেললেন।

'এবার আমি অনুষ্ঠান করব। ঢালাও নিমন্ত্রণ করব। কিছু বলতে পারবে না বলে রাখছি।' মহামায়া আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠলেন।

তবু মধ্যরাত্রে কান্তিবাবু চুপিচুপি উঠলেন বিছানা থেকে। আলমারি খুলে বার করলেন উইল। ভাবলেন, ছিঁড়ে ফেলি। ভাবলেন এক অপরাধে অপরাধী, কেন আর ছেলে-মেয়েতে তফাৎ করি। আইন যাকে যা দিয়েছে তাই দুজনে নিক ভাগাভাগি করে।

যা হবার হোক, আমি নিরপেক্ষ থাকি।

না, মেয়ে কে! ছেলেই তো সব, ছেলেই তো ষোল আনা।

উইলটা আবার ভেতরের ড্রয়ারে রেখে আলমারির দরজা বন্ধ করলেন কান্তিবাবু। শুলেন নিশ্চিন্ত হয়ে। শুতে শুতেই ঘুমিয়ে পড়লেন।
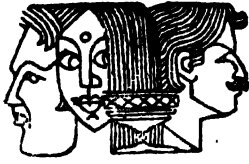
রাজনৈতিক

—শংকর

শ্রীমান্ সামান্য সিং এবার আলিপুরের এক ইস্কুল থেকে ইস্কুল-ফাইনাল পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়েছে। বৃত্তিপ্রাপ্ত ছেলেদের নামের যে তালিকা কাগজে বেরিয়েছিল তার মধ্যে ওর নামটাও ছিল। কিন্তু তার ছবি বেরোয়নি, জীবনীও বেরোয়নি। ওর থেকে কম নম্বর পাওয়া ছেলেদের ছবি কিন্তু বাংলা সংবাদপত্রের সম্পাদকরা ফলাও করে ছেপেছেন। শ্রীমানদের জীবনবৃত্তান্ত ছাড়াও লিখেছেন—শ্রীমানের পিতা বিখ্যাত ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ কর্মচারী; কিংবা শ্রীমানের পিতা সরকারী আপিসের একজন সাধারণ কেরানী। সামান্য সিং সম্বন্ধে অথচ আমার জানবার ইচ্ছে ছিল। ওর বাবা, এমন কি মায়ের নাম জানতে পারলেই বুঝতে পারতাম—ওর মার সঙ্গেই একদিন আমার দেখা হয়েছিল কিনা। যুবরাণীর স্বপ্ন তাহলে সফল হয়েছে কিনা। আমার কৌতূহল হবার কথা নয়। এই কলকাতায় কত বাইরের প্রদেশের ছেলে-মেয়েরা লেখাপড়া শিখছে, পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে মেডেল পাচ্ছে? ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে তাদের বই নিয়ে পড়তে দেখি, দশটা থেকে আটটা পর্যন্ত মুখ গুঁজে নোট লিখে যায় তারা। সামান্য সিং তাদেরই একজন হবে। কিন্তু কেন জানি না, বহুদিনের পুরনো একটা নাম আমার চোখের সামনে নিয়ন আলোর মতো জ্বলতে আর নিভতে আরম্ভ করেছে। কেবলই মনে হচ্ছে এই ছেলেটি সেই, অসামান্যের সংসারে জন্ম নেওয়া সত্ত্বেও যুবরাণী যার নাম দিয়েছিলেন নাম সামান্য।

আলিপুরের ইস্কুলে ফোন করবো ভাবছিলাম। হেড-মাষ্টারকে জিজ্ঞেস করবো, ওঁদের খাতায় সামান্য সিং-এর গার্জেন হিসেবে কার নাম লেখা আছে। তিনি কি মিসেস্ শকুন্তলা সিং? যদি তাই হয়, আজ তাহলে আমার দুঃখ করবার কিছু নেই। মনের দৃঢ়তায়, চেষ্টায়, এবং দুঃখকে এগিয়ে এসে বরণ করে মানুষ তাহলে সব পারে। এতদিন যে অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়ে যে দ্বন্দ্বের অন্ধকারের মধ্য দিয়ে মিসেস্ সিং তাঁর বিশ্বাসের প্রদীপটিকে বয়ে বেড়িয়েছেন, তা বোধহয় এবার শেষ হলো।

তাই যেন হয়। আমি তাতে খুশী হবো। আমার থেকেও খুশী হবে শক্তি—ডাঃ শক্তি মুখার্জী এম-বি, ডি-টি-এম, ডি-জি-ও।

যুবরাজ আজ কোথায় কে জানে? হয়তো তিনিও এখন কলকাতার কোনো সামান্য ফ্ল্যাটে পড়ে রয়েছেন। কিংবা হয়তো তিনি নেই। কিংবা হয়তো দেওয়া-নজীর ছোট মেয়ের সঙ্গেই ব্যাংকের সেফ ডিপোজিটে রাখা শেষ গয়নাগাটিগুলো বিক্রি করে ফেলে, জগুবাবুর বাজার থেকে আলু-পটল কিনে বাড়ি যাচ্ছেন। কিন্তু ওঁর হাতদুটো আজও নিশ্চয় তেমনি নরম আছে—এত নরম যে, কোনো কাজ করা যার

না। হাতুড়ি ধরা তো অসম্ভব; কলম ধরার অভ্যাসও তো ছোটবেলা থেকে করেননি। আর ও'র পঁচিশটা ভাই-বোন?

পৃথিবীতে এত মানুষ আছে এবং তাদের এতরকমের দুঃখ আছে, যে তাদের সবার জন্যে অনুভব করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যদি সত্যিই কোনোদিন কেউ পৃথিবীর সবার জন্যে অনুভব করতে আরম্ভ করে তবে সে পাগল হয়ে যাবে। তিনি আর যাই করুন, লেখক হয়ে বেঁচে থাকতে পারবেন না। বহুর মধ্যে এককে খুঁজে নিয়ে, তার জন্যে চোখের জল ফেলতে আমার ভালো লাগে। সেই একের মধ্য থেকে পাঠকরা যদি আবার বহুকে আবিষ্কার করে নেয়, তাতেও আমার আপত্তি নেই।

বহুর জন্য চিন্তা করবার শক্তি আমার নেই। এবারের পরীক্ষায় কতজন ফেল করেছে, কতজনের চোখের জলে সংসারের আনন্দ নষ্ট হয়েছে আমি জানতে চাই না। স্কলারশিপ লিস্টের সামান্য সিং যদি আমাদের-জানা সামান্য সিং হয়; তাহলেই আমি সুখী। শকুন্তলা সিং-এরও আজ তাহলে বড়ো আনন্দের দিন। এতদিনে যেন একটা গল্পের শেষ হলো। অন্ততঃ শকুন্তলা সিং-এর অমাবস্যার রাত্রি কেটে গিয়ে, পূর্বদিগন্তে আলোর ইঙ্গিত দেখা দিল।

সে-সব কতদিন আগেকার কথা। কিন্তু একটু একটু করে আবার যেন সে-সব মনে পড়ছে।

আমার বাল্যবন্ধু শক্তি মুখোপাধ্যায় তখন সবেমাত্র সরকারী চাকরিতে ঢুকেছে। আর আমিও তখন সংসারের ঘানিতে এমন করে বাঁধা হইনি। তখন আমার চোখের অসুখও হয়নি, মনটাও এমন ক্লান্ত হয়ে পড়েনি। কিন্তু পেটের গোলমালটা চিরকালই ছিল।

কলকাতা থেকে বেশ কিছু দূরে এক পাহাড়ী দেশে শক্তি তখন চাকরি করছিল। ওখানে কাজে যোগ দেওয়ার পর থেকেই শক্তি আমাকে বেড়িয়ে আসবার নিমন্ত্রণ করেছে। চিঠিতে লিখেছে, "কোনোরকমে ম্যানেজ করে কয়েকটা দিন অন্ততঃ ঘুরে যা। এখানে মস্ত কোয়ার্টার্স নিয়ে একলা পড়ে আছি, তোরা এলে তবু কয়েকটা দিন হৈ হৈ করে কাটানো যাবে।" আরও অনেক কিছুর লোভ দেখিয়েছে সে। কিন্তু কাজ হলো না। তখন শক্তি অব্যর্থ বান ছুঁড়লো। লিখে পাঠালো, "এখানকার জলে এমন যাদু আছে যে, এক আউন্স পেটে পড়লেই অম্বল, পেটব্যথা, চোঁয়া ঢেকুর ইত্যাদি পালিয়ে যাবার পথ পায় না।" আমিও সেই শুনে আর সময় নষ্ট না করে সেবারে পুজোতে ওখানে হাজির হলাম।

ওখানে যাওয়ামাত্রই যুবরাজের নানা গল্প কানে আসতো। রায়বাহাদুর মথুরা-দত্ত শক্তির পরিচিত। তিনি বললেন, "যুবরাজও এখনো আসেননি। উনি না-আসা পর্যন্ত এই টাউনটা একেবারে ঝিমিয়ে থাকে। আর আপনাদের সঙ্গে যখন উনি আলাপ করবেন, তখন বুঝতে পারবেন, রাজরক্তের ভদ্রতা কাকে বলে"।

জায়গাটা সত্যি অদ্ভুত। লোকজন নেই বললেই হয়। মে জুন মাসে কিছু স্বাস্থ্যকামী, আর কিছু সরকারী কর্মচারী দেশের কাজে এখানে আসেন। তারপর জুলাই-এর মাঝামাঝি যেমনি আকাশে দু-এক টুকরো মেঘের দেখা পাওয়া গেল, অমনি চেঞ্জাররা বাসের সীট রিজার্ভ করে ফেলেন। আর সরকারী চাকুরের দল

কোনোরকমে গোঁজামিল দিয়ে কাজকর্ম চুকিয়ে, জিপে করে অন্য কোনো সেণ্টারের দিকে রওনা হন। ইতিমধ্যে আরও মেঘ অলসভাবে ভাসতে ভাসতে প্রথমে দূরে বরফের মুকুটপরা সাদা পাহাড়টা এবং ক্রমশঃ আরও কাছের সবুজ গাছে-ভরা ছোটো পাহাড়গুলো গ্রাস করে ফেলে। তখন পথে-ঘাটে একটা মানুষের মুখ দেখতে পাওয়া যায় না। বৃষ্টি সুরু হয়ে যায়। এবং দু-একদিন মন্দ লাগে না তারপর ঝুপঝুপ, ঝমঝমের মধ্যে আর কোনো বৈচিত্র্য খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রাণটা তখন হাঁপিয়ে ওঠে। কিছুতেই যেন বৃষ্টি থামতে চায় না। শুকনো পথঘাট, সূর্যের আলো, আর ফরসা নীল আকাশের কথা লোকে একেবারেই ভুলে যায়। বাড়ির বাইরেও তখন কেউ যায় না। এমনকি শক্তির আউট্-ডোর হাসপাতালেও কোনো ভিড় থাকে না। হাসপাতালেও তখন কেবল দু-একটা ডেলিভারী কেস। চাকররা কোনোরকমে বাজারটা করে নিয়ে আসে, তাও তিন-চারদিন ছাড়া-ছাড়া। আর ফেরবার পথে খবর নিয়ে আসে পোষ্টাপিসের পাশের বাড়িটা ভেঙে পড়েছে, তার অফিসের কাজ বন্ধ; ঝড়ে টেলিগ্রাফ-লাইন ছিঁড়ে পড়েছে, মোটর রোডে বত্রিশটা ধ্বস নেমেছে; মতিঘাটে রাস্তার যে ক্ষতি হয়েছে, তা সারতে পাকা একমাস লাগবে। পি-ডবলু-ডির ওভারসিয়ার সিং-সায়েবের ছেলে প্রীতম এই বৃষ্টির মধ্যেই তিরিশটা কুলি নিয়ে মতিঘাট রওনা হয়ে গিয়েছে।

এমনিভাবে লোকে যখন চন্দ্র-সূর্য-তারকার মুখ দেখার আশা ছেড়ে দেয়, তখন হঠাৎ বৃষ্টিপড়া থেমে যায়। কালো কালো মেঘগুলোর মধ্যে হঠাৎ যেন নড়াচড়া আরম্ভ হয়ে যায়। সরকারী অফিসের বাবুরা যেন মন্ত্রীর ভিজিট উপলক্ষে পুরনো ফাইলগুলো সরাবার জন্যে উঠে পড়ে লেগে যায়। মেঘদের কর্মব্যস্ততার সুযোগ নিয়ে কিছু কাক আকাশে উড়তে আরম্ভ করে।

শক্তিও আর ঘরের মধ্যে বসে থাকতে পারে না। কোয়ার্টার্স থেকে বেরিয়ে পড়ে। পিছলে-ভরা রাস্তায় নামতেই দেখা যায় বুড়ো মানবেন্দ্র সায়েব আর রায়সায়েব মথুরা দত্ত যোশী উপবের দিকে তাকিয়ে আছেন। আকাশের অবস্থা বুঝে সবারই খানিকটা বেড়িয়ে আসার ইচ্ছা। কিন্তু কেউই এগোতে সাহস করে না। হতাশ হয়ে তখন কোয়ার্টার্সে ফিরে এসে কোটটা খুলে রাখতে হয়। কোনোরকমে কিছু মুখে পুরে এখন বিছানায় শুয়ে পড়ো। আর শুয়ে শুয়ে বাতাসের সোঁ সোঁ আওয়াজ, আর পাইনের সন্ সন্ শব্দ শোনো।

কিন্তু সকালে ঘুম থেকে উঠে সবাই অবাক হয়ে যায়। কোথায় গেল সেই কেলে মেঘগুলো, আর কোথায় গেল স্যাঁৎস্যাতে গা-ঘিনঘিন হাড়-মজানো হাওয়া! রোদ উঠেছে, ছোট্ট পাহাড়টা যেন লজ্জা ভেঙে মেঘের ঘোমটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দাঁত বার করে হাসছে। বড়রাস্তায় দাঁড়িয়ে তখন রায়সায়েব মথুরদত্ত চোখ রগড়ে একবার সন্দিগ্ধমনে আকাশের দিকে তাকাবেন। পি-ডবলু-ডির ওভারসীয়ার সিং-সাহেবের ছেলে প্রীতমকে তাঁরই পাশ দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে মতিঘাট থেকে ফিরে আসতে দেখা যাবে। তার কাছেই জানা যাবে মোটর রোড মেরামত হয়ে গিয়েছে। বাস এবং লরীও চলতে শুরু করেছে।

লোকে তখন ক্যালেণ্ডারের দিকে না তাকিয়েই তারিখ বলে দেবে, সেপ্টেম্বর এসে গিয়েছে। শক্তির ডিস্পেন্সারীতে ভিড় বাড়বে। রায়সায়েব মথুরাদত্ত লাঠির উপর

ভর করে খোঁড়াতে খোঁড়াতে আসবেন—"ডাক্তারসাব্, বাতের একটা ওষুধ দাও, ক'দিন ধরেই ব্যথাটা চাগিয়েছে, বৃষ্টির জন্য আসা হচ্ছিল না।"
প্রীতম সিং-এর বাবা বলবেন, "ডাক্তার, চোখটা আর-একবার দ্যাখো তো। কোথায় যে অপারেশন করাই বুঝতে পারছি না। আমেরিকান মিশনারী ডাক্তাররা তো শুনছি এবার এখানে মোবাইল চোখের হাসপাতালের তাঁবু ফেলেছে। কিন্তু প্রীতম বলছে, তোমার কাছ থেকে চিঠি নিয়ে কলকাতায় যেতে।"
হাসপাতালের খালি সীটগুলো ক্রমশঃ বোঝাই হয়ে আসে। আশেপাশের গ্রামের রোগীরা দলে দলে আউটডোরে ভিড় করতে আরম্ভ করে।
আকাশের সূর্য মাটির পৃথিবীকে সোনালী রঙে ঝলমলিয়ে দেয়। বর্ষায় শ্যাওলাপড়া বাংলোগুলোতেও রঙ পড়তে আরম্ভ করে। বাংলোর সামনে ফুলের বাগানগুলোতে মালিদের কর্মব্যস্ততা হঠাৎ ভয়ানক বেড়ে ওঠে। আর কয়েকটা ফুল ফোটবার সঙ্গে সঙ্গেই শহরের সায়েবরা আসতে শুরু করেন।
এখানকার গরীব-মহলে সাড়া পড়ে যায়। বাজারে সব্জির দাম চড়ে যায়, আপেলের ঝুড়িতে গাদা গাদা আপেল সাজানো হয়। অনেকেরই ছোটখাটো চাকরি জুটে যায়। কিন্তু এখানকার স্থায়ী অভিজাত সম্প্রদায় যাঁরা, তাঁরা দিন গোনেন, আর নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেন, "যুবরাজ কবে আসছেন?"
রায়সায়েব মথুরাদত্ত, শক্তির সঙ্গে দেখা হলেই বলেন, "আর দু'দিনের মধ্যেই যুবরাজ এসে পড়বেন।"
"সত্যিকথা বলতে কি, উনি না-আসা পর্যন্ত আমাদের সীজন আরম্ভ হয় না। শরৎ এসেছে বলে মনে হয় না"—প্রীতম সিং-এর বাবা বলেন।
তারপর একদিন ভোরে রায়সায়েব মথুরাদত্ত, প্রীতম সিং-এর বাবা, রিটায়ার্ড মেজর হরবন্সলাল একসঙ্গে হৈ হৈ করতে শক্তির কাছে আসেন,—"দেখুন ডক্টরসাব্ এ হোতেই হবে। যুবরাজ এসেছেন, আর ওমনি পাহাড়ের চূড়ায় বরফ দেখা যাচ্ছে সীজনের এই ফার্স্ট স্নো। প্রতিবার এই হয়েছে, যুবরাজ যেদিন আসবেন, তার ঠিক পরের দিন ভোরেই প্রথম বরফ-সমেত পাহাড় দেখতে পাওয়া যাবে। এ হোতেই হবে। দশ বচ্ছর আমরা দেখে আসছি।"
রায়সায়েব মথুরাদত্ত বরফে-মোড়া দূরের পাহাড়টার দিকে তাকাতে গিয়ে হঠাৎ আমাকে দেখতে পেলেন। শক্তি পরিচয় করিয়ে দিলে।
উনি জিজ্ঞেস করলেন, "কবে এলেন?"
বললাম, "গতকাল।"
রায়সায়েব মথুরাদত্ত এবার শক্তির দিকে মুখ ফেরালেন। 'যা বলছিলাম। অনেকদিন আগেকার কথা, ডক্টর রায়চৌধুরী তখন এখানকার চার্জে। যুবরাজ সেবার আসতে দেরি করছেন। আর স্নো-লাইনেরও দেখা নেই, পাহাড় সারাক্ষণ মেঘে ঢাকা হয়ে পড়ে আছে। থার্ড উইকেও স্নো-ভিউ নেই। টুরিস্টরা অধৈর্য হয়ে পড়েছে। বাজারের লোকেরা ভয় পেয়ে গেল, সীজনটা মাঠে মারা যাবে। আমার কিন্তু কোনো চিন্তা নেই। মেহ্রাকে বললাম, 'যুবরাজকে তাড়াতাড়ি আসতে লিখে দাও।' সবাই আমার কথা শুনে হাসলো। দিন-তিনেক পরে সন্ধ্যের দিকে দলবল নিয়ে যুবরাজ এলেন। আর ঠিক তার পরের দিন ভোরে, কোথায় গেল মেঘ, কোথায়

গেল কুয়াশা, পরিষ্কার স্নো-ভিউ পাওয়া গেল।"
মেহ্‌রা-সায়েব রায়সায়েবকে সায় দিলেন। তারপর আমাদের দু'জনকে বললেন, "যুবরাজ চমৎকার মানুষ। হাজার হোক রাজরক্ত তো। ইংরেজরা মশাই আর যাই করুক, রাজরক্তের কদরটা নিজের দেশেও দেয়। আবার এখানেও দিচ্ছে। আমাদের ও-সব বালাই নেই। সেইজন্যই তো আমাদের এত দুর্গতি। যুবরাজ সম্বন্ধে আপনাদের এখন কিছু বলে লাভ নেই, ডক্টর মুখার্জী। আপনার সঙ্গে যুবরাজের আলাপ হবেই। প্রতিবার এখানে এসেই উনি টি-পার্টি দেন। এখানকার সমস্ত গণ্যমান্য লোকদেরই নেমতন্ন করেন।"
পরের দিন সত্যিই যুবরাজের কাছ থেকে একটা চিঠি এলো। চিঠিটা পড়ে শক্তি বললে, "সত্যি ভদ্রলোক। হাজার হোক রাজরক্ত তো। আমাকে তো নিমন্ত্রণ করছেনই, আবার শেষ লাইনে লিখেছেন, "খবর পেলাম, কলকাতা থেকে আপনার এক বন্ধু এসেছেন, তাঁকেও আগামীকাল বিকেলে সঙ্গে করে আনতে ভুলবেন না।"

যুবরাজের পার্টির জন্য আমরা যখন রওনা দিলাম তখন চারটে। একটা ঢালু পথ ধরে খানিকটা হাঁটলেই দেখা যায় রাস্তাটা ডানদিকে বেঁকে গিয়েছে। সেখান থেকে পথটা আবার উঁচুদিকে উঠেছে এবং সেই পথ ধরে কিছুটা গিয়েই একটা ছোট্ট শ্বেত পাথরের ফাঁকে কালো কালো অক্ষরে লেখা "আনন্দপুরের যুবরাজ।" গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকেও কোনো বাড়ি চোখে পড়লো না। শুধু পথের দু'ধারে নারশিসাস্ ফুলের সমারোহ। আর একটু এগিয়ে প্রশস্ত লন। সেখানে নানা রঙের ফুলের সমারোহ। লনের মধ্যেই বসবার বন্দোবস্ত হয়েছে। সবুজ রঙের বেতের চেয়ার, আর ছোটো ছোটো টি-পয় পরিপাটি করে সাজানো।
আমাদের দেখেই এক ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন, "আসুন, আসুন, আপনি নিশ্চয় ডক্টর মুখার্জী। আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে খুবই আনন্দিত হলাম।" তারপর ভদ্রলোক আমার দিকেও হাতটা বাড়িয়ে দিলেন।"
বুঝতে পারলাম ইনিই যুবরাজ। বছর চৌত্রিশ বয়স। দীর্ঘ সুগঠিত দেহ। নীল নীল দুটি টানা টানা চোখ। হাতের যেটুকু দেখা যায়, লোম ভর্তি। রাজকীয় চেহারাই বটে।
আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন যুবরাজ। বললেন, "আসুন একটু চেয়ারে বসা যাক্।" তারপর রহস্যচ্ছলে বললেন, "আমার মধ্যে কেবল একটা টাগ-অফ-ওয়ার চলে। আনন্দপুরে যখন থাকি, তখন দিনরাত এখানকার কথা মনে পড়ে। আবার এখানে এলেই আনন্দপুরের কথা মনে পড়ে যায়। আপনার বন্ধু এ-রোগের কোনো ওষুধ দিতে পারেন ?" আমি হা-হা করে হেসে উঠলাম। কিন্তু অত জোরে হেসে ফেলেই লজ্জা পেলাম। যুবরাজের হাসির সঙ্গে আমার হাসির কত তফাৎ। ওঁর হাসিতে একটুও শব্দ নেই, শুধু বিদ্যুতের একটা তরঙ্গ ঝিলিক দিয়ে মুখটাকে যেন উজ্জ্বল করে দিলে।
যুবরাজ বললে, "প্রতিবার শরৎকালে এখানে আসি। অনেকে আছেন, যাঁরা প্রতিবার নতুন নতুন জায়গায় চেঞ্জে যান। আমার বাবা অন্ততঃ তাই করেন। কিন্তু আমি এ-ব্যাপারে বহুচারী নই, স্ট্রিক্ট্‌লি মনোগামিস্ট।"

চা আর কেকের ফাঁকে ফাঁকে আমাদের কথাবার্তা বেশ জমে উঠেছিল। হঠাৎ একটা চাপরাসী যুবরাজের পিছনে এসে দাঁড়ালো। একটু বিরক্ত হয়েই যুবরাজ তার দিকে তাকালেন। সে কিন্তু অপ্রতিভ না হয়েই একটু চাপাগলায় বললে, "রাণীজী।"
যুবরাজের হাসিভরা মুখ মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে উঠলো। আমরা তাঁর এই পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি কিনা, তা তিনি আড়চোখে দেখলেন। তারপর মুখে যথাসম্ভব হাসি ফুটিয়ে বললেন, "এক্সকিউজ মি, আমি এখনই আসছি। ততক্ষণ আপনারা স্যাণ্ডউইচগুলো শেষ করুন, চুপচাপ হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন না।"
ওঁর হঠাৎ চলে যাওয়ার কারণটা না বুঝতে পেরে আমরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চায়ি করছিলাম। মিনিট-খানেকের মধ্যেই দেখলাম, যুবরাজ ড্রইংরুমের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসছেন। মুখটা গম্ভীর। আমাদের টেবিলে না এসে, উনি লনের উত্তর দিকে যে টেবিলটা পাতা ছিল সেদিকে গেলেন। রায়বাহাদুর মথুরাদত্ত সেখানে হরবনসলাল, প্রীতম সিং ইত্যাদির সঙ্গে আসর জমিয়ে গল্প করছিলেন। যুবরাজ তাঁদের পাশে গিয়ে বসলেন। একটুও সময় নষ্ট না করে, কৃত্রিম বিনয় প্রকাশ করে বললেন, "রায়সায়েব, আজকে এই পর্যন্ত। আরও খানিকটা গল্প করা যেতো। কিন্তু আমার একটু জরুরী কাজ রয়েছে। আবার একদিন কিন্তু আপনাদের আসতে হবে।"
আমি ও শক্তি অবাক হয়ে দেখলাম, যুবরাজ ব্যস্তভাবে এক একজনের সঙ্গে করমর্দন করে বিদায় দিচ্ছেন। হরবনসলাল, প্রীতম সিং, মেজর কুঠারী একে একে বিদায় নিচ্ছেন।
রায়সায়েব মথুরদত্ত যাবার আগে আমার কানে কানে বললেন, "এ কোন্ ধরনের ভদ্রতা বলুন তো। এতই জরুরী যদি কাজ আছে, তবে অন্য একদিন পার্টি দিলেই হতো। রাজরাজড়ার ব্যাপার মশাই, ভদ্রতা শিখবে কোথা থেকে। উঠলো বাই, তো কটক যাই।"
ইতিমধ্যে সেই বেয়ারাটা আবার যুবরাজের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। যুবরাজ তাকে ইঙ্গিতে চলে যেতে বললেন। মুখের ভাবে যে উদ্বেগ ফুটে উঠেছে তা চেপে রাখবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগলেন যুবরাজ।
সবাই যখন চলে গিয়েছে, আমরাও তখন উঠে পড়লাম। বললাম, "আমরাও চলি।"
যুবরাজ হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন, একটু ইতস্তত করে বললেন, "কিছু যদি মনে না করেন, ডক্টর মুখার্জীর সঙ্গে আমার একটু প্রয়োজন। আপনি কি একা একা পথ চিনে ফিরতে পারবেন? না আমার চাকরকে সঙ্গে পাঠাবো?"
এ-সব অনেকদিন আগেকার কথা। কিন্তু আমার আজও মনে আছে, রাগে ও অপমানে আমার সমস্ত শরীর তখন জ্বলে যাচ্ছিল। এ কোন্ দেশী ভদ্রতা? আমাকে চলে যেতে ব'লে, আমার বন্ধুকে রাখা?
শক্তিও বুঝতে পেরে বললে, "ওকে বরং আমিই বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি।
যুবরাজ শুনলেন না, শক্তির হাত চেপে ধরে বললেন, "প্লীজ, আপনি থেকে যান।"
শক্তি থেকে গেল। এবং আমি অপমানে ও ধিক্কারে জ্বলতে জ্বলতে শক্তির বাংলোতে ফিরে এলাম। সেই হাড়-কাঁপানো পাহাড়ী-ঠাণ্ডার মধ্যেও ঘামে আমার

সমস্ত শরীর ভিজে যাচ্ছিল। খামখেয়ালী যুবরাজের উদ্দেশে সমস্ত ঘৃণার বিষ ঢেলে দিয়েও আমার অপমানিত চিত্ত শান্ত হচ্ছিল না।

বাংলোতে ফিরে এসে চুপচাপ গুম হয়ে বসে থাকতে থাকতে কখন্ যে ঘুমিয়ে পড়েছি মনে নেই। শক্তির ডাকে ঘুম ভাঙলো। তাকিয়ে দেখলাম, বেশ অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। একটু রাগের সঙ্গেই জিজ্ঞেস করলাম, "ব্যাপার কী? যুবরাজের সঙ্গে কাজ শেষ হলো?"
শক্তি বললে, "আশ্চর্য লোক বটে যুবরাজ। সম্মানটাই সব নাকি জীবনের। ওটাই আগে বাঁচাতে হবে।"
"মানে?"
শক্তি বললে, "সত্যি, সমস্ত ব্যাপারটাই আশ্চর্য। দাঁড়া, জুতো মোজাটা খুলে বসি। অনেক ব্যাপার, বলতে সময় লাগবে।
জুতো মোজা খুলে একটা লুঙি পরে শক্তি সামনের ইজি-চেয়ারে বসলো, "তবে শোন্।"
আমি বিছানায় উপুড় হয়ে, বালিশে কনুই দিয়ে শুনতে লাগলাম—
"তুই চলে যেতেই যুবরাজের হাসির মুখোসটা খুলে পড়ে গেল। দেখলাম, মুখটা উদ্বেগে সাদা হয়ে উঠেছে।
যুবরাজ বললেন, 'আপনি শিগ্গির ভেতরে চলুন।'
ড্রইংরুমের পর্দা ঠেলে হন্তদন্ত যুবরাজ ভিতরে ঢুকে পড়লেন। আর আমিও তাঁকে অনুসরণ করলাম। চমৎকার সাজানো গোছানো ঘর। কিন্তু সেদিকে তখন নজর দেবার সময় নেই। ড্রয়িংরুম পেরিয়ে অন্দরমহল ঢুকেই সামনে কাঠের সিঁড়ি। আমাকে অনেকখানি পিছনে ফেলে রেখে যুবরাজ তখন তর্তর্ করে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠছেন। আমিও তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়ে হোঁচট খেলাম। উনি পিছন ফিরে একবার 'সরি' বলেই আবার উপরে উঠতে লাগলেন। দোতলায় উঠে বাঁদিকের একখানা ঘর ছেড়ে একটা পর্দাওয়ালা দরজার সামনে যুবরাজ থমকে দাঁড়ালেন। বললেন, 'এই ঘরে। ডক্টর মুখার্জী, এই ঘরে।'
এতক্ষণ অবসর পাইনি। এবার জিজ্ঞেস করলাম, 'ব্যাপার কি?'
যুবরাজ ততক্ষণে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন। আমিও ভিতরে ঢুকে প্রথমে দাঁড়ালাম। একটি মেয়ে। অপরূপ সুন্দরী। রঙ যেন ফেটে পড়ছে। বিছানায় নিস্পন্দ হয়ে রয়েছেন, আর ঘরের মেঝে জলে জলময়। বাসন্তী-রঙের সিল্কের শাড়ির খানিকটা ভিজে গিয়ে শরীরের সঙ্গে লেপ্টে রয়েছে। চুল থেকে জল তখনও টপ্ টপ্ করে মেঝেতে পড়ছে। কতই-বা বয়েস, পঁচিশ-ছাব্বিশ। পরিপুষ্ট দেহ। পায়ের কাপড় গোড়ালি থেকে বেশ খানিকটা উপরে উঠে রয়েছে। কী আশ্চর্য সাদা সেই অংশটুকু। তবে সাধারণ মেয়েদের তুলনায় পায়ে যেন একটু লোম বেশী।
যুবরাজ ঘরের এক বুড়ি ঝিকে ফিস্ফিস্ করে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন কেমন?'
ঝি বললে, 'একবার চোখ মেলে তাকিয়েছিলেন। তখনই ধরাধরি করে মেঝে থেকে এনে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছি।'
কোনো কথা না বলে আমি যুবরাজের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। এবার

আমাদের চোখাচোখি হলো। যুবরাজ সংকোচে চোখ নামিয়ে নিলেন। তারপর কোনোরকমে বললেন, 'আমার স্ত্রী। হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন।
পকেটে ষ্টেথো ছিল। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বিছানায় বসে পরীক্ষা করতে লাগলাম। যুবরাজ আরও কাছে সরে এসে ভয়ে ভয়ে এবং লজ্জিতভাবে জিজ্ঞেস করলেন 'আপনাকে আরও তাড়াতাড়ি ডাকা উচিত ছিল, তাই না? কিন্তু আমি পারলাম না। অতগুলো বাইরের লোক সব জেনে যাবে। ওদের সরিয়ে না দিয়ে আপনাকে ডাকতে পারলাম না।'
ইশারায় চুপ করতে বলে আমি আবার পরীক্ষা করতে লাগলাম। ফিস্‌ফিস্‌ করে জিজ্ঞেস করলাম, 'ব্যাপার কী? কি ভাবে হলো?'
যুবরাজ আমতা আমতা করতে লাগলেন, 'আমি ঠিক জানি না, আমি তো বাইরে ছিলাম, বোধহয় আমার ওয়াইফের সঙ্গে কিছু হয়েছে।'
আমি বুঝতে না পেরে বললাম, 'ইনিও তো আপনার ওয়াইফ, এইমাত্র বললেন।'
যুবরাজ আবার আমতা আমতা করতে লাগলেন, 'আপনাকে বলা হয়নি, ইনি আমার সিনিয়র-ওয়াইফ।'
'মানে, আপনার আরও ওয়াইফ আছে?'
'আমি কখনো দু'জনকে নিয়ে বেরোতে চাই না, কিন্তু এবার আমার কপালে ভোগান্তি আছে—কি যে দুর্মতি এলো দু'জনকেই নিয়ে এলাম।'
আমি বললাল, 'সে-সব পরে শোনা যাবে, আপাতত একটা ইঞ্জেকশন করা প্রয়োজন। আমার ব্যাগ তো হসপিটালে পড়ে আছে। সেটা আনতে হবে। তারই মধ্যে সব আছে।'
যুবরাজ এখন কি করবেন বুঝতে পারছেন না। উত্তেজনায় ঠিকমতো কথা পর্যন্ত বলতে পারছেন না। তবে উদ্বেগের থেকে, বাইরের লোকের কাছে লজ্জাই যেন ওঁকে বেশী বিব্রত করছে। প্রশ্ন করলেন, 'কেমন বুঝছেন, ডক্টর মুখার্জী?'
উত্তর না দিয়ে আবার বললাম, 'ব্যাগটা একটু তাড়াতাড়ি দরকার।'
যুবরাজ বললেন, 'আমিই যাচ্ছি। চাকর-বাকররা ঠিকমতো বুঝে আনতে পারবে না। আপনি, প্লীজ, ততক্ষণ এটেন্ড করুন।'
হন্তদন্ত হয়ে যুবরাজ বেরিয়ে পড়লেন। অনেকটা পথ হাঁটতে হবে। হাসপাতাল এখান থেকে খুব কাছে নয়।
ঘরের মধ্যে কেবল আমি আর সেই বুড়ী ঝি। চুপচাপ নাড়ি ধরে বসে আছি। এমন অস্বস্তিকর অবস্থায় ডাক্তারী-জীবনে কখনো পড়িনি।"
আমি বললাম, "তোর আর ক'বছরই বা প্র্যাকটিশ হয়েছে। জীবনটার অর্ধেকই তো পড়ে রয়েছে।"
বাইরে তখন ঝিঁঝিঁর ডাক শুরু হয়েছে। আর একটা অজানা পোকা মাঝে মাঝে অদ্ভুত চেরা স্বরে ডেকে উঠছে—'গঁট-গঁট-গঁ, গঁট-গঁট-গঁ। টেবিলে কেরোসিনের আলো মিট মিট করে জ্বলছে। বিছানার উপর আমরা দু'জন বসে আছি। একটা সিগারেট ধরিয়ে বললাম, "তারপর?"
চিরকাল গম্ভীর প্রকৃতির লোক শক্তি। জ্ঞানতঃ কখনও কাউকে কথার মধ্যেও আঘাত দেয়নি। একটা সিগারেট ধরিয়ে আবার গম্ভীরভাবে বলতে আরম্ভ করলো—

"ঘরের মধ্যে কেমন একটা থমথমে ভাব। বুড়ী ঝিটা আমার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। শুধু ঢোক গিলে বললে, 'রাণীমা'।
আমি এবার রাণীর হাতের মুঠি জোর করে ছাড়িয়ে দিলাম। তারপরে মুখে কয়েকবার জলের ঝাপটা দিলাম। মিনিট দু-একের মধ্যেই ছোটোরাণীর দেহটা নড়ে চড়ে উঠলো। তারপর আস্তে আস্তে তিনি চোখ খুললেন। বুড়ী অমনি কাছে গিয়ে ডাকলে, 'মাইজী, মাইজী।'
রাণী অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমার মনে হলো, রূপকথার রাজকন্যে যেন জীয়ন-কাঠির স্পর্শে ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। কিছু বুঝতে না পেরে রাণী বাঁদিকে চোখ ফেরালেন। এবং আমাকে দেখেই লজ্জায় দ্রুতবেগে বুকের সরে যাওয়া কাপড়টা ঠিক করে নিলেন। পায়ের কাপড়টাও নামিয়ে দেওয়ার জন্য উঠতে যাচ্ছিলেন। আমি কাপড়টা নিজেই সরিয়ে দিয়ে বললাম, 'এখন ওঠবার চেষ্টা করবেন না, একটু বিশ্রাম নিন।'
রাণী কিছু বুঝতে না পেরে ঝির দিকে তাকিয়ে জল চাইলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কেমন বোধ করছেন এখন?'
রাণী তখনও কিছু বুঝতে পারছেন না দেখে বললাম, 'আপনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। আমি ডক্টর মুখার্জী।'
এবার তিনি যেন সম্বিত ফিরে পেলেন। লজ্জায় তাঁর মুখটা রাঙা হয়ে উঠলো। শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখটা কিছুক্ষণ ঢেকে রইলেন। বললাম, যুবরাজ একবার ডিস্পেন্সারীতে গিয়েছেন, এখনই ফিরবেন।'
এবার রাণী যেন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বললেন, 'সে কি, যুবরাজ নিজে গিয়েছেন। ডক্টরসাব্, আপনি ওঁকে কেন যেতে এলাউ করলেন?'
একটু থেমে, বেশ সুন্দর ইংরিজীতে বললেন, 'আই অ্যাম্ স্যারি, ডক্টর। তোমাদের পার্টির কোনো অসুবিধে হয়নি তো?'
একটা শুকনো তোয়ালে দিয়ে বিছানার ভিজে অংশ মুছতে মুছতে বললাম, 'আপনি বিশ্রাম নিন, বেশী কথা না বলাই ভালো।'
নাড়িটা আবার পরীক্ষা করে হাতটা নামিয়ে রাখলাম। অনেকদিন রোগে ভুগে দুর্বল রোগীর মতন উনি একটু হাসলেন। তারপর খুব আস্তে আস্তে তিনি বললেন, 'ভয় নেই, ডক্টর, আমি সহজে মরছি না। আমার সতীন যে আমার স্বামীকে একা ভোগ করবে, তা হচ্ছে না। কোথায় গেলেন আমার সুয়োরাণী? ঠিক হয়েছে, আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছি, এবার বুঝতে পারবে মজাটা। আমার পিছনে এখন আর কিছুদিন লাগতে সাহস পাবে না।'
পায়ের কাপড়টা আবার গোড়ালী থেকে সরে গিয়েছিল। এবার নিজেই উঠে পড়ে তিনি পায়ের কাপড়টা ঠিক জায়গায় নামিয়ে দিলেন। কুচো কুচো যে চুলগুলো কপালের উপর এসে পড়েছিল, সেগুলো সরিয়ে দিলেন। উঠে বসতে চাইলেন। বারণ করলাম। কিন্তু যখন শুনলেন না, তখন পিঠের তলায় কয়েকটা বালিশের ব্যবস্থা করলাম। একটু জল খেয়ে রাণী বললেন, 'ও-বেচারাকে কেন পাঠালেন? জীবনে কোনোদিন একসের জিনিস এ-টেবিল থেকে ও-টেবিলে যে সরিয়ে রাখেনি, তাকে আপনি ব্যাগ আনতে পাঠালেন, ডক্টরসাব্।'

মনে-মনে একটু রাগ হলো। একবার ভাবলাম, বলি, 'দায়টা কিছু আমার নয়। আর জীবনে কখনো একসের জিনিস হাতে করেননি, এটা কোনো মানুষের পক্ষে গর্বের কথা নয়।'
কিন্তু মুখে বললাম, 'আমি কিছুই বলিনি। উনিই নিজেই গেলেন।'
আমার দিকে তাকিয়ে এবার বেশ স্নেহের সঙ্গে হাসলেন রাণী। 'আপনি তো খুব কম বয়সে ডাক্তার হয়েছেন।' বললেন, 'ব্যাগ এলে কিন্তু আবার ফোঁড়াফুঁড়ি করবেন না যেন। বেশ তো ভালো হয়ে গিয়েছি। ওসব আবার কেন?'
আমি হেসে বললাম, 'আপনার এতগুলো লোককে যে ব্যস্ত করলেন, ওটা তার শাস্তি।'
'বটে।' বেশ আব্দার করেই উনি বললেন, 'না না, ও-সব হবে না। আমার বাপের বাড়িতে যে ডাক্তার ছিলেন, তিনিও বাঙালী। আর ঐরকম কথায় কথায় তিনি ইঞ্জেকশনের ভয় দেখাতেন।'
একটু থেমে বললেন, 'আপনাকে তো চা খাবার কথাও জিজ্ঞেস করিনি।'
আমি বললাম, 'ও-সব ফর্মালিটি অন্যদিন দেখাবেন। এখন তো রোগী-ডাক্তারের সম্পর্ক।'
শক্তি এবার একটু থামলো। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, "চমৎকার ভদ্রমহিলা। কয়েক মিনিটেই যে-কোনো লোককে আপন করে নিতে পারেন।"
আমি বললাম, "তারপর?'
"বুড়ী ঝিকে একটু গরম দুধ আনতে বললাম। এবং সে উঠে যেতেই রাণী যেন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। 'ডক্টরসাব্, গাছের গোড়া কেটে দিয়ে ডগায় জল ঢেলে কী হবে? আমার চিকিৎসা করে লাভ নেই। এই যে আমি আর সহ্য করতে না পেরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম, তাতে আমার সতীনের কিছু এসে যাবে? সুয়োরাণী যে। তিনি নিশ্চয় নিজের ঘরে বসে আছেন। আমার ঘরে ঢোকেনি তো? ওকে বিশ্বাস নেই, কার সঙ্গে কি মিশিয়ে দেবে। সেবার বাচ্চা হবার সময়...' রাণী থমকে গেলেন। তারপর দরজার দিকে একবার তাকিয়ে বললেন, 'ডক্টরসাব্, আপনাকে আমার একটা উপকার করতে হবে। ও-বেটীর জন্য আমার স্বামীকে একটু কাছে পাবার উপায় নেই। আপনাকে পরে সব বলবো। আপনি দয়া করে আমাকে এখানে একলা রাখার ব্যবস্থা করুন।' রাণী হঠাৎ আমার হাতটা চেপে ধরলেন।
বাইরে তখন জুতোর মচ্ মচ্ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। কোনোরকমে হাতটা ছাড়িয়ে নিলাম। যুবরাজ ফিরে এসেছেন। ব্যাগটা নামিয়েই, উনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন বুঝছেন, ডক্টর মুখার্জী?'
ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জটা পরিষ্কার করতে করতে বললাম, 'জ্ঞান ফিরে এসেছে।'
ইঞ্জেকশন দিয়ে হাতটা ম্যাসাজ করতে করতে বললাম, 'কিন্তু হার্ট বেশ উইক। কিছুদিন বেশ সাবধানে থাকতে হবে। কোনোরকম উত্তেজনা সহ্য হবে না।' আড়চোখে যুবরাণীর দিকে তাকিয়ে দেখলাম তাঁর মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।
যুবরাজ আমার সঙ্গে বেরিয়ে এলেন। 'তাহলে কী করি বলুন তো? আমার আর এক স্ত্রীও যে এখানে রয়েছেন। তাঁকে আনন্দপুরে রেখে আসবো? না এঁকেই

পাঠিয়ে দেবো ? এবারে হলিডের কোনো আনন্দই বোধহয় কপালে নেই।'
আমি বললাম, 'আপনার অন্য স্ত্রীকেই বরং পাঠিয়ে দিন। এখানকার জল-হাওয়ায় পেসেণ্ট তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে উঠতে পারবে।"

সেদিন রাত্রে শক্তির কাছে এই পর্যন্ত শুনেছিলাম। শুনে যে বেশ আশ্চর্য হয়েছিলাম, বলাই বাহুল্য। এবং তারপরও কয়েকদিন ধরে অনেক শুনেছিলাম শক্তির কাছে। রোজ একবার করে রাণীকে দেখবার জন্য তাকে যেতে হতো। রাণী তখন বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছেন, এবং অন্য রাণীকে আনন্দপুরে রেখে আসতে গিয়ে যুবরাজ তখনও ফেরেননি। নেটিভ স্টেটের রাজরাণীদের সম্বন্ধে আমার যে খুব ভালো ধারণা ছিল না, তা প্রকাশ করতে লজ্জা নেই। রায়গড় আর বেরেলীতে বসে এককালে এঁদের সম্বন্ধে কত গল্প শুনেছি। নিশ্চিন্ত বিশ্রামে বিলাসের মধ্যে যাঁরা জীবন কাটায় তারা কিই-বা নতুন কথা শোনাতে পারে? কিন্তু এ রাণী যেন অন্য প্রকৃতির।

শক্তি তো দু-মুখে প্রশংসা করে। রাণীও শক্তিকে সহজে ছাড়তে চান না। গেলেই গল্প করেন। বলেন, 'আর একটু বসুন, ডক্টরসাব্।'

শক্তি বলে, 'আমাকে যে হাসপাতালে যেতে হবে।'

'যাবেন'খন। এখনও অনেক সময় আছে। একটু চা না-খাইয়ে ছাড়ছি না।'

চা খেতে খেতে রাণী একদিন হঠাৎ বলে ফেলেছিলেন, 'ডক্টরসাব্, তোমাদের দেখলে আমার হিংসে হয়। কেন যে রাজার ঘরে জন্মেছিলাম।'

শক্তি চমকে ওঠে। 'বলেন কি ? আমরা যে ঠিক তার উল্টো ভাবি। কেন যে রাজার ঘরে জন্মালাম না।'

রাণী হেসে ফেলেন। 'ডাক্তার, তোমরা যে পুরুষমানুষ। মেয়ে হলে বুঝতে আমার কথা।'

তারপর সত্যিই নিজের কথা বলতে আরম্ভ করলেন। 'রাজার ঘরের মেয়ে আমি। রাজার ঘরে বিয়েও হয়েছে। আমার বাবার দশ রাণী। আর আমরা বারো ভাই, ছত্রিশ বোন। বুঝলে ডক্টরসাব্ ? হাতীশালে যেমন হাতী থাকে, ঘোড়াশালে যেমন ঘোড়া থাকে, তেমনি হারেমে রাণী। বাবাকে দেখেছি আমরা, দূর থেকে। বাবা যেমন ঘোড়াশালে গিয়ে বাচ্চা-ঘোড়াদের পিঠ চাপড়ে দিয়ে আসেন, তেমনি কখনও কখনও আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসে পিঠ চাপড়িয়ে দিয়েছেন। ঘোড়ারা তবু মাঝে মাঝে একটু বেশী ওঁর নিজের হাতের আদর যত্ন পেয়েছে আমরা তাও পাইনি। তিনি তাঁর শিকার, রাজকার্য, বড়োজোর নিজের সুয়োরাণীকে নিয়ে ব্যস্ত। আমাদের কথা কখনও ভেবেও দেখেননি। তবে অন্য অনেক বোনেদের চেয়ে আমার একটু ভাগ্য ভালো ছিল। এমন একজন গভর্ণেসের হাতে পড়েছিলাম, যিনি সত্যিই আমাকে ভালোবাসতেন। আমিও তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করতাম। এই যে দেখছো ইংরিজীটা সহজে বলে যেতে পারি এ তাঁরই জন্যে।

তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করতেন, 'রাজকুমারী, তুমি বড়ো হয়ে কি হতে চাও ?'

আমি বলতাম, 'ম্যাডাম, আমি তোমার মতো গভর্ণেস হবো। ছোটো ছোটো মেয়েদের হারেমে তোমার মতো ইংরিজী শেখাবো, টেনিস শেখাবো, ছবি আঁকাবো।'

তিনি হেসে ফেলতেন। বলতেন, 'প্রিন্সেস, এ-সব কথা আর কাউকে বোলো না। তুমি যে মহারাজের ঘরে জন্মেছো, তাঁদের বংশের একটি মেয়েও কখনও সাধারণ

ঘরে বিয়ে হয়নি। এখন থেকে বরং প্রার্থনা করো যাতে খুব বড়ো কোনো রাজ্যের যুবরাজের সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়। তারপর একদিন বুড়ো শ্বশুর মহারাজা চোখ বুজলেন, আর তোমার যুবরাজ রাজা হয়ে বসবেন, তখন তুমি যেন তাঁর পাটরাণী হতে পারো।' মিস্ এলিস্ এই বলে হাসতেন।

আমি তখন বয়েসে ছোটো। জিজ্ঞেস করে বসলাম, 'আচ্ছা, তোমার রাণী হতে ইচ্ছে হয় না? মস্ত বড় রাজার বৌ হয়ে থাকবে।'

মিস্ এলিস্ হাসতে হাসতে আমাকে কাছে টেনে নিতেন, আর বলতেন, 'তাই যদি হই, তাহলে তোমাদের শেখাবে কে? এই যে তুমি ইংরিজী কবিতা পড়ছো, নাটক পড়ছো, পিয়ানো বাজাচ্ছো, এ-সব দেখবে কে?'

খুব ভালো লাগতো মিস্ এলিসকে। ছত্রিশ মেয়ের এক মেয়েকে সংসারে কেই-বা দেখে। মিস্ এলিসই আমার সব। তিনি বলতেন, 'রাজকুমারী, এ-চাকরি আমি কিন্তু চিরকাল করবো না। এখনই ছেড়ে দিতে পারতাম, আমার ভাবী স্বামী তো অনেকবারই ছেড়ে দিতে লিখেছেন। কিন্তু আরও কিছু টাকা জমিয়ে নিচ্ছি। তারপর চলে যাবো।'

শুনে আমার ভয় লাগতো। ওঁর বুকে মাথা গুঁজে কেঁদে ফেলতাম, 'আমাকে ছেড়ে চলে যাবে? কে একটা ছেলে সাসেক্সে বসে গল্প লেখে, সে-ই তোমার কাছে বড়ো হলো। আর আমি তোমার কাছে থাকি, এত ভালোবাসি, আমি কেউ নই?'

সে-সব ছেলেমানুষীর কথা ভাবলে এখন নিজের লজ্জা হয়। তিনি বলতেন, 'তোমার বিয়ে না দেখে আমি যাচ্ছি না। ভিনদেশের এক রাজপুত্তুর টগ্‌বগিয়ে ঘোড়ায় চড়ে এসে আমাদের রাজকন্যেকে নিয়ে উধাও হবে, তবে তো আমার ছুটি।'

কেন জানি না, রাজা-রাজড়াদের আমার তখন থেকেই ভালো লাগতো না। নিজের বাবাকে দেখেই অন্যদের সম্বন্ধে কেমন একটা ধারণা মনে মনে তৈরি করে নিয়েছিলাম। তাছাড়া, ইংরিজী বই পড়ে আর গল্প শুনে, আমারও ওদের দেশের মেয়েদের মতো হতে ইচ্ছে করতো। নিজের খুশি মতো চলবো, কাজ করবো, আনন্দ করবো, কোনো বাধা থাকবে না।

তবে সে-সব আশা মনের মধ্যেই চাপা থাকতো, কখনও প্রকাশ করিনি। কারণ, যে পরিবেশে আমাদের দিন কাটতো, তাতে বাইরের কোনো কথাই কারুর কানে পৌঁছতো না। আমিও হয়তো ও-সব জানতে পারতাম না, যদি না মিস্ এলিস্-এর মতো শিক্ষিকা পেতাম।

কিন্তু বাবা আমাদের ছত্রিশ বোনকেই রাজহস্তে দিতে চান। আর নেহাৎ যদি রাজা না মেলে, তবে নিদেনপক্ষে জামাইএর রাজরক্ত থাকা চাই। এমনি করে আমারও একদিন বিয়ের ঠিক হলো। রুটিন মতো কাজ। বাবার চেয়ে দেওয়ানজী এ-সব বিষয়ে অনেক বেশী খবর রাখেন। তিনি একদিন খাতা খুলে দেখলেন, মহারাজের ছত্রিশ রাজকন্যার এক কন্যা বিবাহযোগ্যা হয়েছে। মহারাজকে তিনি মনে করিয়ে দিলেন। আর আমার বাবা তাঁর লম্বা দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে, পাত্র খোঁজবার হুকুম দিলেন। বিয়ের খরচের জন্যে একটা টাকার পরিমাণও ঠিক করে দিলেন।

তারপর একদিন সত্যিই আমার বিয়ে হলো। যুবরাজ ঘোড়ায় চড়ে এলেন, বাজি ফুটলো, শোভাযাত্রা বেরোলো। তবে ছুটিছাটা কিছু হলো না। এর আগে আমার

আঠারোটা বোনের বিয়ে হয়েছে। কতবার আর ছুটি দেওয়া যায়? আমার শ্বশুরে আনন্দপুরের রাজা, আমার বাবার তুলনায় অনেক ছোটো। তা আমার তাতে একটুও দুঃখ হয়নি। ভেবেছিলাম যত ছোটো, ততই হয়তো সকলকেও কাছে পাবো। আপন করে, নিজের মতো করে পাবো।

কিন্তু যেখানে এলাম, সেখানেও সেই একই কাহিনী। আমার বাবা শিকার নিয়ে মেতে থাকতেন। আমার শ্বশুরের শিকারের ঝোঁক নেই। তাঁর গানের নেশা। গান নিয়েই দিনরাত মাতাল হয়ে থাকেন। ওস্তাদ আর বাঈজীদের সঙ্গেই তাঁর থাকা-খাওয়া-পরা। মাঝে মাঝে শুধু দেওয়ানজী জোর করে দু-একটা বৈষয়িক কাজ করিয়ে নেন। রাজ্যের কোথায় কি হলো, কর আদায় হলো কি না, নতুন যে রাজ্য তৈরি হবে, তার জন্য ইঞ্জিনিয়র কোথা থেকে আসবে, রেসিডেণ্ট সায়েবকে বড়দিনে কি ভেট পাঠানো হবে, সবই দেওয়ানজীর দায়িত্ব।

শ্বশুর শুধু গান শোনেন, আর মাঝে মাঝে দেওয়ানজীকে হুকুম করেন, কালেখাঁর জন্য একটা ভালো বাড়ির ব্যবস্থা করুন। ও'র সেবাযত্নে যেন কোনো গাফিলতি না হয়। আর শ্রীমতীবাঈ-এর জন্য হীরে-বসানো হারটা কলকাতা থেকে এখনও এলো না কেন? খবর নিন।'

আমার পাঁচজন শাশুড়ী। মহারাজের এখনও প্রতি বছর দুটি তিনটি ছেলে-মেয়ে হয়। তা তাঁর কতগুলো সন্তান হলো সে-হিসেব তিনি নিজেই ঠিকমত রাখেন না। তাঁরই বড়ো ছেলে আপনাদের যুবরাজ। আমার স্বামী বাবারই ছেলে। উনি আবার গান বাজনার ভক্ত নন। ও'র হলো তাস আর দাবা। এদিকে পাকা সায়েব। ক্রিকেট খেলেন, টেনিস খেলেন, মাঝে মাঝে শিকারেও যান। কিন্তু জীবনে কখনও কাজ করেননি, ভগবানের ইচ্ছেয় করবার দরকারও নেই।

আমার বিয়ের এক বছরের মধ্যেই শ্বশুর আবার নতুন ফন্দি ঠাওরালেন। আমি প্রথমে কিছুই জানতে পারিনি। একদিন ঝি বললে, 'রাণীমা, যুবরাজের তো আবার বিয়ে।'

আমি প্রথমে চমকে উঠেছিলাম। ঝি বললে, 'দেওয়ানজীর মেয়ে। ও'র একমাত্র মেয়ে। চিরকাল তো রাজবাড়ীর সেবা করেই কাটালেন। ও'র অনেক দিনের ইচ্ছে রাজবাড়ীর সঙ্গে একটা চিরকালের সম্পর্ক তৈরি করেন। আর মহারাজও বললেন, দেওয়ানজী, আমি চোখ বুঝলে রাজ্য দেখবে কে? আর তোমার সংসারের চিন্তাও আমি বেশী বাড়তে দিতে চাই না। একমাত্র মেয়ে তোমার, তার যদি দূরদেশে কোথাও বিয়ে হয়, তাহলে তোমার আর কাজে মন থাকবে না, সর্বদাই মেয়ের কথা ভাববে। তা আমি হতে দেবো না। যদিও কৃষ্ণপুর, সিন্দার আর কণ্ঠেশ্বর-এর রাজারা আমার উপর অসন্তুষ্ট হবেন, তবুও তোমার মেয়ের সঙ্গেই যুবরাজের বিয়ে দেবো।'

আনন্দপুরের যুবরাণী এই পর্যন্ত বলে চুপ করলেন।"

আর আমাকেও এই পর্যন্ত বলে শক্তি চুপ করলে।

পেটের গোলমাল সারাতে এসেছিলাম। প্রকৃতির দিকেও খানিকটা নজর রাখবার লোভ ছিল। কিন্তু এই নির্জন দেশে এমন বিচিত্র জীবনের সন্ধান পাবো আশা করিনি।

শক্তি সিগারেট ধরালে। একটা লম্বা টান দিয়ে আবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে, "হ্যাঁ রে, অনেকক্ষণ ধরেই তো পরচর্চা করছি। কিন্তু সেই যে তোর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে বলবি বলেছিলি।"

আমি বললাম, "ভাই, যেটা আরম্ভ করেছিস সেইটা আগে শেষ কর্। বেলা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনেকবার দেখতে পাবি। প্রয়োজন হলে, নিজের জীবনেই একটা বেলা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জুটিয়ে নিতে পারবি। কিন্তু যুবরাণীকে আর কখনও দেখতে পাবি না।"

শক্তি সিগারেটের ধোঁয়া কুণ্ডলি পাকিয়ে বললে, "শেষ আর কি। শেষ তো এখনও কিছু হয়নি। উনি যতটুকু বলেছেন, তোকে বলে দিচ্ছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তোর মনে হবে যেন খাপছাড়া অসমাপ্ত রয়ে গেল। তবে আমার কথা আলাদা। আমি তো আর গল্প শোনবার জন্যে শুনি না। রোগী দেখতে চাই, তখন রোগী যদি দু-একটা মনের কথা বলতে চায়, তা আমাদের শুনতে হয়।"

"বিশেষ করে রোগী যদি রোগিনী হন। আনন্দপুরের যুবরাণী হলে তো কথাই নেই।" আমি ফোড়ন দিলাম।

চিরকালের লাজুক প্রকৃতির মানুষ শক্তি। লজ্জায় ওর মুখটা লাল হয়ে উঠলো। বললে, "যুবরাণী অন্য কাউকে মনের কথা খুলে বলতে পারেন না, তাই আমাকে সব বলেন। কিন্তু ওঁর জন্যে সত্যি আমার দুঃখ হয়। কী সৌম্য স্নিগ্ধ ব্যবহার। যখন বিছানায় শুয়ে থাকেন, আর আমি স্টেথো দিয়ে পরীক্ষা করি, আমার মুখের দিকে করুণভাবে তাকিয়ে থাকেন। আমি স্টেথো নামিয়ে রাখলে বিছানা থেকে উঠতে উঠতে বলেন, 'ডাক্তারসাব্' সহজে মরণ আমার কপালে নেই। ভয় নেই, আপনার নাম খারাপ করবো না।' তারপর বেয়ারাকে আমার জন্যে চা আনতে বলেন। নিজে হাতে কাপ এগিয়ে দেন। হাতে কেবল দু-গাছি হীরে-বসানো চুড়ি। গলায় পাথর বসানো নেকলেস। কানেও হীরের কাজ। অলঙ্কারের বাহুল্য নেই। কাপড়-চোপড়ে অভিজাত্য আছে, কিন্তু স্নিগ্ধ। চোখ-ঝলসানো ঔদ্ধত্য নেই।"

আমি বললাম, "তুই রাণীর ইতিহাসটা শেষ কর্।"

শক্তি আবার আরম্ভ করলে—

"যুবরাজ তো আবার বিয়ে করলেন। দেওয়ানজীর মেয়ে যুবরাণী হলেন। এক-রাজার-ছ'রাণী-বাপের-বাড়ি থেকে যে এক-রাজার পাঁচরাণী-শ্বশুরবাড়ি এসেছে, তার পক্ষে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আমাদের যুবরাণীও হননি। তবে মেয়েমানুষের মন তো, সতীন এলে কেই-বা খুশী হয়?

তারও কিছুদিন পরে যুবরাণী নিজের অবস্থা খানিকটা বুঝতে পারলেন। সুয়োরাণী এবার দুয়োরাণী হলেন। তা হয়েও তাঁর দুঃখ নেই। কিন্তু নতুন রাণীকে তাঁর মোটেই ভালো লাগে না। রাজকন্যে না হয়েও তিনি রাজকন্যের উপরে যান। পান থেকে চুন খস্‌লে মেজাজ সপ্তমে চড়ে ওঠে। আর হিংসে। যুবরাজ তাঁর সঙ্গে একটু হেসে কথা কইবেন, একটু একান্তে হাসি-ঠাট্টা করবেন, তাও দেওয়ানজীর মেয়ের সহ্য হয় না। যুবরাজ যেন একা ওঁরই।

শক্তিকে কাছে বসিয়ে রাণী বললেন, 'আচ্ছা, আমাকে দেখলে কি ঝগড়াটে, হিংসুটে মনে হয়? ঠিক করে বলুন, লজ্জা করবেন না।'

শক্তি বললে, 'না-না। আপনার অতিবড়ো শত্রুও ঐ অপবাদ দিতে পারবে না।'
'কিন্তু আমার স্বামী পারেন। উনি বলেন, আমিই নাকি ছোটো-রাণীকে দেখতে পারি না। আমিই নাকি যত ঝগড়া পাকাই।'
'আচ্ছা, আমরা তো প্রায় একই সময় অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিলাম। কিন্তু আমার ছেলে যে ন'মাসে হলো, তাতে আমার কী হাত থাকতে পারে বলুন তো।'
শক্তি জিজ্ঞেস করেছিল, 'সে কি?'
'হ্যাঁ ডাক্তারসাব্, হ্যাঁ। বুঝছেন না, আমার ছেলেই যে যুবরাজ হবে, আগে জন্মেছে সে। কিন্তু ওর ধারণা আমি তুক করেছি। ঠিক সময়ে প্রসব হলে ওর ছেলেই আগে হতো। নিজে তো পাটরাণী হবেন জানি। কিন্তু তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে, ভবিষ্যৎ থেকেও আমাকে মুছে ফেলতে চান। আমার ছেলে একদিন যুবরাজ হবে এবং পরে একদিন সিংহাসন পাবে, তা প্রাণে কিছুতেই সহ্য হচ্ছে না।'

শক্তি ও যুবরাণীর এইসব কথাবার্তা আমার নোটবুকে হুবহু লিখে রেখেছিলাম। এখন সেই পাতাগুলো উল্টোতে উল্টোতে হাসি লাগছে। কোথায় গেল দুয়োরাণীর ছেলের রাজা হবার স্বপ্ন, আর কোথায় গেল সুয়োরাণীর হিংসে। কিন্তু আমার হাসা উচিত নয়। তখন যুবরাণীই-বা কেমন করে জানবেন ভবিষ্যতে কী তোলা আছে। তখন কি আমিই জানতাম যে একদিন এই কলকাতায় বসে বসে আমিই এ-গল্পের শেষ দেখবো। যুবরাণীই-বা কি করে জানবেন, যে হেরে গিয়েও তিনি শেষ পর্যন্ত জিতে যাবেন।
যাহোক, ডাক্তারের পরামর্শ মতো যুবরাজ ছোটোরাণীকে আনন্দপুরে রেখে আসতে গেছেন। যুবরাণীরও আর আনন্দ ধরে না। এবার স্বামীর হাত ধরে কয়েকটা দিন অন্ততঃ নিশ্চিন্ত মনে বাগানের মধ্যে ঘুরে বেড়াবেন। বাচ্চাটাকে আনন্দপুরে রেখে এসে কী ভুলই না করেছেন। কিন্তু দুঃখ করে লাভ নেই, কেই-বা জানতো যে ভগবান এমনভাবে মুখ তুলে চাইবেন—ছোটোরাণীর মুখঝামটায় অজ্ঞান হয়ে তিনি মেঝেতে পড়ে যাবেন।
ছোটোরাণীকে আনন্দপুরে রেখে দু'দিনের মধ্যেই তাঁর ফিরে আসবার কথা। কিন্তু পাঁচদিনের মধ্যেও যুবরাজ এলেন না। যুবরাণী অভিমানে মুখটা ভারি করে বললেন, 'দেখলেন তো ডক্টরসাব্। আমার স্বামীর বিবেচনাটা দেখুন। আমি এখানে অসুখে পড়ে রইলাম আর ওঁর ফেরবার নাম নেই।'
একটু থেমে বললেন, 'তা ওঁকেই-বা কি দোষ দেবো। দেওয়ানের মেয়ের বুদ্ধি কি কম। এখন বুঝি, বাবা কেন বলতেন 'ছোটোঘরের মেয়েকে সংসারে আনতে নেই। ওর বুদ্ধির সঙ্গে আমি পারবো কেন? হেসে, কেঁদে, সোহাগ করে যুবরাজকে নিশ্চয় ভুলিয়ে রেখেছে।'
শক্তির মুখে শুনেছি, যুবরাণী এরপর আর নিজেকে সংযত রাখতে পারেননি। ওর সামনেই কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছতে আরম্ভ করেছেন। আর বলছেন, 'ডক্টরসাব্, তুমি রোজ আসবে। বাড়ির চাকর-বাকররা হয়তো দেখছে আমার অসুখ নেই, তবু তুমি রোজ আসছো। কিন্তু এখন আমি কিছুতেই ভয় পাই না। তুমি রোজ রোজ এসো। আর এসেই উঠি-উঠি বললে চলবে না।'

নিজেকে একটু সংযত করে নিয়ে যুবরাণী বলেছিলেন, 'তোমাদের মেয়েদের নাকি আশীর্বাদ করে, বলে রাজরাণী হও। জেনেশুনে তুমি অন্ততঃ আর কাউকে ঐ আশীর্বাদ কোরো না।'
মনের মধ্যে চিন্তার জট পাকাতে পাকাতে যুবরাণী বলছেন, 'তবুও আনন্দপুরের বদ্ধ পরিবেশ থেকে এখানে এসে কিছুটা শান্তি পেয়েছি। তোমাকে তো আর আনন্দপুরে পাবো না। বিকেলবেলায় মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয়, তোমার কোয়ার্টাসে একটু বেড়িয়ে আসি। কিন্তু ভয় হয়। আমার সঙ্গে আবার তোমার নামটাও যদি কুৎসার হাটে জড়িয়ে যায়। তাছাড়া পথে-ঘাটে একলা চলা! আমাদের মোটরেও পর্দা দেওয়া থাকে।'
শক্তি উত্তর দেয়নি। যুবরাণী নিজেই একটু হেসে বলেছেন, 'ডক্টরসাবু, আনন্দপুরের যুবরাণীর সঙ্গে একজন বাইরের পুরুষ গল্প করছে শুনলে আমার শ্বশুর যে কি করবেন জানি না।'
যুবরাণী থামেননি। বলেছেন, 'আবার তো ফিরে যেতে হবে আনন্দপুরে। যুবরাজ আবার তাস আর দাবার মধ্যে ডুবে যাবেন। শ্বশুর বুঁদ হয়ে বাঈজীর গান শুনবেন। শাশুড়ীরা সোনার বাটা থেকে পান বার করে খাবেন, আর ঠাকুরপুজো করবেন। ছোটোগিন্নী যুবরাজের কানে বিষ ঢালবেন, আর আমি ছেলেটাকে বুকে করে পড়ে থাকবো। কিন্তু তাও বা ক'দিন। ওরও তো রাজরক্ত। একটু বয়েস বাড়লেই আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাবে।'
পরের দিন সকালেই আমরা খবর পেয়েছিলাম, যুবরাজ ফিরে এসেছেন। এবং যুবরাণীর সঙ্গেও আর শক্তির দেখা হয়নি। এমনকি তিনি কেমন আছেন, সে-খবরও যুবরাজ ডাক্তারকে পাঠাবার প্রয়োজন মনে করেননি।
আমারও ছুটি ফুরিয়ে এসেছিল। সুতরাং কলকাতায় ফিরতে হলো। শক্তিকে লেখা প্রতি চিঠিতেই আমি যুবরাণীর খবর জানতে চেয়েছি। ও লিখেছে, "তাঁরা এখান থেকে সবাই আনন্দপুরে ফিরে গিয়েছেন। রাণীর কোনো খবর জোগাড় করতে পারিনি।"
রাণীকে আমি কোনোদিনই দেখিনি। তবু কেন জানিনা তাঁর কথা ভাবতে ভাবতে মাঝে মাঝে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করেছি। মানসপটে আনন্দপুরের রাজপ্রাসাদের একটা ছবিও এঁকে ফেলেছিলাম। দেখেছি সেই বিশাল প্রাসাদে বহুজনের ভিড়। কিন্তু কেউ যুবরাণীর আপন জন নয়। সেখানে তিনি নিঃসঙ্গ। সতীনের রক্তচক্ষু থেকে নিজের সন্তানকে সর্বদা আড়াল করে বসে রয়েছেন। ভালো লাগছে না তাঁর। এক মুহূর্তও ভালো লাগছে না। ইচ্ছে হচ্ছে রাস্তায় বেড়িয়ে আসতে, দু'জনের সঙ্গে কথা বলে মনকে শান্ত করতে। কিন্তু তা তো হবার নয়। সারা জীবন তাঁকে ওখানে বন্দিনী থাকতে হবে। যুবরাজ আর কোনোদিন ভুল করেও তাঁকে বেড়াতে নিয়ে যাবেন না। আবার যখন শরৎ আসবে, যুবরাজ আবার বেরিয়ে পড়বেন তাঁর পাহাড়ী দেশে। আনন্দপুর প্রাসাদের জানলার সামনে দাঁড়িয়ে যুবরাণী ক'দিনের-জন্য-দেখা এক যুবক বাঙালী-ডাক্তারের কথা ভাববেন।
শক্তির চিঠি পেয়েছি। সে লিখেছে, "ডিসেম্বরের শীত পড়েছে। ভদ্রলোক তো দূরের কথা, দেহাতীরাও তল্পিতল্পা ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে কবে নিচে নেমে গিয়েছে।

হাসপাতালও প্রায় খালি। তবু ধুনি জ্বালিয়ে বসে থাকতে হবে। চাকরি কিনা। সারাদিনই গরম জামাকাপড় পরে ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে রয়েছি। যেদিকে তাকাচ্ছি, সেদিকেই বরফ। পাহাড়ের মাথায় বরফ; গাছের ডালে বরফ; কাল রাস্তাতে পর্যন্ত বরফ ছড়িয়ে ছিল। চুপচাপ বসে বসে বরফ দেখতেও আর ভালো লাগছে না। তাই বসে বসে যুবরাণীর কথা ভাবছি। আর ভাবতে ভাবতে কেন জানিনা মনটা আরও খারাপ হয়ে যাচ্ছে। রাণী বা যুবরাণী বলতে চিরকাল অন্য একটা ধারণা ছিল। তাঁদের মাথায় মুকুট। সর্বাঙ্গে বহুমূল্য জড়োয়া গয়না। তাঁরা কোনো কথা বলেন না। সর্বদাই গম্ভীর। আর গম্ভীর ভাবেই রাজার পাশে সিংহাসনে বসে থাকেন। কিন্তু এ কী ধরনের যুবরাণী বল তো?"
শেষে লিখেছে, "না ভাই, আর বেশী কিছু লিখবো না। শেষে তুই কিছু একটা সন্দেহ করে বসবি।"
আমি সন্দেহ করিনি। কেননা যুবরাণীকে দেখবার একটা প্রবল ইচ্ছা আমার মধ্যেও ছিল।

তারপরও তো কতদিন কাটলো। ঐ হাসপাতাল থেকে বদলি হয়ে শক্তি অন্য হাসপাতালে গেছে। সেখান থেকে আবার অন্য এক জায়গায়।
ইতিহাসের কত না পরিবর্তন হলো। আগস্টের এক অন্ধকার রাতে আনন্দমত্ত ভারতবাসীর জয়োল্লাসের মধ্যে ইংরেজের পতাকা চিরতরে অবনমিত হলো। দিল্লীর মসনদে এবার নেহরু-প্যাটেল। যাবার আগে ইংরেজ সমস্ত দেশীয় রাজ্যকে স্বাধীনতা দেবার সংকল্প জানিয়েছিলেন। কিন্তু লৌহমানব প্যাটেল দ্বিধাবিভক্ত ভারতকে একেবারে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিতে রাজী হলেন না। "সোনার ভারতবর্ষকে বলকান রাজ্যে পরিবর্তিত করার জন্যে আমাদের শহীদরা ইংরেজের গুলির সামনে বুকপেতে দেয়নি; আমরাও কারাগার থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীন ভারতের দায়িত্ব গ্রহণ করিনি"—সর্দার প্যাটেল ঘোষণা করলেন।
ইংরেজের পক্ষপুটের আড়ালে এতদিন যাঁরা নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছিলেন, সেই সব নরপতিদের হঠাৎ টনক নড়লো। তারপর সর্দার-এর অঙ্গুলি-হেলনে রাতারাতি আরব্য উপন্যাসের মতো ভারতবর্ষের মানচিত্র যেন পাল্টিয়ে গেল। লোকে যেন ঘুম থেকে উঠে দেখলো, ভারতবর্ষের মানচিত্রে সর্বত্র ছড়ানো অসংখ্য বিন্দুগুলো অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। রাজাদের রাজত্ব শেষ। প্রজাদের হাতে সব ছেড়ে দিয়ে তাঁরা তল্পি-তল্পা গোটালেন। আনন্দপুরের কোনো সংবাদ পাইনি প্রথমে। পরে জানলাম, আনন্দপুরের মহারাজেরও মসনদ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। কিছু পেন্সেনের ব্যবস্থা হয়েছে, এবং বাড়িটাও রক্ষে পেয়েছে। পাঁচ রাণী, পঁচিশ সন্তান, আর পাঁচশো ভৃত্যের সেই জমকালো বাড়ির যে গল্প একদিন যুবরাণীর মুখে শুনেছিলাম, সেসব সিনেমা-ছবির মতো চোখের সামনে ভেসে উঠলো।
তারপর আবার সব ভুলে গিয়েছি। কত রাজার কোটি-কোটি টাকার রাজত্ব গেল, তাদের কথাই কেউ ভাবলে না। আর কোথায় আনন্দপুরের রাজা, যাঁকে জমিদার বললেই ভালো হয়।
ইতিমধ্যে শক্তি অনেক জায়গায় বদলি হয়েছে। ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত কলকাতায়

এসে হাজির হয়েছে। বছরখানেক হাইজিন ইনস্টিটিউটে কাজ করবে। আমাদের পুরনো সম্পর্কটা আবার যেন জমে উঠলো। মাঝে মাঝে আমরা একসঙ্গে ঘুরে বেড়াতাম।

সেদিন লাইট-হাউসে ম্যাটিনি শো-তে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম। সিনেমা থেকে বেরুবা মাত্রই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামলো। কোনোরকমে ছুটতে ছুটতে একটা চায়ের দোকানে এসে আশ্রয় নিলাম। দোকানের সামনে আরও অনেকে আশ্রয় নিয়েছে। কেউ বেমালুম দাঁড়িয়ে আছে; কেউ-বা চক্ষুলজ্জায় চেয়ারে বসে চা-এর অর্ডার দিচ্ছে। আমরাও একটা টেবিল অধিকার করে বসলাম। চায়ের অর্ডার দিয়ে, শক্তির দৃষ্টি হঠাৎ এক মহিলার দিকে আকৃষ্ট হলো। শক্তি যে বেশ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে বুঝতে পারলাম। বৃষ্টির জন্যই ভদ্রমহিলা আটকে পড়েছেন। শক্তিও ভদ্রমহিলার দিকে তাকাচ্ছে।

ওর হাঁটুতে একটা মৃদু ধাক্কা দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "ব্যাপার কী?"

ইশারায় আমাকে চুপ করতে বলে, শক্তি আড়চোখে ভদ্রমহিলাকে দেখতে লাগলো। ভদ্রমহিলা যে অসামান্যা সুন্দরী ছিলেন বোঝা যায়। কিন্তু আজ যেন তাঁকে বড় ক্লান্ত মনে হচ্ছে। রোদ, জল, ঝড়-বৃষ্টির সঙ্গে উনি যেন অভ্যস্ত নন। অতি সাধারণ একটা লালপেড়ে শাড়ি পরেছেন। আরও সাধারণ একটা হাতকাটা ব্লাউজ। মণিবন্ধে ছোট্ট একটা ঘড়ি। হাতে কতকগুলো এক্সারসাইজ বুক।

শক্তি বললে, "এবার বুঝতে পেরেছি। কিন্তু যা ভাবছি, তাই বা কী করে হবে? রাস্তা তো দূরের কথা, ঘরের মধ্যেও তাঁর মুখ দেখতে পাওয়া যেত না। কিন্তু···না ···নিশ্চই যুবরাণী। এই ক'বছরেই যেন আশ্চর্যভাবে পাল্টিয়ে গিয়েছেন।"

যুবরাণীও ইতিমধ্যে শক্তিকে দেখতে পেলেন। কয়েকবার তার দিকে তাকালেন। এরপর শক্তির পক্ষে আর বসে থাকা সম্ভব হলো না। উঠে গিয়ে, তাঁর কাছে দাঁড়ালো। আর সঙ্গে সঙ্গেই ভদ্রমহিলা বললেন, "ডক্টরসাব্। ডক্টর মুখার্জী না?"

শক্তিও প্রায় একই সঙ্গে বলে উঠলো, "যুবরাণী নয়?"

মৃদু হেসে যুবরাণী বললেন, "সে তো once upon a time. এখন আমি যুবরাণী নই—মিসেস্ শকুন্তলা সিং।"

শক্তি যেন চমকে উঠলো। "কী বললেন?"

"ডক্টরসাব্, চমকাচ্ছো কেন? যুবরাণী বিষণ্ণ হাসিতে মুখ ভরিয়ে দিলেন। তারপর প্রশ্ন করলেন, "আপনি কেমন আছেন বলুন।"

"আপনি কেমন আছেন তাই বলুন।"

"আমি তো প্রায়ই এদিকে আসি। আজও খাতাপত্তর, চক, পেন্সিল কিনতে মার্কেট এসে ভিজে গেলাম।" যুবরাণী বললেন।

প্রায় জোর করেই যুবরাণীকে শক্তি আমাদের টেবিলে এনে বসালো। বাইরে তখন প্রবলবেগে বৃষ্টি পড়ছে।

শক্তির ভাবগতিক দেখে বুঝলাম, খুব হচ্ছে থাকলেও সে যুবরাজের খবর জিজ্ঞেস করতে পারছে না। তবু কোনোরকমে শক্তি প্রশ্ন করলে, "আপনার শরীর কেমন?"

সামান্য হেসে যুবরাণী বললেন, "ডক্টরসাব্, মেয়েদের শরীরের কথা জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। মেয়েদের দেহ কিছু নয়, মন কিছু নয়, কপালটাই বড়ো।" একটু হেসে

বললেন, "কিন্তু খুব খুশী হলাম, কোনোদিন যে আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে ভাবিওনি।"

আমার সঙ্গেও যুবরাণীর পরিচয় হয়ে গেল। যুবরাণী বললেন, "আপনার বন্ধুর মতো ডাক্তার বড়ো-একটা পাওয়া যায় না।"

মিষ্টি হাসির ফাঁকে যুবরাণী যেন আমাকে যাচাই করে নিচ্ছিলেন। মনের সংকোচ যেন কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছিলাম না। নিজের মনে যুবরাণী বললেন, "ডক্টরসাব্, ভবিষ্যৎকে ভয় করে, সমীহ করেও দেখেছি; আবার ভয় না করেও দেখেছি। একটুও লোকসান হয়নি। বরং ভালোই হয়েছে।"

আমি কিছু না বলে, চোখ নামিয়ে বসেছিলাম। শক্তি হঠাৎ আমার পরিচয় দিয়ে বসলো। বললে, "ও লেখে।"

যুবরাণী হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠলেন। কিন্তু পরের মুহূর্তে আনন্দ ও ঔৎসুক্যে ওঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। হঠাৎ কত সহজ, সরল ও স্বাভাবিক হয়ে গেলেন। কোনোদিন তো তাঁকে দেখিনি, কিন্তু কথাবার্তায় মনে হলো যেন আমাদের কতদিনের পরিচয়।

আমরা দুজনেই তখন ওঁর কথা শোনবার জন্যে অধীর হয়ে আছি। কিন্তু যুবরাণী তখন অন্য প্রসঙ্গ পাড়লেন। "আচ্ছা, বুকে হাত দিয়ে বলুন তো, আপনারা—যারা লেখক তাদের কোনো মায়া-দয়া আছে কিনা। আমার গভর্ণেস্ মিস্ এলিস্ বলতেন, 'রাজকুমারী, পাঠক ছাড়া লেখকদের কোনো আপনজন নেই। পাঠকের পরিতৃপ্তির জন্যে লেখক সব করতে পারে। লেখকের ছেলে নেই, বৌ নেই, বাবা নেই, মা নেই, ত্রিসংসারে কোনো আপনজন নেই। পাঠককে খুশী করার জন্য পরম আত্মীয়জনের পরম গোপনীয় কথা সে লিখে দিতে পারে, প্রয়োজন হলে তাদের সর্বনাশ করতে পারে।' মিস্ এলিস্ যাঁকে ভালোবাসতেন তিনি একজন লেখক। তা শেষ পর্যন্ত তিনি বিয়ে তো করলেনই না, উল্টে মিস্ এলিস্ যে-সব চিঠি লিখেছিলেন, আর যা-যা বলেছিলেন সব মিলিয়ে কাগজে লিখে দিলেন।"

আমাদের দু'জনের তখন ও-সব কথা ভালো লাগছে না, আমরা যুবরাণীর নিজের কথা শুনতে চাই। শক্তি একবার কথার মোড় ফেরাবার চেষ্টা করলে, কিন্তু কিছুই হলো না। শক্তির কথায় কান না দিয়ে মুখটা আমার খুব কাছে এনে বললেন, "পুরো সত্যিকথাও তো আপনারা লেখেন না। হয় পুরো সত্যি লিখুন, না হয় পুরো কল্পনা থেকে লিখুন। সত্যের সঙ্গে মিথ্যার খুশিমত ভেজাল দেবার কোনো অধিকার নেই আপনাদের।"

আমি কিছু উত্তর দিতে পারিনি। শক্তিই আমাকে রক্ষে করলে। বললে, "আপনি ওকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেন, ভয় করবার মতো লোক নয় ও।"

যুবরাণী বললেন, "আমিই-বা ভয় করতে যাবো কেন। আমি কিছু অন্যায় করেছি?"

শক্তি এবার চুপ করে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। কোনো কথা বললে না।

যুবরাণী ওর মুখের দিকে তাকালেন। ওর মনের ভাবটা যেন বুঝতে পেরেই বললেন, "আশ্চর্য লাগছে? যার মুখ আগে সূর্যও দেখতে পেতো না, হঠাৎ সে কী করে কলকাতা শহরে হাজির হলো? আমার নিজেরই আশ্চর্য লাগে এক-

একসময়, আর আপনার তো লাগবেই। যাক্, ব্যাপারটা খুলেই বলি—
স্বাধীনতার পরই তো আমার শ্বশুরের সিংহাসন নড়ে উঠলো। পেন্সনের বদলে গদি ছাড়তে হলো! কিন্তু যা পেন্সন, তাতে পাঁচটা রাণী, পঁচিশটা ছেলে-মেয়ে, আর সেই অনুপাতে নাতি-নাতনীর পুরনো দিনের মতো চলতে পারে না। দরবারের মাইনে-করা ওস্তাদরাও একে একে বিদায় নিতে শুরু করলেন। শ্বশুরমশায়ের সঙ্গীত-অন্ত প্রাণ। যখন শোনেন অমুক ওস্তাদ কলকাতায় মিউজিক্ কনফারেন্সে গান গাইছে, রাগে মাথা চাপড়ান। বলেন, গান কি বারোয়ারি পুজো নাকি যে মাইক নিয়ে হাজারখানেক লোকের সামনে বসে পড়লেই হলো। কিন্তু কে কার কথা শোনে।
চাইলেই যত খুশি টাকা আর পাওয়া যাবে না। মেয়ের বিয়েতে দেওয়ানজীকে হুকুম দিলেই সোনা-দানা হীরে-জহরৎ এসে হাজির হবে না। কিন্তু সবাই পুরনো দিনের মতোই চলছে। নতুন অবস্থার সঙ্গে কেউ নিজেকে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করছে না? মহারাজ বলেন, 'আমার আর ক'দিন। আমার তো পেন্সন আছে। আমি কেন ভাববো।'
ও-বাড়ির এমন পরিবেশ যে, কেউ বিশ্বাস করতে পারে না, রাজত্ব নেই। রাজত্ব গেলেও রাজা উপাধিটা পুরোপুরি বজায় রেখেছেন আমাদের শ্বশুরবাড়ির সবাই। যুবরাজও। উনি বলেন, 'আমার শিরায় শিরায় রাজরক্ত। ছোটো কাজ আমার দ্বারা হবে না। মেয়ের বিয়ে রাজা রাজড়া ছাড়া দেবো না। বেনেদের আজকাল টাকা হতে পারে, কিন্তু আনন্দপুরের মেয়ে ব্যবসাদারের ঘরণী হতেই পারে না। অসম্ভব। অন্তত আমি বেঁচে থাকতে তা হতে দেবো না।'
সুয়োরাণী প্রথমে খুশী হয়েছিল। চাকরাণীকে বলেছিল, 'ওরে, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। হলো তো। রাজার বৌ-এর রাজার মা হবার গুড়ে বালি পড়লো তো। হতেই হবে, নইলে আমার কত পরে ওর ছেলে হবার কথা, অথচ তুকের জোরে আমার পনেরো দিন আগে ছেলে হলো।'
যুবরাণী কিছু বলেননি। চুপচাপ শুনে গিয়েছেন। ওঁর চিন্তা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। এই রাজত্বের মৃতদেহ আঁকড়ে ধরে ক'দিন চলবে।
ছোটোরাণী কিন্তু ও-সব মোটেই ভাবেন না। উনি বলেন, 'ব্যাটাছেলেদের কাজে আমার মাথা ঘামিয়ে লাভ কী? বেশ তো চলছে। সত্যি তো, রাজা-রাজড়ার ঘরের ছেলেরা কি বাজারে মাছ বিক্রি করতে যাবে? ওসব "বড়োর" আর-একটা চাল। এক অপরাধে ভগবান কী শাস্তিটাই না দিলেন। এবার বংশের গর্বটুকুও ডোবাবে। কিন্তু আমি তা হতে দিচ্ছি না।'
যুবরাণীর কিন্তু এ-সব মোটেই ভালো লাগে না। যুবরাজকে বলেন, "হ্যাগো আমাদের কী হবে? এখন থেকে কিছু কাজকর্ম করলে..."
চিরকাল যিনি তাস আর দাবা খেলে এলেন, তাঁর এ-সব ভালো লাগবে কেন? রেগে বলেছেন, "মেয়েমানুষের বুদ্ধিতে আমাদের বংশের কেউ কখনো চলেনি। আমিও চলতে চাই না।"
যুবরাণী তখন কাছেই এসে দাঁড়িয়েছেন। পিঠে হাতে বোলাতে বোলাতে বলেছেন, "রাগ করো কেন? তুমি রাগ করলে, আমি কী নিয়ে থাকবো?"

যুবরাজের রাগ পড়ে গিয়েছে। বলেছেন, "সবই তো বুঝি। বাবা মারা গেলে পেন্সন হয়তো বন্ধই হয়ে যাবে। কিন্তু কী করি বলো তো। আমরা কি আর সেইভাবে মানুষ হয়েছি। পয়সা রোজগারের মতো কোনো কিছুই তো শিখিনি।"
যুবরাণী বলেছেন, "যা-হয় কিছু করো। নিদেনপক্ষে একটা ছোটোখাটো ব্যবসা।"
ছোটোরাণীর কাছে খবর পেঁছুতেই তিনি বলেছেন, "বটে, আমার ঘর ভাঙচি। ওঁকে বশ করার চেষ্টা। দাঁড়াও।"
যুবরাজকে কাছে পেয়ে, মাথার চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে সুয়োরাণী বলেছেন, "হ্যাগো, তুমিও শেষ পর্যন্ত দোকানদারী করবে? বাবা যদি বেঁচে থাকতেন, আমাদের এমন দুর্গতি হতো না। না না, ও-সব মুদিদের মানায়, আমাদের ও-সব চলবে কেন? হাজার হোক মান-সম্মান বলে একটা বস্তু আছে তো।"
যুবরাজ বলেছেন, "ঠিক তো। মুদির কাজ আমার দ্বারা হবে না, রাজরক্তের অপমান।"
যুবরাণী এ-সব কথা জানতে পারেননি। কিছুদিন পরে আবার জিজ্ঞেস করেছেন, "হ্যাগা, কিছু ঠিক করলে?"
যুবরাজ এবার রেগে গিয়ে দু-হাতের দশটা আঙুল যুবরাণীর নাকের ডগায় এনে বললেন, "দেখতে পাচ্ছো, কোথাও কোনো কাজ করার চিহ্ন দেখতে পাচ্ছো? একপুরুষের রাজা নই আমরা। অনেক কালের রাজরক্ত যাদের দেহে থাকে তাদের হাত এমন নরম হয়।"
যুবরাণীর কথা শুনতে শুনতে কখন আমাদের খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। কফি আনা হলো। কাপে চুমুক দিয়ে রাণী বললেন, "দেখুন, আমার স্বামী খারাপ নন। ঐ দেওয়ানের মেয়েটাই ওকে নষ্ট করেছে। রাজরক্ত থাকলে কাজ হয় না, এ-কথা আপনারা বিশ্বাস করেন?"
শক্তি সায় দিয়ে উত্তর দিলে, "আমি তো কোনো কারণেই বুঝে উঠতে পারছি না।"
শক্তির উত্তরে যুবরাণী কিন্তু মোটেই খুশি হলেন না। একটু দুঃখের সঙ্গেই বললেন, "ডক্টরসাব, আপনাদের পক্ষে হয়তো বুঝে ওঠা শক্ত, কিন্তু আমাদের দিকটা—আমার স্বামীর দিকটাও—একটু ভেবে দেখবেন। সাতপুরুষে কেউ কোনোদিন পেট ভরানোর জন্যে কিছু করেনি। আগে তবুও মাঝে মাঝে যুদ্ধ বিগ্রহ করতে হতো, কিন্তু তিন পুরুষের মধ্যে তারও কোনো দরকার হয়নি। আমার স্বামী যতই চেষ্টা করুন, কিছুতেই আপনাদের মতো কাজ করতে পারবেন না। এই যে আমি আমার ছেলের জামা তৈরি করছি; সে কি আপনাদের ভালো লাগবে। কোনো কাজ-জানা মেয়ে সেই সেলাই দেখলে হয়তো হেসে মাটিতে লুটিয়ে পড়বে। কিন্তু উপায় নেই যে। আমাকে চেষ্টা করতেই হবে। খোকাকে বাঁচাতে হবে তো।"
একটু থামলেন যুবরাণী। তারপর আমাদের মুগ্ধদৃষ্টির সামনে বললেন, "এবার ছোটো করে বলি। অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমিও হয়তো মুখ বুজে পড়ে থাকতাম আনন্দপুরে। ওদের যা আছে, তা ভেঙে ভেঙে খেতে খেতেই আমাদের জীবনটা চলে যেতো। ঠিকও করেছিলাম, যুবরাজকে আর বলবো না।
কিন্তু মনের মধ্যে হঠাৎ নতুন চিন্তা এলো। ছেলেটা। যার একদিন আনন্দপুরের সিংহাসনে বসবার কথা ছিল, তার? তার কী হবে? একদিন ওকে জামা-কাপড়

পরাতে গিয়ে ওর কচি কচি হাতদুটো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম। বুকটা ঠাণ্ডা হয়ে এলো। ওর হাতটাও যে নরম তুলতুল করছে। এত নরম যে, একটু চাপ দিলেই যেন চামড়া ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোবে।

আমি যেন মানসচক্ষে দেখতে পেলাম, খোকা আমার বড় হয়ে উঠেছে। ওর হাত দুটো কিন্তু তেমনই নরম রয়েছে। সেই হাতদুটো আমার চোখের সামনে এগিয়ে এনে বলছে—বড্ড নরম যে, এই নিয়ে আমাদের বংশের কেউ কোনোদিন কাজ করেছে ?

কিছুতেই না। কিছুতেই আমি তা হতে দেবো না। কিন্তু আনন্দপুরের প্রাসাদে দাঁড়িয়ে সে-কথা কে বলবে ? রাজত্ব গেলেও, মহারাজ আজও তো বেঁচে রয়েছেন। প্যাটেল-সাহেব যতই লোহার মানুষ হোন না কেন, আনন্দপুরের রাজা আজও নির্বিবাদে একটা মেয়ের মাথা উড়িয়ে দিতে পারেন। কেউ কোথাও জানবে না।

জানেন, কত রাত ভেবেছি। লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদেছি। একা বিছানায় শুয়ে, খোকার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছি। তারপর মনস্থির করে ফেলেছি। আমি বেশ বুঝতে পেরেছি, আমার সামনে এখন একটিমাত্র পথ খোলা আছে। কিন্তু উপায় ?

উপায়ের কথা ভাবতেই হঠাৎ আপনার কথা মনে পড়ে গেল। আর আপনার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হওয়ার দৃশ্যটাও চোখের সামনে ভেসে উঠলো—আমি পড়ে রয়েছি ; চারদিকে জল, তারই মধ্যে আপনি আমাকে পরীক্ষা করছেন।

আর চিন্তা করতে হয়নি। রোগের অভিনয় করতে হলো আমাকে। ডাক্তার এলেন। পরীক্ষা করে কিছুই তিনি বুঝতে পারলেন না। তাঁকে বললাম, 'মাথার ভেতর অসহ্য যন্ত্রণা।' ডাক্তার ধরতে পারলেন না। বললেন, 'বড়ো কাউকে দেখান।' আমি বিছানায় গোঙাতে গোঙাতে বললাম, 'আমি বাঁচতে চাই। খোকাকে না-হলে কে দেখবে ?'

যুবরাজ বললেন, 'নিশ্চয় বাঁচবে। এত উতলা হচ্ছো কেন ?'

আমি বললাম, 'আমাকে তুমি কলকাতায় নিয়ে চলো। সেখানকার বড়ো ডাক্তাররা নিশ্চয় আমার রোগ ধরতে পারবে।'

শ্বশুর প্রথমে মত দিতে চাননি। শেষ পর্যন্ত কি ভেবে মত দিলেন। খোকাকে নিয়ে ডাক্তার দেখাবার অছিলায় সেই যে কলকাতায় পালিয়ে এলাম আর যাইনি।

তারপর আমি আর ফিরে যেতে রাজী হইনি। যুবরাজ সঙ্গে ছিলেন। তিনি রাগ করেছিলেন। কোর্টের ভয়ও দেখিয়েছিলেন। আমি আর কিছুতেই ভয় পাই না, ডক্টরসাব্। আমার জন্যে নয়। আমার ছেলেটা। ও যখন বড়ো হয়ে উঠবে আনন্দপুর প্যালেসের একটা ইটও তখন অক্ষত থাকবে না ; থাকলেও এক-এক-জনের ভাগে হয়তো আধখানা করে পড়বে। যুবরাজকেও সেকথা বলেছিলাম। তিনি শুনলেন না। আনন্দপুরের মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকবার জন্যে তিনি ফিরে গেলেন।

জানেন, প্রথমে গায়ে যা গয়না ছিল, তাই বেচে চালাচ্ছিলাম। পরে অনেক কষ্টে আলিপুরের এক বাচ্চাদের ইস্কুলে ইংরিজী শেখাবার চাকরি পেয়েছি। তারা

আমাকে থাকবার একটা ঘরও দিয়েছে।
যুবরাণীর মুখ এবার নীল হয়ে উঠলো। দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললেন, "আনন্দ-পুরের দরজা আমার জন্যে চিরকালের মতো বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাতে দুঃখ নেই। কিন্তু আমার শ্বশুরের লোকরা বদনাম ছড়াচ্ছে। আমি নাকি ঘর ছেড়ে অন্য কিছুর আকর্ষণে পালিয়ে এসেছি। ওরা বলছে, আমি যে নরকে খুশী থাকতে পারি, কিন্তু খোকাকে রাখতে পারি না। ওরা নাকি কেস করে ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে।"
যুবরাণী বললেন, "নিক্। দেখি ওদের কত শক্তি!" তারপর হঠাৎ যুবরাণী কেঁদে ফেললেন। চোখ মুছতে মুছতে বললেন, "আমারও কি ভালো লাগে? আমিও কি কখনো ইস্কুল-মাস্টারি করে সংসার চালাবো ভেবেছিলাম? কিন্তু উপায় নেই যে। খোকাকে আমি কিছুতেই ওদের হাতে ছেড়ে দিতে পারবো না। ও আপনাদের মতো হবে। লেখাপড়া শিখবে, বড়ো হবে, দেশের নামকরা ডাক্তার হবে। কেউ জানবে না, ওর দেহেও রাজরক্ত ছিল।"
শক্তির চোখটাও হঠাৎ ছলছল করে উঠলো। বললে "যুবরাণী, ভগবান আপনাকে শক্তি দেবেন। আপনার ছেলে একদিন সত্যি বড়ো হয়ে উঠবে। ওর হাত দুটো সংসারের আর-সবারই মতো হয়ে উঠবে, যুবরাজের মতো নরম হয়ে থাকবে না।"
যুবরাণী বললেন, "প্লীজ। আমার স্বামীকে যুবরাজ বলেই ডাকবেন। আমি কিন্তু আর যুবরাণী হয়ে থাকতে চাই না। আমি এখন মিসেস্ শকুন্তলা সিং। আর জানেন, "আমার খোকার কী নাম দিয়েছি? ইস্কুলের খাতায় ওর কী নাম লিখিয়েছি?"
আমরা ওঁর মুখের দিকে উৎসুকভাবে তাকিয়ে রইলাম। উনি বললেন, "সামান্য সিং। সামান্য থেকেই ও যেন বড়ো হয়ে উঠতে পারে।"
যুবরাণী উঠে পড়লেন।
আমার মনে হলো, উনি যেন বলে গেলেন, সামান্য হয়ে জন্মে সামান্য রয়ে গেলেও তেমন দুঃখের কিছু থাকে না। কিন্তু অসামান্য হয়ে পৃথিবীতে এসে সামান্য হয়ে শেষ করার মতো ট্রাজেডী আর কিছুই নেই।

এ-সব কতদিন আগেকার কথা। কিন্তু খবরের কাগজে স্কলারশিপ লিস্টে সামান্য সিং এর নামটা আমার চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে। মিসেস্ শকুন্তলা সিংকেও যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। সামান্য একজন শিক্ষিকার ছেলে যেন আমাদের চোখের সামনেই ক্রমশ অসামান্য হয়ে উঠছে।

চেনা-অচেনা

প্রেমেন্দ্র মিত্র
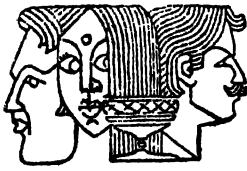
জেসিডির পরেই গাড়ি একেবারে খালি হয়ে গেল। এতটা সুবিধে হবে তারা আশা করেনি।

এতক্ষণ ভীড়ের মধ্যে কথা কওয়া দূরে থাক্, পাশাপাশি বসতেও তেমন পায়নি। গাড়িতে তিলধারণের জায়গা ছিল না। নিজেদের মধ্যেই বন্দোবস্ত ক'রে মেয়েদের তাই একদিকের একটা বেঞ্চি ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। পুরুষেরা বসেছিলেন বাকি বেঞ্চি আর সুটকেশ-ট্রাঙ্কের ওপর—যেখানে যেমন সুবিধে।

চিত্তরঞ্জন থেকেই গাড়ি খালি হতে সুরু করেছিল। তারপর মধুপুরে নামলেন অনেকে। জেসিডিতে তাদের দু'জন বাদে সকলেই মোটঘাট সমেত নেমে গেছেন। সুতরাং পরের স্টেশন পর্যন্ত তো বটেই, ভাগ্য ভালো হ'লে আরো বহুদূর পর্যন্ত নির্ঝঞ্ঝাটে তারা যেতে পারবে।

গাড়ি স্টেশন ছাড়তেই নির্মলা মাথার ঘোমটা আর-একটু তুলে মুখ ফিরিয়ে একটু হাসলো।

বিকাশ যেন এই হাসিটুকুর অপেক্ষাতেই ছিল। বললে—এ-ধারে এসো।

নির্মলা মাথা নিচু ক'রে একটু হেসে বললে—ও-ধারে কেন?

বিকাশ গম্ভীর হবার ভান ক'রে বললে—গাড়ির এ-ধারেই বসতে হয়।

কই, গাড়িতে তো লেখা নেই!—নির্মলা বিস্ময়ের ভান করল।

সব কথা কি লেখা থাকে। বুঝে নিতে হয়।

বা-রে! তুমি এ-ধারে আসতে পারো না বুঝি!—মুখে আপত্তি জানালেও নির্মলা উঠে আসতে দেরি করলে না।

দু'জনে ঘেঁসাঘেঁসি হয়ে বাইরের দিকে মুখ ক'রে বসেছে। খোলা জানলা দিয়ে শীতের দুপুরের ঈষদুষ্ণ মধুর হাওয়া ঝড়ের মত ট্রেনের কামরায় ঢুকে নির্মলাকে একটু ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলছে। গায়ের কাপড় সামলাতে গেলে মাথার চুলগুলো উড়ে-উড়ে মুখে পড়ে, মুখের চুল সরাতে গেলে আঁচল উড়ে এসে চোখ ঢেকে দেয়।

নির্মলার দুরবস্থা দেখে বিকাশ হেসে বললে—জানলা বন্ধ ক'রে দেবো?

ওমা, তাহ'লে দেখবো কী? গাড়ি চ'ড়ে বাইরের কিছু যদি না দেখতে পাই, তাহ'লে লাভ?

কেন? ভেতরে কিছু দেখবার নেই? এর মধ্যেই আমাতে অরুচি ধ'রে গেল?—বিকাশের চোখে কৌতুক।

খুব কথা ঘোরাতে পারো?

তবু মুখটা তো ঘোরাতে পারলাম না।

নির্মলা ফিরে বসলো। বললে—বাবা! এই ঘুরিয়েছি। হয়েছে? আচ্ছা,

তোমার বাইরের সব দেখতে ইচ্ছে করে না ?
কি দেখবো বাইরে ?
কেন ? কি সুন্দর পাহাড় জঙ্গল মাঠ। চাষীদের বাড়ি। আমার কিন্তু ওইরকম বাড়িতে থাকতে বড় ইচ্ছে করে।
বিকাশ হাসলো। বললে—ওই ইচ্ছের কথা শুনে শুনে ট্রেনের কামরাটার বোধহয় অরুচি ধ'রে গেছে।
তার মানে ?—নির্মলা সত্যিই অবাক।
মানে, সবাই একদিন ট্রেনে চ'ড়ে ও-কথা বলে।
তা আমিও নাহয় বললাম। আমি তো আর অসাধারণ কেউ নই যে, শুধু নতুন কথা বলবো।
কিন্তু যা বলো তাই নতুন লাগে।
খুব হয়েছে। থাক্—নির্মলা অভিমানের ভঙ্গিতে মুখ ফেরালে।
কিছুই হয়নি এখনো। বিকাশ চিবুকে হাত দিয়ে নির্মলার মুখটা আবার নিজের দিকে ঘুরিয়ে বললে—আচ্ছা, এইরকম একটা কামরা বরাবর একলা পেলে কিরকম মজা হতো ?
নির্মলা হাসিমুখে বললে—বাবা। সে কত টাকা।
হোক্-না কত টাকা !—বিকাশ বেপরোয়া।—কিন্তু কি সুন্দর হয় ?
কথার পিঠে কথা হিসেবেই নির্মলা বললে—অত টাকা খরচ তাই ব'লে ?
বিকাশ এবার হাসতে লাগলো। হাসতে হাসতেই বললে—তুমি কি ভাবছো, আমি এখুনি রিজার্ভ করতে যাচ্ছি।
না, নির্মলা মোটেই তা ভাবেনি। কথাটা একরকম নিজের অজান্তেই বিকাশকে খুশি করতে বলেছে। বিকাশ যে অমন বেহিসাবী কিছু ক'রে ফেলতে পারে সে-রকম ধারণা করবার মত কিছু সে পেয়েছে কি ? বরং এ বিষয়ে সামান্য—এখনও অতি সামান্য একটু খোঁচ তার মনের মধ্যে আছে।
হাওড়া স্টেশনে ওঠবার সময় যে তাদের মাল বয়ে এনেছিল, তার সঙ্গে বিকাশের ব্যবহারটা ভালো লাগেনি। সামান্য ক'টা পয়সা নিয়ে অতখানি হৈ চৈ, অমন ঝগড়া-ঝাঁটি, অমন কেলেঙ্কারী—হ্যাঁ, একটু কেলেঙ্কারী বই-কি,—তার স্বামী যে করতে পারেন, এ যেন তার কল্পনার বাইরে। ব্যাপারটা বড় বিশ্রী লেগেছিল। এমন কিছু নয় ব'লে উড়িয়ে দিতে চেয়েও সম্পূর্ণ পেরেছে কি ?
লোকটাকে দাঁত খিঁচিয়ে ওঠবার সময় বিকাশের মুখের সেই অস্বাভাবিক অপ্রত্যাশিত বিকৃতি,—সত্যিই সে মনে রাখতে চায় না। আশ্চর্যের কথা, সে-মুখ মনে পড়লে কেমন যেন অহেতুক তার একটা ভয় হয়। এটা অবশ্য তার ছেলেমানুষী ! কিন্তু সত্যিই লোকটাকে ক'টা পয়সা দিলে কি ক্ষতি ছিল ? গোড়ায় কথা দিয়ে শেষে না রাখলে সে তো গোলমাল করবেই।
সামান্য একটা ব্যাপার এমন ক'রে মনে রাখা নিশ্চয় তার অন্যায়। কিন্তু তখন কামরা-ভর্তি লোকের মধ্যে কী লজ্জাই তার করেছিল !
বিশেষ ক'রে এমন একটা দিনে ও-ধরনের ব্যাপার বড় বিসদৃশ। বিয়ে তাদের হয়েছে মাত্র মাস-ছয়েক। কিন্তু বিয়ের পরই বাবার অসুখের জন্যে নির্মলাকে

বাপের বাড়ি থাকতে হয়েছে, আর বিকাশ তার চাকরিস্থল পাটনা ছেড়ে একবারের বেশী দেখা করতে আসতে পারেনি। সুতরাং তারা পরস্পরের কাছে একরকম নতুন বললেই হয়। এই প্রথম সে শুধু স্বামীর সঙ্গে তার কর্মস্থলে যাচ্ছে তা নয়, এতখানি একত্র থাকার সুযোগও পেয়েছে এই প্রথম।

এ যাওয়ার অপূর্ব মাধুর্য ওই তুচ্ছ ঘটনায় কেমন যেন একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

তার স্বামী যে একটু বেশী হিসেবী এটুকু অবশ্য নির্মলা এই পথটুকু আসার মধ্যেই না বুঝে পারেনি। নির্মলা নিজে অন্যরকম আবহাওয়ায় মানুষ। তার বাবা এক জীবনেই বহু পুরুষের অর্জিত সম্পত্তি সদ্ব্যয়ে ও অপব্যয়ে উড়িয়ে দিয়ে প্রায় ফতুর হয়ে এসেছেন। তাদের বাড়িতে পয়সার মূল্য সে অন্যভাবে বুঝতে শিখেছে। তাই বিকাশের ছোটখাট এইসব তার কাছে অদ্ভূত ঠেকে।

পানওয়ালার কাছে একটা অচল সিকি চালিয়ে তার সেই উল্লাস একটু অস্বাভাবিক নয় কি?

বর্ধমান থেকেই ভিড় সুরু হয়েছিল। তার আগে দু'জনে একদিকেই বসেছিল। দু-চারটে কথা বলবার সুযোগও হয়েছিল।

মেমারী থেকে একদল সাঁওতাল মেয়ে-পুরুষ, না জেনেশুনে তাদের কামরায় হুড়মুড় ক'রে উঠে পড়ে। গাড়ি তখন ছাড়ে-ছাড়ে। তাদের কাকুতি-মিনতিতে কেউ আর তাদের নামিয়ে দিতে চেষ্টা করেনি। মেঝের ওপরেই তারা সকলে মিলে কোনরকমে বসেছে।

বর্ধমানে তারা নেমে যাবার আগে নির্মলা বিকাশকে একবার চুপিচুপি বলেছে,—দ্যাখো, ওই সাঁওতাল মেয়ে দুটো আমাদের দেখিয়ে কি বলাবলি করছে!

তোমায় দেখে অবাক হয়েছে বোধহয়!

আহা! আমায় দেখে হবে কেন? তোমায় দেখে হয়েছে। ভাবছে বোধহয় এমন সুন্দর লোকের এমন প্যাঁচার মত বৌ!

ইস্, খুব যে ঠাট্টা শিখেছো!

কিন্তু নির্মলা ঠাট্টা ঠিক করেনি। সে কুৎসিৎ অবশ্য নয়। কিন্তু বিকাশ সত্যিই সুপুরুষ। দশজনের মধ্যে থাকলে তার দিকে একবার চোখ পড়েই! নির্মলা তার তুলনায় নিতান্ত সাধারণ।

নির্মলার তার জন্যে যদি একটু গর্ব থাকে তা দোষের নয় নিশ্চয়।

এমন সুন্দর মুখ হাওড়া স্টেশনে সেই মালবওয়ার মজুরী দেওয়ার ব্যাপারে কি ক'রে অমন কুৎসিত দেখিয়েছিল কে জানে! তার মনে সে-দৃশ্য যে এখনো কাঁটার মত বিঁধে আছে তা বোঝা যাচ্ছে।

বর্ধমান স্টেশনে গাড়ি থামতে সাঁওতালরা নেমে গিয়েছিল বটে, কিন্তু গাড়ি আবার ভর্তি হয়ে গিয়েছিল নতুন যাত্রীর ভিড়ে। তখনই তাদের আলাদা হয়ে বসতে হয়েছে।

ভারী একটা মজার ব্যাপার হয়েছিল সেখানে। ঠিক মজার ব্যাপার বুঝি বলা চলে না। কারণ, সেই প্রথম বিকাশ তার ওপর রাগ করেছে—সত্যিকার রাগ।

নির্মলা যে-ধারে মেয়েদের সঙ্গে বসেছিল, সেই ধারেই প্ল্যাটফর্ম। গাড়ি ছাড়বার একটু আগে বিকাশ বলেছে,—কিছু মিহিদানা সীতাভোগ নিলে হয় না?

নিজেই তারপর বলছে—থাক্‌গে। যত সব বাজে জিনিস।
কিন্তু খানিক বাদে তার কি খেয়াল হয়েছে।—বেশী নয়, পোয়াটাক নেওয়া যাক্‌, কি বলো? দু'জনের ওই যথেষ্ট।
গাড়ির এত লোকের মাঝে নির্মলা কথা না ব'লে ঘাড় নেড়ে সায় দিয়েছে।
অন্যান্য যাত্রীরা তখন নিজেদের সওদা করতে ব্যস্ত। নির্মলার সামনের জানলা থেকেই ফেরীওয়ালাকে ডেকে বিকাশ তার হাতে দামটা দিয়েছে।
বিভ্রাট ঘটেছে তারপর। বিকাশের অসুবিধা দেখে নির্মলা নিজেই হাত বাড়িয়ে ঠোঙাটা নিতে গেছলো। সেইটেই তার বোকামি। দেবার কিংবা ধরবার দোষে ঠোঙাটা আর ভেতরে পৌঁছোয়নি। বাইরে প'ড়ে গিয়ে সব খাবার প্ল্যাটফর্মে ছড়াছড়ি হয়ে গেছে।
ফেললে তো! আশ্চর্য!
শুধু কথাগুলো নয়, গলার স্বর ও মুখের অস্বাভাবিক কাঠিন্যই নির্মলাকে বিমূঢ় ক'রে দিয়েছে। বিকাশ সত্যিই রাগ করেছে তাহ'লে? চেষ্টা করেও সে-রাগ যে সে গোপন করতে পারছে না তা স্পষ্ট বোঝা গেছে।
গেল পয়সাগুলো জলাঞ্জলি! একটু ভালো ক'রে ধরতে হয় না?
গাড়ির অন্যান্য অনেকে বরং সহানুভূতির স্বরে বলেছে—হাত ফস্‌কে অমন যায় মশাই! আফ্‌শোষ ক'রে কি হবে, আবার কিনে নিন।
কিন্তু বিকাশ বিরক্তমুখে ফেরীওয়ালার সঙ্গেই তার অসাবধানতার জন্যে পয়সা ফেরত চেয়ে ঝগড়া করেছে, কেনবার আর নামও করেনি।
এসব ছোটখাটো ব্যাপারকে আমল দেওয়া উচিত নয়। পাছে স্বামীকে সামান্য একটু ছোট ভাবতে হয়, নির্মলা তাই নিজের ওপরই রাগ করেছে। সত্যি, দোষ তো তার নিজেরই। তার বাপের বাড়ির সংসারে সব কিছুই আল্‌গা। সেখানে সে কোনো বিষয়েই সাবধান হতে শেখেনি। নতুন ক'রে নিজেকে তাকে এবার গড়তে হবে স্বামীর সঙ্গে মানিয়ে চলতে।
তাছাড়া এ-সব তুচ্ছ জিনিস ধর্তব্যই নয়। যেখানে তাদের সত্যিকার সম্বন্ধ সেখানে এ-সবের কোনো জায়গাই নেই।
নির্মলা এসব কথা ভাবতে ভাবতেই একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। বিকাশ এবার তাকে নাড়া দিয়ে বললে—কি ভাবছো বলো তো?
নির্মলা হেসে বললে—কিছু না!
বাঃ, কতক্ষণ চুপ ক'রে আছো, জানো? বাড়ির জন্যে মন কেমন করছে?
তা করতে নেই?
নেই কেন? কিন্তু আমাকে কি একেবারে ভুলে যেতে হয়?
হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ায় নির্মলা একটু হেসে ঠাট্টা করলে—আমি ভুলবো কেন? তুমিই বরং মাঝে ভুলে গেছলে!
কখন আবার?
এমনভাবে কথাটা তোলবার ইচ্ছে নির্মলার ছিল না। কিন্তু মুখ দিয়ে একবার যখন বেরিয়ে গেছে, তখন সবটা ব'লে ফেলাই ভালো। হেসে সে বললে—আহা, মনে নেই যেন! জেসিডিতে যারা নেমে গেল গো! তোমার দিকে থেকে থেকে

চাইছিল। নামবার সময়ও পিছু ফিরে ফিরে তাকালে। তুমিও তো তাকাচ্ছিলে—আমি যেন দেখিনি।
বিকাশ হেসে উঠলো।
নির্মলা আবার বললে—বেশ সুন্দরী কিন্তু। তোমার সঙ্গে মানাতো। তবে ভারী বেহায়া!
বিকাশ হেসে বললে—বেহায়া বলছো কেন?
ইস্, বড্ড লাগলো যে! আলাপ করতে ইচ্ছে হচ্ছিল নাকি?
আলাপ?—বিকাশ যেন গম্ভীর হয়ে উঠলো—আলাপ তো ছিল।
একটু থেমে আবার বললে—আর একটু হ'লে ওর সঙ্গে বিয়ে হয়ে যেতো যে?
ওমা! সে কি?—নির্মলা উৎসুক হয়ে বললে—তবে কথা কইলে না যে?
বিকাশ তেমনি গম্ভীরভাবে বললে—কথা আর বলা যায়?
নির্মলার মুখ বুঝি একটু ম্লান। তবু আগ্রহের সঙ্গে সে জিজ্ঞেস করলে—কি হয়েছিল? বলো না গো?
সে বলতে কি ভালো লাগে! বিশেষ করে তোমার কাছে কি উচিত?
না না, খুব উচিত। তুমি বলো।
তখন কলকাতাতেই থাকি।—বিকাশ সুরু করলে,—আমাদের বাড়ির কাছেই থাকতো। মস্ত বড়লোকের একটিমাত্র মেয়ে—বাপের অগাধ সম্পত্তি···
নির্মলা বাধা দিলে—সে-রকম তো সাজপোষাক নয়। সেকেন্ড ক্লাসে যাচ্ছে?
ওইরকম স্বভাব। তাছাড়া এখন আরো ওইরকম হয়ে গেছে। আমার সঙ্গে আলাপ ভারী অদ্ভুতভাবে···বিকাশ দীর্ঘ একটা কাহিনী ব'লে চললো।
শেষের দিকে নিজেই যেন নিজের কাহিনীতে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে মনে হলো।
সে তখন বলছে,—আমি বলেছিলাম, তা হয় না লতা। তুমি ঐশ্বর্য্যের মধ্যে কত সুখে মানুষ হয়েছো, আমার সঙ্গে অত কষ্ট করতে পারবে না। বিশেষ তোমার বাবার যখন অমত।
লতা বলেছিল—বিয়ে হয়ে গেলে বাবার অমত আর থাকবে না। তুমি এত ভীরু?
বলেছিলাম—আমি ভীরু নই লতা। কিন্তু তোমার বাবা মনে করবেন, তাঁর সম্পত্তির লোভে তাঁর একমাত্র মেয়েকে ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। এ আমি সহ্য করতে পারবো না। তুমি যদি গরীবের মেয়ে হতে···
লতা আমায় বাধা দিয়ে বলেছিল—বেশ, বাবার কিছু আমরা স্পর্শ করবো না।
বলেছিলাম—তবু এ হয় না লতা। তুমি আমার জন্যে সব কষ্ট সহ্য করতে রাজী হতে পারো, কিন্তু তোমায় দুঃখ দারিদ্রের মধ্যে রাখতে আমার পৌরুষে বাধবে। আমার নিজের যদি কিছু সম্বল থাকতো!
আমায় দুঃখকষ্টে তোমায় রাখতে হবে না, দাঁড়াও!—ব'লে লতা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গিয়েছিল। তারপর কি করেছিল, জানো? ফিরে এসে একটা বাক্স আমার হাতে দিয়েছিল। রূপোর কাজ-করা বড় একটা বাক্স। কী ভারী সে!
জিজ্ঞেস করেছিলাম—এটা কি লতা?
বলেছিল—এ আমার মার বাক্স। আমায় দিয়ে গেছেন। এ আমার নিজের সম্পত্তি। এতে বাবার এতটুকু অধিকার নেই।

বিমূঢ় হয়ে বলেছিলাম—এ তো আমি নিতে পারবো না লতা। তুমি কি পাগল হয়ে গেছো ?
হইনি, তবে হবো।—উত্তেজিত ভাবে লতা বলেছিল—তুমি যদি রাজী না হও, এক্ষুনি আমি চীৎকার করবো। চীৎকার ক'রে বলবো, তুমি লুকিয়ে এ বাক্স নিয়ে পালাচ্ছিলে।
হতভম্ব হয়ে গিয়েও একটু হেসেছিলাম। তারপর চট্ ক'রে মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেছলো। বলেছিলাম—আচ্ছা, তোমার কথাই মানছি। কিন্তু এমনভাবে তো যাওয়া যায় না। তুমি এখানে একটু দাঁড়াও। আমি গাড়ি ডেকে নিয়ে আসি।
লতা হেসে বলেছিল—কিন্তু দেরী কোরো না বেশী। আমার এ-অবস্থায় বাক্স হাতে দেখলে চাকরবাকর কি ভাববে বুঝতে পারছো ?
পারছি ! দেরী করবো না।—ব'লে বেরিয়ে এসেছিলাম। আর ফিরে যাইনি।
গল্প শেষ ক'রে বিকাশ উত্তেজিতভাবে নির্মলার দিকে ফিরে তাকালে। নির্মলা তখন ম্লান বিবর্ণ মুখে বাইরের দিকে চেয়ে আছে।
না ঈর্ষায়, বেদনায় নয়। বিকাশের গল্প যে আগাগোড়া বানানো, তা সে আরম্ভ হতে না হতেই বুঝতে পেরেছে। কোথায় সে নিদারুণভাবে আঘাত পেয়েছে, তা সে নিজেও ভালো ক'রে বোঝাতে পারবে না, কিন্তু হঠাৎ সমস্ত জীবন যেন তার শূন্য হয়ে গেছে। ট্রেনের এ কামরা যেন বদ্ধ কারাগার। নিঃশ্বাস নেবার জন্যে মুখটা জানলার বাইরে না বার ক'রে রাখলে দম যেন বন্ধ হয়ে যাবে।
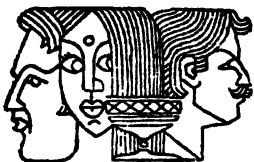
এক প্রহরের খেলা

—গজেন্দ্রকুমার মিত্র

হঠাৎ যেন একটা ধাক্কা খেল অসীম। মনটা যেন সজোরে কে নাড়া দিয়ে গেল। এরকম কখনও বোধ হয়নি ওর। কখনও যে হবে তাও জানা ছিল না। জীবন সম্বন্ধে বেপরোয়া সে চিরদিন। কোথাও কোনখানে শিকড় গাঁথতে দেবে না সে মনকে—এই তার চিরদিনের প্রতিজ্ঞা। সেই কারণেই—খেলা হিসেবে, একটা মজা হিসেবে—কৌতুক করতেই এ কাজে এগিয়েছে সে, নইলে সত্যিই কিন্তু পয়সার এত অভাব তার নেই। সে একটু 'খরচে' বটে, বছরে একমাস পাওনা ছুটিতে বিদেশ ভ্রমণ তার বাঁধা আর তাতে অন্তত হাজারটি টাকা খরচা হয়ই; এ ছাড়াও পুজো ইত্যাদি পর্বে চার-পাঁচটা দিন ছুটি হাতে পেলেই সে বেরিয়ে পড়ে কোথাও না কোথাও, এবং তাতেও বেশ কিছু খরচ হয়ে যায়। কারণ ভ্রমণ করতে বেরিয়ে কার্পণ্য করতে পারে না সে কোনদিনই,—তবু তার আয়ও নিতান্ত মন্দ নয়। বড় সওদাগরী অফিসে কাজ করে, মাইনেও পায় শ' তিনেকের মতো। আরও উন্নতি হ'তে পারে তার অনায়াসেই, একটু দায়িত্বপূর্ণ আর পরিশ্রমের কাজ করতে রাজী হ'লেই তার মাইনে লাফ দিয়ে বেড়ে যেতে পারে—প্রোমোশন তো কয়েকবার সেধেই এসেছে—সে নিজেই ইচ্ছা ক'রে তা নেয়নি। অত ঝঞ্ঝাট-ঝামেলায় যেতে রাজী নয় সে, ওসব তার বরদাস্ত হয় না। ভগবান যখন অল্প বয়সে তার বাবা-মাকে কেড়ে নিয়ে তাকে সকল ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্ত করেছেনই—তখন আর কেন? এমনি হেসে-খেলে—অর্থাৎ যথেষ্ট ঘুমিয়ে, বেড়িয়ে, আড্ডা দিয়ে, ক্রিকেট ম্যাচ দেখে, জলসায় গান শুনে ও মাসে একদিন দু'দিন থিয়েটার-বায়স্কোপ দেখে—জীবনটা কাটিয়ে দেওয়ারই ইচ্ছা তার। ঝঞ্ঝাটের ভয়ে বন্ধু-সংখ্যাই আর সে বাড়ায় না। এমন মুক্ত জীবন—অসংখ্য বন্ধুই তো জোটবার কথা—কিন্তু মনের মতো গুটি পাঁচ-ছয় অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া কাউকে সে আমল দেয় না। থাকে সে একটা মেস্-এ, কিন্তু পৃথক ঘর নিয়ে। আয়তনে ছোট তবু আলাদা; বহুদিন ধরেই এক জায়গায় আছে ব'লে খুব খরচও লাগে না—আর সেইটাই তার নিজস্ব বাড়ীর মতো হয়ে গেছে। সুতরাং যা আয় তাতে বেশ ভালই চলে যায়। আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে আছেন এক দাদা, তিনিও দিল্লীতে বড় চাকরি করেন, সেইখানেই ঘর-বাড়ীও বুঝি করেছেন—কাজেই তাঁকে কোনরকম সাহায্য করার প্রশ্নই ওঠে না। বরং তিনিই এটা-ওটা পাঠান—পুজোয় কাপড়, জামা, স্যুট কতো কি! ভাইপো-ভাইঝিদের জন্মদিনে সামান্য কিছু উপহার পাঠানো ছাড়া তার তরফ থেকে কোন দায়-দায়িত্ব নেই।

সুতরাং নিছক কৌতুকের জন্যই এই অদ্ভুত প্রস্তাবে রাজী হয়েছিল সে।

আর কৌতুকটা জমেও ছিল পুরোপুরি। বেশ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছিল সে। একটু আগেও দামী দেশী ধুতি সিল্কের পাঞ্জাবী প'রে সিগারেট খেতে

খেতে গুনগুন ক'রে গান গাইছিল—তখনও তার মনটা ছিল নির্ভাবনার আকাশে কৌতুকের পাখা মেলে আনন্দের রোদে খেলে বেড়াচ্ছিল আপন মনে।

কিন্তু হঠাৎ এ কী হ'ল ?

বিয়ের সময় ভাল ক'রে চেয়ে দেখেনি সে, কারণ কোন কৌতূহল বোধ করেনি। বিবাহের পর যে বধূর সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক থাকবে না, এমন কি পরে যাকে কোনদিন জনসমাজে 'চিনি' বলেও দাবী করা যাবে না, যার সমাজস্তর থেকে চিরকাল সরে থাকবে ব'লে সে প্রতিশ্রুত, হঠাৎ দেখা হ'লেও আলাপের বা ঘনিষ্টতার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করা চলবে না—সে কেমন দেখতে হ'ল জেনে বা তাকে ভাল ক'রে দেখেই বা লাভ কি ? সে যেমন আছে থাক।

এমন কি, তার সেই স্বল্পসংখ্যক বন্ধু, যাদের এ বিবাহে নিমন্ত্রণ করতে পেরেছিল, তারা যখন ঈর্ষাতুর কণ্ঠে কানের কাছে গুঞ্জন করতে লাগল যে, 'ওঃ! ফার্স্টক্লাস মাল মাইরি ? এমন জিনিস এতকাল ছিল কোথায় ? করলি তো এমন ভাবে—ইস্ !' তখনও সে খুব একটা আগ্রহ বা কৌতূহল বোধ করেনি মন্দিরা সম্বন্ধে, বা তাকে দেখবারও চেষ্টা করেনি।

শুভদৃষ্টির সময় মুখ তুলে তাকাতে হয়—তাকিয়েছেও, কিন্তু সেও তো কেবলি নিয়মরক্ষা, তাতেও ভাল ক'রে দেখা হয়ে ওঠেনি ! শুধু চকিতে একবার, এক লহমার জন্য চোখে চোখ পড়েছিল, আর তখনই, সেই একবার মাত্র মনে হয়েছিল যে, চোখ-দুটি বড় ভাল, শুধু দেখতেই ভাল নয়—বুঝি তাতে এক রকমের ভাষাও আছে, অবোধ মূক পশুর মতো শুধুই ড্যাবডেবে বড় চোখ নয়। কিন্তু ঐ পর্যন্তই, তারপর সে কথাও আর মনে ছিল না।

আজ এখন—এইমাত্র—দৈবক্রমেই চোখটা প'ড়ে গেল। স্ত্রী আচারের অভিনয়টুকু সেরে মহিলারা বিদায় নিতে, দরজাটা বন্ধ ক'রে ফিরে দাঁড়াতেই নজরে পড়ল—খাটের ওপর, তাদের তথাকথিত দাম্পত্য-শয্যার এক প্রান্তে স্তব্ধ হয়ে ব'সে আছে মন্দিরা ; দরজার মাথায় লাগানো ডবল ফ্লোরেসেণ্ট বাতির সবআলোটা গিয়ে পড়েছে ওর মুখে, আর সেই আলোতে আশ্চর্য সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে। মন্দিরা যে এত সুন্দরী, সত্যি সত্যিই এমন অসামান্য রকমের ভাল দেখতে—তা সে কখনও কল্পনাও করেনি। সত্যিকথা বলতে কি, সুশ্রী বা সুন্দরী মেয়ে বলতে এতদিন ওর যা কল্পনা বা অনুমান ছিল—এমন কি তার এই ভবঘুরে জীবনে বহু মেয়ে দেখবার ফলে যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তার কোনটার সঙ্গেই তো মেলে না রূপ !

এ যেন সমস্ত জানাশোনা, সমস্ত কল্পনা স্বপ্নকে অতিক্রম ক'রে গেছে। ইংরেজীতে যাকে বলে 'নিঃশ্বাস কেড়ে নেওয়া রূপ'—এ তাই।

অবশ্য প্রসাধনেরও বাহাদুরী আছে খানিকটা। কিন্তু প্রসাধন তো আরও বহু মেয়েকে করতে দেখেছে সে, রূপসজ্জার বহু বৈচিত্র্যই সে নিত্য দেখতে পায় শহরের পথে-ঘাটে। নববধূর রূপসজ্জার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে অবশ্য, তাতে সাধারণ মেয়েকেও কিছুটা অসাধারণ মেয়ে মনে হয়—কিন্তু নববধূও তো এ পর্যন্ত বিস্তর দেখল সে। রাস্তায় চলতে চলতে চকিতে দেখা নয়—কাছ থেকে বেশ ঘনিষ্ঠ ভাবেই দেখেছে সে, বোধকরি একশোটিরও বেশি, কিন্তু তাতেও ঠিক এমন চমক লাগাবার মতো তো কাউকে মনে হয়নি। রূপসজ্জা বরং অনেককেই মানায় না—

কারুর কারুর ক্ষেত্রে ঈশ্বরদত্ত চেহারাকে বিকৃত ক'রে তোলে, সজ্জা বিদ্রূপ করে রূপকে। এক্ষেত্রে তা নয়—এ যেন রূপ ও সজ্জা পরস্পরকে সহায়তা করেছে, একে অন্যকে প্রদীপ্ত ক'রে তুলেছে। বেনারসী শাড়ীতে, ঝকঝকে পালিস-করা অলঙ্কারে, ফুলের গহনায়, চারুললাটের সুচারু চন্দনলেখায়—যেন এক অনির্বচনীয় মোহের সৃষ্টি করেছে ঐ মেয়েটিকে ঘিরে, সবটা মিলিয়ে ওকে পুরাণের ইন্দ্রাণী ব'লে মনে হচ্ছে!

এই মেয়ে তার বৌ? তার নব-বিবাহিতা স্ত্রী?

হ'লে হ'তে পারত তার জীবন-সঙ্গিনী?

সে কী ঠিক দেখছে?

তার দৃষ্টিতে কোন বিভ্রান্তির ছায়া নামেনি তো? অথবা কোন মূল্যবান নেশা বা স্বপ্নের রঙ?

কিন্তু নেশা তো সে করেনি। করেও না সাধারণত।

আর স্বপ্ন? তাই বা কৈ? সে তো জেগেই আছে যতদূর সম্ভব। তবে?

বোধকরি বিস্ময়বিমূঢ়তা কাটিয়ে ফেল্বার জন্যই, সহজ স্বাভাবিক সুস্থ হবার জন্যই —একটা সংক্ষিপ্ত শিস্ দেওয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু তাতে ওর ঠোঁট দুটোই ঈষৎ সঙ্কুচিত হ'ল শুধু—কোন স্বর বা সুর ফুটল না। বোধহয় সঙ্কোচে ও কিছুটা সম্ভ্রমেই—ওর কণ্ঠ কোনপ্রকার লঘু বাচালতা করতে সাহস করল না।...

বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল অসীমের সেই ধাক্কার ভাবটা কাটিয়ে ফেলতে, তারপর যেন কোনমতে নিজেকে টেনে এনে খাটের পাশেই একটা চেয়ারে বসল সে। আরও একটু প্রকৃতিস্থ হবার চেষ্টায় হাত বাড়িয়ে পাশের তেপায়া থেকে সিগারেটের টিনটা টেনে নিয়ে একটা সিগারেটও ধরাল। কিন্তু সেই সময়ই—দেশলাইয়ের জ্বলন্ত কাঠিটা সিগারেটের সামনে ধরবার সময় লক্ষ্য করল যে, হাতটা অল্প অল্প কাঁপছে।

এ কী লজ্জায়? সঙ্কোচে? ভয়ে?

কিন্তু তার কোনটারই তো কোন কারণ নেই। লজ্জার যদি কোন কারণ থাকেই তো সে অপর পক্ষেই আছে। সঙ্কোচও তাই। তার সঙ্কোচের কি কারণ থাকতে পারে? আইনত-বিবাহিতা স্ত্রীর দিকে ভাল ক'রে চেয়ে দেখার তো তার ষোল আনা অধিকারই আছে—আর চেয়ে দেখারই তো কথা।

ভয়ের তো কোন কথাই ওঠে না।

তবে?

তবে এ কি নিজক হৃদয়াবেগ? ইমোশ্যন?

কিন্তু এ ধরনের ইমোশ্যন জাগতে পারে মনে এমন পরিবেশ বা পূর্ব-ইতিহাসও যে এক্ষেত্রে অনুপস্থিত। মন্দিরার সঙ্গে তার কোন পরিচয় ছিল না কখনও, পূর্বরাগের তো প্রশ্নই ওঠে না। তাকে দেখলই বলতে গেলে এই প্রথম। তা ছাড়া, যার সঙ্গে কোন প্রণয়-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়া তো দূরে থাক, হয়তো আর কখনও দেখাই হবে না, শুধু আজকের রাতটা তারা কোনমতে পরস্পরকে সহ্য করবে বলে প্রতিশ্রুত—তার জন্য কোন হৃদয়াবেগ অনুভব করা কি সম্ভব? শুধু ওরা এক ঘরে থাকবে—এইমাত্র, পাছে পাশাপাশি শুতে অসুবিধা বোধ করে

জামাতা, সেজন্য বিবেচক শ্বশুর একটি ইজি-চেয়ারের ব্যবস্থা করতেও ভোলেন নি। সুতরাং স্পর্শ করার কোন কথাই ওঠে না। আলাপ করারও কোন প্রয়োজন নেই।

তবে?

এই তবেরই কোন উত্তর খুঁজে পায় না—যুক্তির দোরে বৃথা মাথা খুঁড়ে মরে এ নিরুত্তর প্রশ্ন।

অথচ হাত যে কাঁপছে এটাও ঠিক।

মনের মধ্যেও প্রবল একটা আলোড়ন করছে। অননুভূত এক রকমের কাঁপন লেগেছে বুকে।

এ রকম কখনও বোধ করেনি সে এর আগে।

এ কি ক্ষোভ, ঈর্ষা—নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য আত্মগ্লানি? না কি আর কিছু? একেই কি লোভ বলে? তবে কি সে কোন কামনাই অনুভব করছে ঐ রূপসী মেয়েটি সম্বন্ধে? কোন স্থূল দেহজ কামনা?...

কে জানে এ কী!

প্রাণপণে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করে অসীম। নির্বিকার ঔদাসীন্যের সঙ্গেই ব'সে ব'সে সিগারেটে টান নেয়। কিন্তু সেটাও যেন কেমন বিস্বাদ লাগে।... নেশা শুরু করবার প্রথম ক'দিনের কথা বাদ দিলে, এই প্রথম ওর সিগারেট ভাল লাগল না। অত্যন্ত অরুচিকর বোধ হ'ল বস্তুটা। খানিক পরে সেটা য়্যাশ্-ট্রেতে টিপে নিভিয়ে দিয়ে শুধুই স্থির হয়ে ব'সে রইল খানিকটা।

তারপর আর-একবার আড়ে চেয়ে দেখল মন্দিরার দিকে, নিজের স্ত্রীর দিকে।

তেমনই স্থির হয়ে ব'সে আছে সে। পাষাণ-প্রতিমার মতো। হঠাৎ দেখলে সন্দেহ হয় চোখের পল্লবটাও পড়ছে কিনা!

অতিকষ্টে কণ্ঠস্বরটাকে সংযত ক'রে অসীম বলল, 'আ—তুমি শুয়ে পড় না! বেশ আরাম ক'রেই শোও। আমি—আমার এখন ঘুম পায়নি তত। পেলে আমি ঐ ইজিচেয়ারটাতেই শুতে পারব!'

হঠাৎ কথাগুলো ব'লে ফেলে নিজেরই প্রগলভতা ব'লে মনে হ'ল অসীমের। অনভ্যস্ত বাচালতা। ওর পক্ষে একেবারেই অস্বাভাবিক—অপরিচিত স্ত্রীলোকের সঙ্গে যেচে কথা কইতে যাওয়া।

কিন্তু মন্দিরার তরফ থেকে কোন উত্তরও এল না। কথাও কইল না, নড়েও বসল না। শুধু পাষাণ-প্রতিমার মতোই স্থির হয়ে রইল।

এবার একটু বিস্মিত বোধ করল অসীম, একটু কৌতূহলও। আর-একবার তাকিয়ে দেখল ওর দিকে। এবার সোজাসুজিই তাকাল, ভাল ক'রে।

এবং—এই প্রথম ওর সন্দেহ হ'ল যে, ঐ আশ্চর্য সুন্দর মুখে কোথায় যেন একটা বিষাদের ভাব আছে। ঠিক হয়তো বিষণ্ণতা নয়, ঠিক হয়তো কোন দুঃখের অভিব্যক্তিও নয়—কবি যাকে বলেছেন, 'করুণ কোমলতা'—এ যেন তাই। ঐ আপাত-ভাবলেশহীন মুখে, ঐ সম্মুখনিবন্ধ স্থির-দৃষ্টিতে একটা কি আছে, যাতে পুরুষের বুকে সহানুভূতি জাগে, তার মন ওকে আশ্রয় ও প্রশ্রয় দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

অসীমও আর স্থির হয়ে ব'সে থাকতে পারল না। কিসের একটা অস্বস্তি তাকে চঞ্চল ক'রে তুলল।

সে উঠে গিয়ে ওদিকের জানলার কাছে দাঁড়াল একবার! কিন্তু সেটা গলির দিকের জানলা, সামনের বাড়ির খানিকটা দেওয়াল ছাড়া কিছুই দেখা যায় না। বিরক্ত হয়ে আবার ঘরে তেপায়াটার সামনে এসে দাঁড়াল। সিগারেটের টিনটার দিকে হাতও বাড়াল একবার--কিন্তু কিছু পূর্বের অরুচিকর অভিজ্ঞতা মনে প'ড়ে যাওয়ায় আবার সরিয়ে নিল।

কিছুই করবার নেই আর। কিছুই না। শুধু ঐ ইজিচেয়ারে শুয়ে প'ড়ে রাত্রি প্রভাতের প্রতীক্ষা করা ছাড়া।

কিন্তু রাতও তো অনেক বাকী। হাতের নতুন ঘড়িটা দেখে নিল একবার। বারোটা। এখনও পাঁচটি ঘণ্টা কাটাতে হবে এই ঘরে!

তেপায়াটার সামনে দাঁড়িয়েছিল সে। তেমনি দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। বোধকরি একটু অন্যমনস্কই হয়ে পড়েছিল।

তারপর আর-একবার—তেমনি অন্যমনস্ক ভাবেই স্ত্রীর দিকে চেয়ে দেখল। আর— সেই প্রতিমার মতো স্থির সুন্দর মুখে, সেই বিষণ্ণ করুণ অসহায় ব'সে থাকবার ভঙ্গীতে—সেই আশ্চর্য গ্রীবার ওপর এলিয়ে-থাকা বিপুল কবরীতে কী ছিল কে জানে—কিছুতেই আর নিজেকে সামলাতে পারল না অসীম। মন্দিরার কাছে না এসে, কথা না ব'লে থাকতে পারল না।

তেপায়াটার ও-পার দিয়ে ঘুরে একেবারে সামনাসামনি এসে দাঁড়াল।

তারপর যেন একটু স্নেহকোমল কণ্ঠেই বলল, 'ওহো, ওরা বুঝি তোমার ফুলের গহনাগুলো খুলে দিয়ে যায়নি? ওগুলো সুদ্ধ শুতে তো বড় অসুবিধা হবে। খুলে দেব আমি?'

এবারও কোন উত্তর দিল না মন্দিরা, শুধু এইবার ওর মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল অনেকখানি। পাষাণ-প্রতিমায় এই প্রথম যেন প্রাণ-স্পন্দন দেখা দিল।

কিন্তু ওর উত্তরের পরোয়া করল না অসীম। ওর চুপ ক'রে থাকাটাকেই সম্মতির লক্ষণ ব'লে ধ'রে নিল।

আশ্চর্য, হঠাৎ কেমন ক'রে যে এতটা মরীয়া হয়ে উঠল ও, তা যেন নিজেই ভেবে পেল না।

মন্দিরার স্খলিত একখানা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে তারে গাঁথা কঙ্কনটা খুলতে শুরু ক'রে দিল।

তবুও হয়তো গোড়ার দিকে একটু সঙ্কোচ ছিল, ছিল কিছুটা অস্বস্তি। হাতটাও হয়তো কাঁপছিল প্রথমটা, ললাটের কোণে কোণে ঘাম দেখা দিয়েছিল অকারণেই।

কিন্তু সে অল্পকালই। ঐ প্রথমটায়ই শুধু। তারপরই কেমন যেন সহজ হয়ে গেল। যা কিছুক্ষণ পূর্বেও ছিল অসম্ভব, তাই সম্ভব ও স্বাভাবিক হয়ে গেল অনায়াসে।

বালা-তাগা-মুকুট, একে একে সবই খুলে দিল সে।

হয়তো ওপক্ষ থেকে কোন বাধা বা প্রতিবাদ না আসাতেই এতটা সহজ হ'তে পারল ও।

আনত মাথাটা একটু তুলে ধ'রে মুকুটের তারের বাঁধনটা খুলতে খুলতে মুহূর্তের জন্যে একটু বিভ্রান্তিও এসেছিল অসীমের—হঠাৎ কেমন মনে হয়েছিল যে এটা ওর সত্যিকারের বিয়ে, সত্যিকারেরই ফুলশয্যা। খেলাঘরের মিথ্যে বিয়ে নয়, 'প্রভাতের রথচক্ররবে রাত্রি যবে জাগিবে উন্মনা' তখন এই নব-পরিণীতা বধূকে চিরকালের মতো ছেড়ে যেতে হবে না!

অবশ্য সে ভুল ভাঙতেও দেরি হয়নি।

বরং সেই ক্ষণিক মোহের জন্যে লজ্জিতই হয়ে পড়েছিল মনে মনে।

একে একে সব গহনাগুলোই যখন খোলা শেষ হয়ে গেল তখন আর কথার কিছুই রইল না, সামনে থাকারও কোন অজুহাত না।

তখন একটু ক্ষীণকণ্ঠে শুধু একবার বলল, 'মালাটা খুলে ফেলে এবার তুমি ভাল ক'রে শুয়ে পড়, কেমন?'

এর কোন প্রতিবাদ বা ওপক্ষ থেকে কোন সৌজন্য আশা করেছিল কিনা কে জানে, কিন্তু মিনিট-কতক কেমন যেন উৎসুক ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ আর-এক কাণ্ড ক'রে বসল। ওদিক থেকে একখানা চেয়ার টেনে এনে খাটের কাছে, প্রায় মন্দিরার সামনাসামনি ব'সে পড়ল! কেন বসল, কি আশায়—তা ওকে জিজ্ঞাসা করলেও ও বলতে পারত না। না ব'সে পারল না বলেই বসল বোধহয়।

জীবনে প্রথম এই শ্রেণীর আবেগ বোধ করল অসীম। তাই তার সঙ্গে লড়াই করার মতো, সে আবেগকে প্রতিরোধ করার মতো কোন চেষ্টাই করতে পারল না ও। সে রকম কোন সঞ্চয় তো ওর নেই।

মন্দিরা শুয়ে পড়বার উপদেশটা শুনতে পেয়েছিল কিনা বোঝা গেল না। অন্তত শোবার কোন চেষ্টা করল না এটা ঠিক। তাই ব'লে মুখ তুলে তাকালও না অসীমের দিকে! এমন কি ওর এই এত কাছে ব'সে পড়াটা সম্বন্ধে অবহিত বলেও যেন মনে হ'ল না। সে তেমনি কোলের-ওপর-প'ড়ে থাকা দুটি বদ্ধ জোড়া হাতের দিকে চেয়ে ব'সে রইল স্থির হয়ে।

সদ্য-বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী তাদের জীবনের শ্রেষ্ঠতম রাতটিতে—তাদের 'সোহাগ-রাতে'—পরস্পরের অতি নিকটে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে। প্রণয়-রজনীর সমস্ত পরিবেশই প্রস্তুত—অবস্থাও অনুকূল। দুটি হৃদয়েই কাব্য রচিত হবার কথা। অনন্ত এক রোমাঞ্চকর, আবেগ-থরোথরো অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে—প্রথম পরিচয়ের নবীন বিস্ময়ানুভূতির মধ্য দিয়ে, বহু প্রতীক্ষিত প্রণয়ালাপের উন্মত্ততায় বাতাসের মতো উড়ে যাবার কথা—বাকী রাত্রির এই সামান্য সময়টুকু।

কিন্তু এক্ষেত্রে তেমন কিছুই ঘটল না। সময় যেন পা টেনে টেনে চলছে, তার প্রতিটি পদক্ষেপ এদের শুনিয়ে শুনিয়ে। নবদম্পতির একজন পাথরের মত নিঃশব্দে ব'সে আছে। আর-একজন প্রাণপণ চেষ্টা করছে অপরের সম্বন্ধে উদাসীন থাকবার, মনকে কঠিন ক'রে তোলবার। চোখ দুটোকেও সে চেষ্টা করছে অন্যত্র নিবিষ্ট করবার—ঘরের নানাস্থানে, খাটের ছত্রিতে বাঁধা রজনীগন্ধার শীর্ষে, ওধারের দেওয়াল আলমারীতে, বড় ঘড়িটায় মায় তেপায়ার ওপরে সিগারেটের টিনটায়—কিন্তু অবাধ্যমনের প্রেরণায় অথবা নবানুভূত বিস্ময়ের আকর্ষণ আবার ফিরে এসে পড়ছে সামনের জড়ো-হওয়া দুটি হাতে, হাতের ওপরের সুডৌল দুটি বাহুতে এবং

সর্বসমেত সেই বাহুযুগলের অধিকারিণীর আনত সুন্দর মুখে।
অবশেষে অন্যমনস্ক হবার বৃথা চেষ্টা ক'রে বলল, 'তোমার তো ঘুম আসছে না দেখছি, তা এমনভাবে কাঠের পুতুলের মতো চুপ ক'রে ব'সে থেকে লাভ কি···আর হয়তো আমাদের কখনও দেখাই হবে না—এসো না তার চেয়ে একটু আলাপ-পরিচয় ক'রে রাখা যাক্। কী বল? তাতে দোষ আছে কিছু?'
এবারেও কোন উত্তর দিল না মন্দিরা, শুধু ওর মাথাটা যেন আরও একটু নত হয়ে পড়ল সামনের দিকে। কিন্তু অসীমের সন্দেহ হ'ল, হয়তো অকারণেই সে কথা কইছে না, কইতে খুব অনিচ্ছাও নেই তার। আর একটু উৎসাহ পেলেই সে কিছু বলবে। হয়তো সে কিছু বলতেই চায় বরং।···
মানুষের এত অদম্য লোভ হয় অপরকে স্পর্শ করার? ঐ শিথিল দুটি হাতকে নিজের হাতে তুলে নেওয়ার?
এরকম অবস্থা নিজের কখনও কল্পনাও করেনি অসীম।
তবু সে প্রাণপণে নিজেকে সংযতই করল। কণ্ঠস্বরকেও যতটা সম্ভব সহজ ক'রে বলল, 'বাস্তবিক—কী যেন তোমার নাম, মন্দিরা না? তোমার মা ডাকছিলেন টুন্টু ব'লে—দুটোই বেশ ভাল কিন্তু। হ্যাঁ, যা বলছিলুম—বাস্তবিক বলছি মন্দিরা, বিয়ের আগে যদি তোমাকে দেখতুম তাহ'লে তোমার বাবার প্রস্তাবে কিছুতেই রাজী হতুম না। তুমি ভাবছ বড্ড হ্যাংলার মতো কথা হয়ে যাচ্ছে—না? তা হয়তো হবেও। কিন্তু সত্যিই আর তোমাকে ছাড়তে আমার ইচ্ছে করছে না একদম!'
বলতে বলতেই—নিজের মনের মধ্যেই যেন সংযমের বাঁধ কোথায় শিথিল হয়ে এল অসীমের। গলাটা যে কেঁপে গেল তা ঐ অদূরবর্তিনী টের পাক বা না পাক, অসীম নিজে টের পেল। আরও দুর্বলতা প্রকাশ পাবার ভয়ে হঠাৎ চুপ ক'রে গেল, আর মনে মনে নিজেকে ক্রমাগত প্রশ্ন করতে লাগল যে, 'এই সহজ কথাগুলোর মধ্যে এমন দুর্বল হয়ে পড়বার মতো কী আছে? কেন সে এমন দুর্বল হয়ে পড়ছে, ছেলেমানুষের মতো?
বোধকরি মনকে ধমক দিয়েই আবার শক্ত করল একটু। একটু হাসবারও চেষ্টা করল। পরিহাসের ভঙ্গী ক'রে বলল, 'কিন্তু এখনও তো. সময় যায়নি। আচ্ছা, আমি যদি এখন তোমাকে না ছাড়ি, যদি জোর ক'রে রাখি? হাজার হোক আমার বিবাহিতা স্ত্রী তো তুমি এখন। তোমার বাবার সঙ্গে আমার যা চুক্তি তার কোন লেখাপড়াও তো নেই। ষোল আনা এক্তারই আমার আছে এখনও। দ্যাখো—ক্লেম দেব নাকি?'
আবারও হাসল অসীম। জোর করেই হাসল। যেন খুব বড়রকমের একটা রসিকতাই করছে সে। নিতান্ত কৌতুকছলেই কথাগুলো বলছে। কিন্তু তার মুখের হাসি আর অন্তরের ঈর্ষাতুর অনুশোচনার মীমাংসা ঘটবার আগেই আর-এক কাণ্ড ঘটে গেল।
এটার জন্য বিন্দুমাত্র প্রস্তুত ছিল না সে। সুদূরতম কল্পনাও হার মেনে গেল বাস্তবের কাছে।
অসীমের শেষ কথাগুলো ভাল ক'রে শেষ হবার আগেই—তার কণ্ঠস্বরের রেশ ঘরের সেই শব্দহীন আবহাওয়ায় মিলিয়ে যাবার আগেই—সামনের পাষাণ-প্রতিমায় প্রাণ

সঞ্চার হ'ল।
ঘটনাটা কি ঘটছে অসীম সে বিষয়ে অবহিত হবারও সময় পেল না। তার পূর্বেই অকস্মাৎ মন্দিরা খাট থেকে নেমে একেবারে ওর পায়ের কাছে আছড়ে পড়ল যেন, 'তা পারবেন? পারবেন আমাকে ধ'রে রাখতে?...একটু আশ্রয় দেবেন আমাকে? আমি—আমি আপনার স্ত্রীর অধিকার চাই না, শুধু ঝিয়ের মতো আপনার বাড়িতে থাকতে পেলেই খুশী থাকব। দয়া ক'রে আমাকে একটু আশ্রয় দিন আমি যে আর পারছি না!'

অভিনয় বলেই মনে হবার কথা, অতি-নাটকীয় অভিনয়। মেয়েটি সম্বন্ধে এই স্বল্প কিছুক্ষণ ধ'রে যে মোহ সৃষ্টি হয়েছিল মনের মধ্যে তা রূঢ়ভাবে ভেঙে যাওয়াই উচিত—আর সেইরকম একটা প্রতিক্রিয়াই হয়েছিল অসীমের মনে প্রথমটায়। নিদারুণ ঘৃণায় ওষ্ঠটা বিকৃত হয়ে উঠেছিল কিন্তু কথাগুলোর সঙ্গে সঙ্গে যে উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল মেয়েটি তাতে আবার একটু সংশয়ও জাগল মনের মধ্যে।
কান্নাটা বড়ই বুকফাটা, বড়ই স্বতঃস্ফূর্ত ব'লে মনে হচ্ছে!
তা ছাড়া, সুশ্রী তরুণী মেয়েদের সম্বন্ধে কোন হীন ধারণা সহজে কোন পুরুষ করতে চায় না। বরং উলটোটাই স্বাভাবিক। চোখের সামনে খারাপ কিছু করতে দেখলেও সে মনে মনে সেই মেয়ের হয়ে যুক্তি দিতে থাকে—তারা স্বপক্ষে যুক্তি খুঁজে বেড়ায়। অনেক সময় জেনেশুনে আত্মপ্রবঞ্চনা করে।
এক্ষেত্রেও তার অন্যথা হ'ল না। অসীমও পুরুষ, বয়সও তার বেশী নয়। মনের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া মানের দিগন্তে মিলিয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে। অসীম ভীষণ ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'আরে, আরে, এ কী কাণ্ড! ব্যাপার কি বল তো? এই ওঠো—ওঠো—স্থির হও। কথাটা খুলে বল তবে তো বুঝব। শুধু শুধু এমন ক'রে কাঁদে না—ছিঃ! দ্যাখো পাগলের মতো কী করে! ওঠো, ওঠো, লক্ষ্মীটি, চোখ মোছ। এখুনি কে এসে পড়বে। প্লীজ প্লীজ—শান্ত হও।'
কী বলছে আর কী করছে তা তখন অসীমের জানবার বা ভেবে দেখবার কথাও নয়। অসংলগ্ন প্রলাপই বুঝি ব'কে গেল কতকগুলো। কিন্তু মন্দিরাও কি পাগল হয়ে গেল? পাগলের মতোই কাণ্ড-কারখানা বাধিয়ে তুলল যে।
অসীমের পা-দুটোর মধ্যে মুখ গুঁজে সে এমন ভাবেই কাঁদতে লাগল যে, মনে হ'ল বুঝি তার বুকটা ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে। সে বুঝি তার বহুদিনের বেদনা সঞ্চিত রেখেছিল এই ক্ষণটির জন্য—আজ সুযোগ পেয়ে তাই নিঃশেষে ঢেলে দিতে চাইছে। সামান্য অবসর এখনই ফুরিয়ে যাবে—এই বুঝি তার ভয়।
বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল তাকে শান্ত ক'রে উঠিয়ে বসাতে। অনেক কথা বলতে হ'ল অনেক সান্ত্বনা দিতে হ'ল। এসব ব্যাপারে একেবারেই অনভ্যস্ত অসীম—কিন্তু এ এমন একটা সময় যখন মানুষকে হিসেব ক'রে কথা বলতে হয় না, শুনতেও হয় না, এ সময়ের পাকা হিসেব কোন পক্ষই রাখে না।
কিন্তু কথায় মধ্যে শব্দটাই সব নয়। শব্দের পিছনে যে অর্থ থাকে, তা সহানুভূতিই হোক আর বিদ্বেষ হোক—মানুষ ঠিকই বোঝে। অসীমের সস্নেহ প্রশ্রয়টুকু,

ওর সত্যকার সহানুভূতিটুকু ভুল বোঝবার কোন কারণ ছিল না মন্দিরার। বাধা যেটুকু ছিল তা লজ্জার ও সঙ্কোচের—অপরিসীম লজ্জা ও অপরিসীম সঙ্কোচ ঠিকই—তবু তা সেই সহানুভূতি ও প্রশ্রয়ের বাতাসে দূর হ'তে দেরি লাগল না। জোর ক'রে মন্দিরাকে পাশে বসিয়ে একহাতে ওর দুটি হাত চেপে ধ'রে আর একহাতে ওকে বেষ্টন ক'রে—কখনও বা প্রশ্ন ক'রে, কখনও বা নীরব থেকে ওকে সামলাবার অবসর দিয়ে, একে একে ওর সব কথাই জেনে নিল অসীম।
চরম লজ্জা ও নিদারুণ কলঙ্কের ইতিহাস সন্দেহ নেই—কিন্তু সেই সঙ্গে এক সুবিপুল ব্যথা ও নিরতিশয় বেদনার কাহিনীও।
এবার অসীমের পাথর হবার পালা।
পাথরের মতোই স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল সে।

প্রস্তাবটা এনেছিল প্রশান্ত। ওর বহুদিনের বন্ধু।
কিন্তু ঠিক প্রস্তাব বলতে যা বোঝায় সে-ভাবে আনেনি। কথার ছলে কথাটা উঠেছিল। এমনিই, একটা কী প্রসঙ্গে। সে-প্রসঙ্গটা আজ আর মনেও নেই কারুর।
প্রশান্ত শুনেছিল তার এক বন্ধুর কাছ থেকে। সে-বন্ধু আবার শুনেছিল তার মেসোমশাইয়ের মুখে। এমনিভাবে দু-তিন হাত বা দু-তিন মুখ ঘুরে এসেছিল সংবাদটা। প্রশান্তর বন্ধু প্রশান্তর কাছেই প্রস্তাবটা করেছিল। কারণ সেও তখন অনূঢ়। কিন্তু প্রশান্ত সে প্রস্তাবে রাজী হয়নি। রাজী হবার কথাও নয় কোন ভদ্রসন্তানের পক্ষেই।
অসীম বুঝি কী টাকার কথা তুলেছিল। কোথায়—বুঝি কৈলাস মানস যাবার প্রসঙ্গেই। বলেছিল, 'অফিসের আগের দেনা এখনও শোধ হয়নি, এখন আর টাকার কথা তোলা যাবে না। কোথাও আলটপ্‌কা কোন টাকা পেয়ে গেলে চলে যেতুম এখনই।'
তাতে বুঝি শরদিন্দু বলেছিল, 'লটারির টিকিট কাট্ না! রেসের্? অনেক টাকা পেয়ে যাবি।'
'অত টাকার আমার তো দরকার নেই। হাজারখানেক টাকা কোথাও থেকে পেয়ে গেলেই আমি খুশী।'
তাতে কিরীটি বলেছিল, 'রেস খেল তাহ'লে!'
ওকে ধমক দিয়ে উঠেছিল অসীম, 'ভদ্রসমাজে ও কথাটা মুখে আনিস নি কিরীটি, ওর চেয়ে বড় অভিশাপ আর নেই—অন্তত আমাদের দেশে। রেস খেলে বড়লোক হ'তে কাউকে দেখেছিস তুই?…সর্বস্বান্ত হয়ে পথেই বসে শেষ পর্যন্ত। ভয়ঙ্কর নেশা ও, মদের চেয়েও সাংঘাতিক! একেবারে কোন জ্ঞান থাকে না। একমাত্র ছেলের কঠিন অসুখের সময়ও ওষুধের টাকা নিয়ে রেস খেলে—এ আমি চোখে দেখেছি।'
তারপর ঈষৎ সন্দিগ্ধ ভাবে প্রশ্ন করেছিল, 'তুই ওসব ধরেছিস নাকি?'
'পাগল হয়েছিস। তাহ'লে আর আমাকে কারবার ক'রে খেতে হ'ত না! আমি ঠাট্টা করছিলাম।'

ঠিক এই মুখেই বলেছিল প্রশান্ত, 'একটা বিয়ে করবি? দ্যাখ! কোন দায়িত্ব থাকবে না, কোন দায় নয়—বৌ নিয়ে ঘর করতে হবে না, নিজের সমস্ত পথ খোলা থাকবে—শুধু একটি মেয়ের আইবুড়ো নাম খণ্ডে দেওয়া। দ্যাখ, নগদ দু'হাজার টাকা দেবে, এ ছাড়া বরাভরণ ঘড়ি আংটি যা দেবে—কাপড় জামা তো বটেই, সে-সব ফিরিয়ে দিতে হবে না, বিয়ের সমস্ত খরচ তাদের—মায় যদি বৌয়ের দু'একখানা গয়না রেখে দিতে চাস তো, তাও রাখতে পারিস—তারা আপত্তি করবে না!'

কৌতূহলটা অবশ্য হয়েছিল সকলেরই, 'কী রকম, কী রকম?' একসঙ্গে প্রশ্ন ক'রে উঠেছিল সবাই।

প্রশান্ত যতটা জানত, যা জানত, তা-ই বলেছিল।

এক ধনী-কন্যা ফেঁসে গেছে বুঝি। সে ফাঁস থেকে মুক্তি পাবার গোপনপন্থা যা কিছু আছে সবই চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু সে ফাঁদ খোলেনি। প্রকাশ্য কিছু করা তো সম্ভব নয়—তাই কন্যার পিতা এই করতে চান। কোন সম্বংশের শিক্ষিত ছেলে যদি তিনটি রাত্রির সামান্য অনুষ্ঠানে রাজী থাকে তো তিনি তাকে ঐ টাকা ও ঐসব জিনিস দেবেন। মাত্র ঐ তিনদিনের অনুষ্ঠানই—তারপর আর পাত্রের কোন দায়-দায়িত্ব থাকবে না। বৎসরখানেক পরে তিনিই বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যবস্থা ক'রে বরকে মুক্তি দিয়ে দেবেন।

কিরীটি প্রশ্ন করেছিল, 'কেউ যদি একেবারেই নিয়ে নেয়, সব জেনেশুনেই?'

'না, তা তিনি দিতে রাজী নন—মানে মেয়ের বাবা।'

'কেন?' প্রায় সমস্বরেই প্রশ্ন ক'রে উঠেছিল সকলে, 'কেন, যদি সৎপাত্রই কেউ রাজী হয়?'

'কেন তা ঠিক জানি না। জিজ্ঞাসা করিনি। তবে মেয়েটি শুনেছি খুব সুন্দরী, মেয়ের বাবারও যতদূর মনে হয় পয়সাকড়ি বেশ আছে। তিনি বোধহয় মেয়ের সম্বন্ধে উচ্চাশা পোষণ করেন।'

কথাটা ঠাট্টাচ্ছলেই বলেছিল প্রশান্ত।

অলস আড্ডার উপযুক্ত রসদ হিসেবেই! এ প্রস্তাবে যে কেউ রাজী হবে, এ ছিল তার স্বপ্নেরও অগোচর। কিন্তু সকলকে স্তম্ভিত ক'রে দিয়ে অসীম ব'লে উঠল, 'লাগা, আমি রাজি আছি।'

'সে কি রে! কী বলছিস যা-তা!'

'ঠিকই বলছি। আমার কী—আমারই তো সুবিধে! মা-বাপ নেই যে রাজী করাতে হবে, দাদা থাকেন বহুদূরে—দিল্লী হনোজ দূরস্ত! তিনি টেরও পাবেন না। আমার আর ভয়টা কি? তাছাড়া ব্যাপারও তো মোটে তিন-চারদিনের!... মোদ্দা তারপর ঠিক ঘাড় থেকে নেমে যাবে তো? ঘাড়ে চেপে থাকতে চাইবে না বরাবরের জন্যে? কিম্বা খোরপোশ আদায়ের চেষ্টা করবে না?...লিখে-প'ড়ে দেবে কিছু?'

'তা জানি না। এসব যে জানবার প্রয়োজন হবে তা তো আর ভাবিনি।'

'তুই খবর নে। এমন সুযোগ ছাড়ছি না। ডিভোর্স না হ'লেও ক্ষতি নেই। আমি কোন সত্যিকারের বিয়ে করতে যাচ্ছিও না, তার কথাও নেই। শুধু আমার ওপর কোন জুলুম না হয় এর পরে—এইটুকু দেখিস।'

দৃঢ় কণ্ঠেই বলে অসীম। তবু এটা যে ওর তামাশা নয় তা বুঝতে কিছু বিলম্ব হয়েছিল বৈকি! নিরস্ত করবারও চেষ্টা করেছিল সকলে কিন্তু অসীমের তখন জিদ চেপে গেছে। সে বললে, 'দূর্! জীবনে তো কোন অ্যাড্ভেঞ্চার হ'ল না, এইটেয় না হয় হোক। মন্দই বা কি? এক ভদ্রলোকের বিপদ উদ্ধার হবে, আমারও পকেটে কিছু আসবে—এমন সুযোগ ছাড়ব কেন? তোদের মধ্যে আমারই সুবিধে বেশী, কথাটা জানাজানি হয়ে পড়লেও এমন কোন ক্ষতি হবে না আমার। তবে ঐ একটা পয়েন্ট আমার—বেরিয়ে আসার পথটা খোলা থাকা চাই, অভিমন্যুর মতো চক্রব্যূহের প্যাঁচে পড়তে রাজী নই আমি। একজনের ফাঁস খুলতে গিয়ে আমি না একেবারে নাগপাশে জড়িয়ে পড়ি।'

অগত্যা প্রশান্তকে কথাবার্তা চালাতে হ'ল। বন্ধুকে ধ'রে, তার মেসোমশাইকে ধ'রে মেয়ের বাবার কাছে পেঁছিল।

পাত্রের মোটামুটি সামাজিক ও আর্থিক যোগ্যতার বিবরণ শুনে ঘোষালমশাই লাফিয়ে উঠলেন। হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পেলেন যেন।

শর্ত—প্রশান্ত যা শুনেছিল তা সবই ঘোষালমশাই স্বীকার করলেন। কেবল লেখাপড়ার মধ্যে যেতে রাজী হলেন না। তার বদলে তাঁর জন-দুই সম্ভ্রান্ত বন্ধুকে দিয়ে জামিন দেওয়ালেন। তাঁদেরকে অসীমও চিনত—অন্তত নামে খুবই সম্ভ্রান্ত লোক তাঁরা—সুতরাং সে আর পীড়াপীড়ি করল না।

বিবাহের সব ব্যবস্থাই ঘোষালমশাই করবেন কথা ছিল। তিনিই করলেন। পাত্র মজঃফরপুরে থাকে, হঠাৎ বিয়ে ঠিক হ'তে চার-পাঁচটি বন্ধু নিয়ে চলে এসেছে, এই কথা রটনা ক'রে তিনি যেমন বরযাত্রীর সংখ্যাল্পতা ঢেকে নিলেন তেমনি তাঁর বাড়িতেই ফুলশয্যা হওয়ার কৈফিয়তটাও দিতে পারলেন। তিনিও অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছাড়া আর কাউকে বলেননি—ঐ হঠাৎ বিয়ে ঠিক হওয়ার অজুহাতে সে দায়ও এড়িয়ে গেলেন।

এ পর্যন্ত নির্বিঘ্নেই কেটেছিল। নগদ টাকা আগেই দিয়েছিলেন ঘোষালমশাই, সেটা ব্যাঙ্কে জমা আছে। বাকী এই বরাভরণের ঘড়ি বোতাম আংটি ফাউন্টেন-পেন ইত্যাদি স্যুটকেশে ভ'রে নিয়ে ভোরবেলা গিয়ে নিজের মেসে ঢুকবে—এই ঠিক আছে। এমন সে হামেশাই বিদেশে যায় দু-চারদিনের জন্য, কাজেই কেউ সন্দেহমাত্র করবে না। বিয়ের নবলব্ধ জিনিসগুলো দু-চারদিন পরে একে একে ওরই কেনা জিনিস ব'লে চালাতে পারবে। কাপড়-জামাগুলো পরে সুবিধামতো একসময় ও'রা পেঁছে দেবেন প্রশান্তর বাসায়—সেগুলো সুবিধে হয় ব্যবহার করবে নয় কাউকে দান করবে।

অর্থাৎ এই ক'টি ঘণ্টা কেটে গেলেই সে আবার মুক্ত, নিশ্চিন্ত। এটা নিতান্তই অভিনয়, সে অভিনয়ের মজুরীও আগাম মিলে গেছে—এখানকার সঙ্গে, এই মেয়েটির সঙ্গে কোন সম্পর্ক অতঃপর তার আর থাকবে না। এটা একটা স্বপ্নের মতোই একদিন মনে হবে, কৌতুকাবহ স্বপ্নের মতো। কোনও স্মৃতিও থাকবে না হয়তো, বরাভরণের জিনিসগুলো বেচে দিলে সেদিক দিয়েও নিশ্চিন্ত।

কিন্তু নাটকের একেবারে শেষ অঙ্কে এ কী হ'ল?

এর জন্য তো সে প্রস্তুত ছিল না। এ-রকম মহড়াও তো দেওয়া ছিল না তার।
মেয়েটির পদস্খলন হয়েছে—অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে—তার লজ্জা ঢাকবার জন্যই এই ব্যবস্থা। হয়তো কোন হীন অন্ত্যজ লোকের দ্বারাই এ কাণ্ড হয়েছে যার সঙ্গে সামাজিক বিবাহ দেওয়াও অসম্ভব—এ-ই ভেবেছিল অসীম। হয়তো ঠাকুর বা চাকর—কিংবা আরও নিম্নস্তরের কেউ। এমন তো হামেশাই হয় আজকাল। এ-রকম প্রত্যক্ষ কতকগুলো ঘটনার খবরও সে রাখে।
এই ভেবেই নিশ্চিন্ত ছিল সে। অত মাথাও ঘামায়নি।
কিন্তু এখন এ কী শুনল!
যা শুনল তার জন্য কোন প্রস্তুতি ওর মনের মধ্যে কোথাও ছিল না। এমন কখনও ভাবেও নি সে। একেবারেই অপ্রত্যাশিত।
ওর বেপরোয়া ছন্নছাড়া মনও এই ইতিহাস শুনে ঘৃণায় শিউরে উঠল।
ঘোষালমশাইয়ের আয়ের থেকে ব্যয় কিছুদিন ধরেই বেশী চলছিল। একটু চাল দেখিয়ে চলতে ভালবাসেন তিনি। অফিসে মাইনে পেতেন মোটা টাকা কিন্তু তার চেয়েও বেশী খরচ হয়ে যেত তাঁর। এরই সমতা রক্ষা করতে তিনি প্রথম ফাটকা খেলা ধরেন। সাবধানে খেলে তাতে পেয়েও ছিলেন দু'পয়সা। সে-ই আরও কাল হ'ল। সতর্কতাটা আর রইল না, চালটাও গেল বেড়ে। ফলে একদা আসন্ন জেল বাঁচাতে অফিসের টাকা ভাঙতে হ'ল। তারপর একদিন সেটাও সামনে এসে দাঁড়াল প্রত্যাসন্ন সর্বনাশের চেহারা নিয়ে। তখন আর বিক্রী করার বাঁধা দেওয়ার মতো কিছুই এমন ছিল না যা দিয়ে ঐ বিপুল অঙ্কের ভগ্নাংশও শোধ হয়। সর্বস্ব বিক্রী করলে হয়তো হ'ত কিন্তু যথার্থ ইজ্জতের চেয়ে বাইরের লোক-দেখানো ইজ্জৎটাই বড় হ'ল। সে সব বাহ্যিক চাল বজায় রেখে আর যা করা সম্ভব তিনি তাই করলেন—সতেরো বছরের অপূর্ব সুন্দরী কন্যাটিকে কাজে লাগালেন।
তারপর থেকে আর রেহাই নেই মন্দিরার। তার পিতার বহু ধনী বন্ধুর সঙ্গেই তাকে 'বেড়াতে' যেতে হয়েছে বারবার। তাতে মোটা টাকা আসে। ঘোষালমশায়ের দেনা শোধ হয়েছে, চাকরী যাবার ভয় গেছে—জীবনের বহু বিলাস-বাসনা চরিতার্থ করতে পেরেছেন তিনি।
হঠাৎ এই বিপদে না পড়লে কোন হাঙ্গামাই হ'ত না।
যতদূর যা চেষ্টা করবার তা করেছেন। যিনি প্রধানত এর জন্য দায়ী—তিনি খুবই অবস্থাপন্ন ও সম্ভ্রান্ত লোক। যে দু'জন ঘোষালমশাইয়ের শর্ত রক্ষার জন্য জামিন হয়েছিলেন—তাদেরই একজন তিনি। তিনিও বহু চেষ্টা করেছেন। এরপর ডাক্তারদের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। কিন্তু তাঁদের যেসব ডাক্তারের সঙ্গে কারবার—তাঁরা কেউই এ-কাজ করতে রাজী হয়নি। অন্যত্র যেতেও ভরসা হয়নি—লোক-জানাজানি থানা-পুলিশ হবার ভয়ে।
অগত্যা এই ব্যবস্থা করতে হয়েছে ঘোষালমশাইকে।
একেবারে বিয়ে দেওয়াও চলত বৈকি। টাকার জোরে সবই সম্ভব হ'ত কিন্তু ঘোষালমশাই তাতে রাজী নন। যে রাজহংসী সোনার ডিম পাড়ে সে হাতছাড়া হ'লে তাঁর দিন চলবে কিসে? বিশেষত রিটায়ার হবার সময় আসন্ন। সুতরাং আইনমত একটা বিবাহ হবে আর সে পাত্র কোনরকম দাবী-দাওয়া না রেখে চলে

যাবে—সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না, এই রকম ব্যবস্থাই করতে চেয়েছিলেন তিনি।
দৈব অনুকূল, স্রেফ খেয়ালের বশেই অসীম রাজী হয়ে গেল। এমন সুপাত্র পাবেন তিনি, কখনও আশাও করেননি ঘোষালমশাই। একেবারে যারা অন্তরঙ্গ তাদের কাছে তো মাথা তুলে পরিচয় দিতে পারবেন। যে সন্তান আসছে তারও একটা ভাল রকম পিতৃ-পরিচয় পাওয়া গেল।

থেমে থেমে, কান্নায়-বুজে-আসা গলায়—কখনও বা অসীমের প্রশ্নের উত্তরেই—একটু একটু ক'রে এই চরম লজ্জা ও অপমানের কাহিনী বিবৃত করল মন্দিরা। তারপর আর-একবার উচ্ছ্বসিত প্রবল কান্নায় ভেঙে পড়ল।
'আমাকে বাঁচান—আমি আর পারছি না! আমাকে স্ত্রী ব'লে গ্রহণ করা সম্ভব নয় তা আমি জানি, কোনদিন তা আশাও করব না। আপনি আবার বিবাহ ক'রে, সত্যকার বিবাহ ক'রে সুখী হোন—শুধু আমাকে এই অপমান থেকে বাঁচান। আপনার বাড়ি আমি দাসীবৃত্তি করতে পারলেও সুখী হ'বো।
অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থাকল অসীম।
অনেকক্ষণ—, মন্দিরার মনে হ'ল এক যুগ।
তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'তোমার কোন ভয় নেই মন্দিরা, আমি যেমন ক'রে হোক্ এখান থেকে তোমাকে নিয়ে যাবই। খেলার ছলেই হোক আর যাই হোক, নারায়ণ সাক্ষী ক'রে তোমাকে গ্রহণ করেছি যখন—তখন দায়িত্ব একটা আছেই। তুমি স্বেচ্ছায় চলে যেতে আলাদা কথা। তোমার বাবাকে কথা দেওয়া আছে বটে—কিন্তু এখন তোমার অসৎ বাপের সঙ্গে অসৎ চুক্তির থেকে এই অনুষ্ঠানের মর্যাদাই আমার কাছে বড়।'
অসীমের একটা হাত তেমনি বেষ্টন করাই রইল মন্দিরাকে, আর একটা হাতে ধরা রইল দুটি কোমল স্বেদার্দ্র হাত—নিঃশব্দে ব'সে কেটে গেল রাত্রির বাকী দুটি অবশিষ্ট ঘণ্টা। মন্দিরার দুই চোখ দিয়ে অবিরল ধারে জল গড়িয়ে পড়তেই লাগল কিন্তু বৃথা আর কোন মৌখিক সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল না অসীম।
এর পরের ইতিহাস তো খুবই সংক্ষিপ্ত।
পরের দিন ভোরবেলা চলে এসেছিল অসীম ঠিকই। কিন্তু সে শুধু উঠে পড়ে লেগে গেল একটা ফ্ল্যাট ঠিক করার জন্যই। ছোট্ট একটা ফ্ল্যাট, সেই সুদূরে বৈষ্ণবঘাটার কাছে কোথায় যেন, তবু তা পৃথক ফ্ল্যাটই। ফ্ল্যাটে দখল নিয়ে সামান্য সামান্য কিছু আসবাব কিনে ঘর সাজিয়ে বৌকে নিতে গেল অসীম।
ঘোষালমশাই প্রথমে বিস্মিত তারপর মহা বিরক্ত হয়ে উঠলেন। চুক্তিভঙ্গটা যে এ-পক্ষ থেকে হ'তে পারে তা তিনি স্বপ্নেও কল্পনা করেননি। জোচ্চোর বদমাইশ বলে গাল দিলেন—তারপর দারোয়ান দিয়ে গলাধাক্কা দিইয়ে তাড়িয়ে দিলেন।
সঙ্গে সাক্ষী নিয়ে গিয়েছিল দু'জন—অসীম সেইদিনই নালিশ ক'রে দিল। বেআইনী ভাবে স্ত্রীকে আটক রাখার অভিযোগ। ঘোষালমশাইয়ের দেওয়া টাকাতেই ভাল উকীল রাখল সে। তদ্বির-তদারকেরও অভাব হ'ল না। বন্ধুদের সকলকে

সব কথা খুলে বলেনি সে অবশ্যই কিন্তু এতদিন পরে ওর ঘর-সংসারে মতি হয়েছে তাতেই তারা খুশী, তাছাড়া এ একটা মজাও বটে। তারাও মেতে উঠল এ মোকদ্দমায়।

ও-পক্ষেও অবশ্য টাকার অভাব হ'ল না।

কারণ প্রথমত শিকার হাতছাড়া হয়—দ্বিতীয়ত কেলেঙ্কারীর ভয়।

গোপনে মোটা টাকারও 'অফার' এল। কিন্তু অসীম তা নিল না। তবে আশ্বাস দিয়ে দিল যে, ও-পক্ষ যদি আসল কথা ফাঁস না করে সে-ও করবে না। কারণ ও ঘৃণিত কথা প্রকাশ ক'রে কোন লাভ নেই তারও।

ঘোষালমশাই যুক্তি দিলেন অসীম কায়স্থ, জাত ভাঁড়িয়ে বিয়ে করেছে। বিদেশ থেকে এসেছি বলেছে—অনেক মিথ্যেকথাও বলেছে সে, সেইজন্যই তিনি মেয়ে পাঠাতে চান না। অসবর্ণ বিবাহ তাঁদের বংশে কখনও হয়নি—ও-বিবাহ তাঁরা স্বীকার করেন না—ওটা তাঁরা মানিয়ে নিতে রাজী নন।

অসীম তার উত্তরে আদালতে একটি চিরকুট দাখিল করল। ওর জামা-জুতোর মাপের জন্য তিনি লোক পাঠিয়েছিলেন—এক লাইন লিখে। সে হাতের লেখা ঘোষালমশাইয়ের, এবং তার ওপর নাম-ঠিকানাটাও লেখা তাঁরই। সে-নামের সঙ্গে পদবীও যুক্ত আছে—অসীম বসু।

সুতরাং সে আপত্তি টিকল না।

আদালত মন্দিরাকেও প্রশ্ন করলেন, সে স্বামীর ঘরে যেতে চায় কিনা। সে সাগ্রহে জানাল যে চায়।

অগত্যা ঘোষালমশাইকে সুবর্ণডিম্বপ্রসবকারিণী রাজহংসীর মায়া ছাড়তে হ'ল।

তিনি দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'দেখে নেব'।

অসীম স্থির নির্মল দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে জবাব দিল, 'তাহ'লে আমিও দেখে নেব। তোমাকে আর তোমার ঐ লম্পট বন্ধুদেরও। বরং তাদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে দেখো—তারা কি বলে।'

ফ্ল্যাটে এসে উঠল মন্দিরা। বিজয়গর্বেই এল বলতে হবে।

তার ঘর, তার সংসার।

তার স্বামীর ঘর।

তার যেন বিশ্বাসই হ'তে চায় না কিছুতে।

সবটা অবিশ্বাস্য, অবাস্তব।

বন্ধুরা এনেছে ঘর-সংসারের খুঁটি-নাটি জিনিস।

সেদিকে দেখিয়ে বলল অসীম, 'ঘর-সংসারের কাজ কিছু জানো—মানে ঠিকে-ঝিতে চলবে? না কমবাইন্‌ড্‌ হ্যাণ্ড রাখতে হবে? রান্না? রান্নার কাজ কিছু জান?'

মাথা হেঁট করেই ছিল মন্দিরা। সেইভাবেই বললে, 'ঝি-ও চাই না। সব কাজই আমি করব।'

'না, না, অতটা দরকার নেই। ঠিকে-ঝি ঠিক ক'রেই রেখেছি। মানে, মাইনেটা আপাতত খুব পর্যাপ্ত নয় কিনা। তবে ভেবো না, সে আমি বাড়িয়ে নেব

শিগ্‌গিরই। একটু চেপে কাজ করলেই হবে।'
কথাটা হচ্ছিল ওদের শোবার ঘরে। দুটি ঘরের ফ্ল্যাট—বাইরে কিরীটি, প্রশান্তর দল হৈ-হৈ করছে—সুতরাং শোবার ঘর ছাড়া ওর যাবার জায়গাই বা কৈ?
কিন্তু এ-ঘরে ঢুকেই পাথর হয়ে গিয়েছিল মন্দিরা।
একটিমাত্র শয্যা, দু'জনের উপযোগী অবশ্য, কিন্তু একই খাটে।
শুভ্র সুন্দর শয্যা—আনকোরা নতুন। ছত্রিতে ছত্রিতে রজনীগন্ধার শীষ বাঁধা। পাশের তেপায়াতে একজোড়া জুঁইয়ের গোড়ে—
একখানা টেলিগ্রাম হাতে ক'রে এসেছিল এ-ঘরে অসীম। এতক্ষণে সেটা মনে পড়ল বুঝি। বলল, 'দাদা-বৌদি ওধারে মামলা মারফৎ খবর পেয়ে খুব রাগ করেছিলেন, তাঁদের না জানিয়ে বিয়ে করার জন্যে। কিন্তু দেখছি এখন রাগটা কিছু পড়েছে। টেলিগ্রাম করেছেন তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যে। চল ঘুরে আসি এইবেলা। এখনও হাতে কিছু আছে।'
'কিন্তু—' ভয়ার্ত হরিণীর মতো এবার মুখ তুলে চায় মন্দিরা, 'কিন্তু সত্যিই কি আপনি আমাকে স্ত্রী ব'লে গ্রহণ করতে চান?'
'ওমা, তবে এত কাণ্ড করলুম কেন? বা রে! তুমি কি ভেবেছিলে সবই তামাশা!'
'কিন্তু, আমি যে লজ্জায় মরে যাবো অহরহ।...প্রতি মুহূর্তে আমার অপরাধ আমাকে বিড়ম্বিত করবে!'
'ছিঃ! কে বলেছে তোমার অপরাধ। পরের অপরাধের বোঝা তুমি বইতে যাবে কেন? ও-সব ভুলে যাও! আজ থেকে তোমার নতুন জীবন শুরু হ'ল!'
'কিন্তু অপরাধের প্রমাণ যে আমার সঙ্গে—আমার দেহেই রয়েছে। ওকে নিয়ে কী করব?'
'কী আর করবে। দিল্লী থেকে ফিরে এসে শিশুমঙ্গলে কার্ড করাতে হবে—আর অন্য সব ব্যবস্থা, সে হয়ে যাবে এখন। সে তুমি কিছু ভেবো না!'
এত দুঃখের মধ্যেও হাসি পায় যেন ওর কথা শুনে!
তবু সে ব্যাকুলভাবে বলতে যায়, 'আপনি বুঝতে পারছেন না কেন কিছুতেই—'
বাধা দিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বলল অসীম 'তুমি বুঝতে পারছ না মন্দিরা, আমি যখন তোমাকে ঘরে এনেছি, সব দায়িত্ব নিয়েই এনেছি। আমারও সন্তান, এটা বোঝ না কেন? তোমাকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না। এখন পারো তো একটু চা করো লক্ষ্মীটি! আর ওদের কিছু মিষ্টি—মিষ্টি বোধহয় আনানোই আছে কোথাও।'
সে ওর গালে একটা ছোট্ট টোকা দিয়ে এ-ঘরে চলে এল।—আর কোন বাদানুবাদের অবসর না দিয়েই।
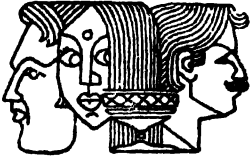
'নোটেগাছটি মুড়ুলো'

—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

প্রথম থেকেই তার স্বভাবটা ছিল বিসদৃশ। রক্ষণশীল বাঙালী পরিবারের ছেলে হয়েও তার উড়ু-উড়ু মন পক্ষবিস্তার করত সাত-সাগরের ওপারে। তার বিজাতীয় মনের পরিধি দেখে আত্মীয়-স্বজনরা হতবাক হ'ত বটে; কিন্তু বিশেষজ্ঞরা জানেন, এ-শ্রেণীর মন এদেশে পাওয়া যায় যথা-তথা। তবে আগে এরা ছিল দলে ভারি, দল এখন ঢের হালকা।

বাপের দেওয়া নাম 'গোবিন্দ'কে বাতিল ক'রে সে নিজেই নিজের নাম রেখেছিল—তরুণ। বাপ যখন ধমক দিয়ে তার জন্যে একটি করুণা নামধারিণী দ্বাদশবর্ষীয়া শ্যামাঙ্গী লজ্জাবতীকে ঘরে এনে তুললেন, তখন মনে মনে হাড়ে-হাড়ে জ্ব'লে গিয়েও সে মৌখিক প্রতিবাদ করতে ভরসা পেলে না, কারণ সে রীতিমত ভয় করত পিতার কঠোর ব্যক্তিত্বকে।

কিন্তু তারপর হপ্তাদুয়েক পার হ'তে না হ'তেই জানা গেল যে, বাপের কয়েক হাজার টাকার সঙ্গে গোবিন্দ তথা তরুণের আর কোনো পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। কিছুকাল পরে সে বিলাত থেকে চিঠি লিখে বাবাকে কেবল জানালে যে—'আমি ব্যারিষ্টারী পড়বার জন্যে লণ্ডনে এসেছি।' সেই-ই তার প্রথম ও শেষ পত্র তারপর সে নিজের পরিবারের সঙ্গে সকল সম্পর্ক তুলে দিলে।

ব্যারিষ্টারী পড়তে পড়তেই আরো কোন কোন উগ্র ইঙ্গবঙ্গের মত সেও এক শ্বেতাঙ্গিনীর প্রেমে প'ড়ে গেল এবং তার ফলে বোকামির চূড়ান্ত—অর্থাৎ উদ্বাহবন্ধন। কিন্তু বন্ধনটা যে সুদৃঢ় ছিল না তার প্রমাণ মিলল সে ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর তরুণ দেশে ফিরে—'প্র্যাকটিস' সুরু করতে চায়, কিন্তু শ্রীমতী শ্বেতাঙ্গিনী স্বদেশ ছাড়তে একান্ত নারাজ। বাংলার মাটি মাড়াবার জন্যে তরুণেরও কিছুমাত্র উৎসাহ ছিল না—কিন্তু উপায় নেই। বিলাতের চেয়ে কলকাতার বার-লাইব্রেরিতে ব'সেই যে রূপচাঁদ-পক্ষীকে বন্দী করা সহজ হবে এটা সে আন্দাজ করতে পেরেছিল। সুতরাং সুন্দর সাদা চামড়ার মোহে উপবাস করতে রাজী হ'ল না। এই নিয়ে প্রথম তর্কাতর্কি ও ঝগড়াঝাটি, তারপর বিবাহ-বিচ্ছেদ।

তারপর মিঃ তরুণ রয় ব্যারিষ্টার-অ্যাট-ল আবার বঙ্গদেশ প্রত্যাগমন করলেন বটে, কিন্তু নিজের গ্রাম ও পিতৃগৃহের কথা মনেও ঠাঁই দিলেন না, সোজা উঠলেন গিয়ে পার্ক স্ট্রীটের এক ফ্ল্যাট-বাড়ীতে।

আর করুণাবালা ? রং ফরসা নয় ব'লে তরুণ তার দিকে আগে ভালো ক'রে তাকিয়েও দেখেনি। মনে পড়ে না তার ঘোমটায় মোড়কে ঢাকা মুখখানাও। করুণার অস্তিত্ব সে ভুলেই গিয়েছে।
সাঙ্গ হ'ল গৌরচন্দ্রিকা। এইবারে গল্প সুরু। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের কিছুকাল পরে তরুণের পসার তখন জ'মে উঠেছে ধীরে ধীরে।

'লাহ্যারি' বলতে বুঝায় উপাধি লাহিড়ী। এবং 'ভোস্' বলতে বুঝাচ্ছে রাঢ়-দেশীয় উপাধি বসু বা বোস্। আর 'রয়' হয়েছে চলতি রায় উপাধিটি। কালা-আদমীদের এইসব সুপরিচিত উপাধি মাঝে মাঝে ফেরঙ্গ আকার ধারণ ক'রে 'সম্ভ্রান্ত' হ'তে চায় আমাদের ইঙ্গবঙ্গপুঙ্গদের অনুগ্রহে।
ললিত লাহ্যারি ও হরেন ভোস্ হচ্ছে এই দলীয় দুই ব্যক্তি। তারাও ব্যারিষ্টার এবং তরুণ রয়ের স্যাঙাত।
সন্ধ্যা হয় হয়। ড্রয়িং-রুমে ব'সে আছে তরুণ এবং তার দুই বন্ধু ললিত ও হরেন।
সামনেই পেগ্-টেবিলে বিরাজ করছে তিনটি কাঁচের গেলাস, তাদের স্বচ্ছ গর্ভে ঢল্ ঢল্ করছে ঈষৎ সোডামিশ্রিত লালচে তরল। আগুন সূর্য্য ডুবে গেলেই 'পেগ্' গ্রহণ করা এদের স্বভাব।
হরেনকে সম্বোধন ক'রে ললিত বলছিল, "আজকের শনিবারের সন্ধ্যাটা একেবারেই বাজে হয়ে যাবে ? কোন হাউসেই কি দেখবার মত ছবি নেই ?"
সুরেন বললে, "সেইরকমই তো মনে হচ্ছে।"
—"তাহ'লে আজ কেবল সুরাদেবীর অনুগ্রহই ভরসা।" এই ব'লে ললিত একটা গেলাস তুলে নিলে।
হরেন বললে, "তবে দেশী ছবিঘরে দু'খানা নতুন ছবি দেখাচ্ছে—"
তরুণ বাধা দিয়ে বললে, "দেশী ছবির নাম মুখে উচ্চারণ কোরো না। না আছে আবেগময় চুম্বন, না আছে ঘনিষ্ঠ আলিঙ্গন, না আছে কোনরকম 'সেক্স্ অ্যাপিল'—আমি নিরামিষ প্রেমাভিনয় দেখতে ইচ্ছুক নই। নিরামিষ প্রেম! অর্থাৎ সোনার পাথরবাটি!"
হরেন বললে, "তুমি যেসব গুণের কথা উল্লেখ করলে, আমাদের দেশী ছবিওয়ালারাও সে সবের অত্যন্ত পক্ষপাতী। কিন্তু তারা দায়ে প'ড়ে ময়্যালিষ্টের মুখোস প'রে আছে। একবার পাহারাওয়ালা সেন্সরদের বিদায় কর, দেখবে সঙ্গে সঙ্গেই তাদের অনেকেরই মুখোস খুলে পড়বে।"
তরুণ নিজের গেলাসে এবারকার মত শেষ চুমুক দিয়ে বললে, "তাহ'লে আমি সেই অসম্ভব শুভদিনের জন্য অপেক্ষা করব। আর এক কারণে আমি দেশী ছবি দেখতে নারাজ। বিলাতী অ্যাক্‌ট্রেসদের সৌন্দর্য্যের সঙ্গে তোমাদের ঐ খবুটে মিন্‌মিনে বাঙালিনীদের তুলনাই হয় না।"
হরেন বললে, "তরুণ, তুমি হচ্ছ দস্তুরমত একচোখা। আমরাও বিলাতী অ্যাক্‌ট্রেসদের বেশী রূপবতী ব'লে স্বীকার করি বটে, কিন্তু কোন কোন দেশী অভিনেত্রীকে অন্তত চলনসই ব'লে অস্বীকারও করি না। অর্থাৎ পোষাকী আর

আটপৌরে সাজের ভেতরে যে তফাৎ আর কি !"

তরুণ গেলাসে আবার পানীয় ভরতে ভরতে বললে, "মাপ কর ভাই, তোমার ঐ আটপৌরে কালিন্দীদের আমি বরদাস্ত করতে পারি না।"

নিজের শূন্য গেলাসটা তরুণের দিকে এগিয়ে হরেন বললে, "শুনেছি, কোন গ্রামে তোমার এক বিবাহিতা শ্রীমতী আছেন। তিনিও আটপৌরেদের দলে পড়েন নাকি।

তরুণ মুখ বিকৃতি ক'রে বললে, "আটপৌরে! না, তারও চেয়ে নিম্নস্তরের? সে খালি কালিন্দী নয়, তার দেহটাও লতিয়ে-পড়া কলাবউয়ের মত রোগা লিক্‌লিকে। তার দিকে একবারও আমার ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখবার ইচ্ছা হয়নি!"

হরেন বললে, "কিন্তু ভুলে যেও না, তুমি দেবতার সামনে মন্ত্র প'ড়ে স্ত্রীর ভার গ্রহণ করেছিলে।"

তরুণ টেবিলের উপর চটাস্ ক'রে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে ব'লে উঠল, "দেবতা! মন্ত্র! ও-সব হচ্ছে সেকেলে কুসংস্কার! আমি মানি না। বাবা আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর ক'রে আমার ঘাড়ে একটা চেলীর পুঁটলী গছিয়ে দিয়েছিল, সেজন্যে আমার কোন দায়িত্ব নেই।"

খালি পাত্রটা মুখ থেকে নামিয়ে সশব্দে টেবিলের উপরে স্থাপন ক'রে এতক্ষণ পরে ললিত বিরক্তির স্বরে বললে, "কী সব বাজে বক্‌বক্ করছ! ওঠ হরেন, তরুণের মতামত নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার কারণ দেখি না। নেশাটা রঙিন হয়ে উঠেছে, এইবেলা বেরিয়ে পড়ি।"

—"কিন্তু যাবে কোন্ চুলোয়?"

—"চুলোয় নয়, নিউ এম্পায়ারে।"

—"বিজ্ঞাপন দেখেছি, সেখানে আজ নতুন কি পুরানো কোন ছবিই নেই।"

—"কিন্তু নাচ আছে। ঐ যে বাংলায় যাকে বলে নৃত্যনাট্য, না, কি? নাচবেন শুভা দেবী।"

তরুণ বললে, "শুভা দেবীটি কে?"

—"একটি বাঙালী মহিলা।"

—"বাঙালীর মেয়ে? আরে ছ্যা! আমি ছেলেবেলায় ষ্টেজে অনেক বাঙালী মেয়ের নাচ দেখেছি। আমার ঘেন্না ধ'রে গেছে, আর সহ্য হবে না।"

—"না হে, শুভা দেবী সেকেলে ষ্টেজের নটী নন, তিনি হচ্ছেন আধুনিক সম্ভ্রান্ত সমাজের বিদুষী মহিলা। ভারতের 'কালচার্যাল ডেলিগেসনে'র জন্যে নির্বাচিত হয়ে আরো কয়েকজনের সঙ্গে তিনি য়ুরোপের দেশে দেশে নিজের আর্ট দেখিয়ে সকলের হৃদয় জয় ক'রে ফিরে এসেছেন। বিলিতি খবরের কাগজে পড়েছি, তিনি কেবল গুণবতী নন, রূপবতীও।"

তরুণ বিস্মিত স্বরে বললে, "বিলাতী কাগজওয়ালারা তোমার ঐ শুভা দেবীটির রূপ-গুণের তারিফ করেছে!"

—"নিশ্চয়! কাগজে কাগজে কলম-জোড়া সমালোচনা। তাঁর নাচ আর রূপ, দুই-ই নাকি অপরূপ!"

তরুণ কিঞ্চিৎ চাঙ্গা হয়ে বললে, "কাগজওয়ালারা তো অত্যুক্তির জন্যে বিখ্যাত।

তবু আমার মনে কৌতূহল জাগছে—চল, তোমাদের সঙ্গে গিয়ে অন্ততঃ দেখে আসি, অত্যুক্তির দৌড় কতদূর হ'তে পারে।"

নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চের উপরে আলোক-প্রপঞ্চের মধ্যবর্তিনী যে নৃত্যকারিণী চঞ্চলা হরিণীর মত তরুণীটির সাক্ষাৎ পাওয়া গেল, সে যে এই বাংলাদেশেরই মেয়ে, এ কথাটা সহজে মানতে চাইলে না তরুণের সমাজদ্রোহী মন।
শুধু কি তার বিচিত্র গতিশীল সুপটু চরণযুগলই নৃত্যছন্দে মনকে নন্দিত ক'রে তুলেছে? সেইসঙ্গে নৃত্যশীল তার জোড়া-ভুরুর ধনু, ইসারাভরা চপল চোখ, দুই লীলায়িত বাহুলতা, ক্ষিপ্র আঙুলগুলি, কামনা-জাগানো পুরুন্ত বক্ষ, ক্ষীণ কটিতট এবং সুললিত শ্রেণীবিভঙ্গ—নাচের ছাঁদ তার সর্ব্বাঙ্গে। অভিনয়েও তার কি মোহনীয় ভাববিলাস! এ যেন শূন্যপটে ক্ষণিক রেখার টানে সঙ্গীতকে ফুটিয়ে তোলা!
তরুণ বুঝতে পারলে, চতুর্দ্দিক থেকে চোখ-কান ফিরিয়ে এনে কেবল শুকনো পেশা নিয়ে সে মেতে থেকেছে, আর তারই অগোচরে দেশের ও সমাজের দিকে দিকে প্রবাহিত হয়ে গিয়েছে অসম্ভব সব পরিবর্ত্তনের স্রোত। বাঙালী মেয়েদের চেহারা পর্য্যন্ত বদলে গিয়েছে নাকি? শুভা দেবী তো বিশ্বের কামনার ধন হ'তে পারেন!
তরুণ জানত, এই রঙ্গালয়ের ম্যানেজার মিঃ চৌধুরী হচ্ছেন ললিতের বিশেষ বন্ধু। নাচের শেষে ললিতকে অনুরোধ ক'রে সে ম্যানেজারের সঙ্গে পরিচিত হ'ল। তারপর জানতে চাইলে, এ নাচ এখানে কতদিন দেখানো হবে? উত্তরে শুনলে, আগামী দুই সপ্তাহের শনি ও রবিবারের সন্ধ্যাতেও শুভা দেবীর নাচের আসর বসবে।
তরুণ বললে, "তাহলে যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে। মিঃ চৌধুরী, শুভা দেবীর অপূর্ব্ব নৃত্য আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমি যদি একজোড়া সোনার নূপুর উপহার দিয়ে শুভা দেবীকে আমার প্রাণের অভিনন্দন জানাতে চাই, তাহ'লে তিনি অনুগ্রহ ক'রে গ্রহণ করবেন কি?"
মিঃ চৌধুরী বললেন, "গ্রহণ না করবার তো কোন কারণ দেখছি না। এমন মূল্যবান অভিনন্দন কোন্ শিল্পী প্রত্যাখ্যান করবে?"
বাইরে এসে হরেন মত জাহির করলে, "তরুণ, তোমার অবাস্তব স্বর্গ ছেড়ে তুমি কি পৃথিবীর মাটিতে পদার্পণ করতে চাও?"
তরুণ বললে, "ও স্বর্গ-ফর্গ বুঝি না, আমি অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করি।"
ললিত মৃদু হেসে বললে, "তাহ'লে অবস্থাটা কি শুনি? প্রথম দর্শনেই প্রেম?"
—"ননসেন্স!"

শেষ নৃত্যাভিনয়ের দিন সকাল বেলাতেই স্বর্ণকারের কাছ থেকে পাওয়া গেল একজোড়া সোনার নূপুর।
রাত্রে নাচ সুরু হবার পর মিঃ চৌধুরী প্রেক্ষাগারে এসে সুধোলেন, "মিঃ রয়, উপহারটা আপনি কি স্বহস্তে দিতে চান?"
—"নিশ্চয়!"

—"তাহ'লে মাঝের বিরামের সময়ে সেই ব্যবস্থা করি ?"
তরুণ ব্যস্তভাবে বললে, "না না, সেটা কেমন হেটো ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। বিশেষ করে নিজের নামকে আমি এ ভাবে বিজ্ঞাপিত করতে ইচ্ছুক নই।"
—"বেশ, তাহ'লে যবনিকা পড়বার পর আপনাকে ভিতরে নিয়ে যাব।"
—"ধন্যবাদ।"
যথাসময়ে ললিত ও হরেনের সঙ্গে তরুণ যখন শুভা দেবীর সুমুখে গিয়ে দাঁড়াল তখন তার মনে হ'ল চোখের সামনে জ্বল্‌জ্বল্ করছে যেন নিষ্কম্প বিদ্যুৎ-শিখা। তার হাত থেকে মখমল মোড়া উপহারের বাক্সটি গ্রহণ ক'রে ভঙ্গীভরে নত হয়ে মধুর স্বরে শুভা বললে, "আপনাদের যে আনন্দ দিতে পেরেছি এ আমার পরম সৌভাগ্য।"
তরুণ বিগলিত দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, "না শুভা দেবী, আপনার স্বর্গীয় আর্টের পক্ষে আমার উপহারের কোনই মূল্য নেই।"
ঝরণার ধারার মত কলস্বরে শুভা বললে, "বেশ, তাহ'লে আপনার উপহারকে আমি অমূল্য ব'লেই গ্রহণ করলুম।"
তরুণ মাথা দুলিয়ে বললে, "শুভা দেবী, আপনি যৎসামান্যকে অসামান্য ক'রে তোলবার চেষ্টা করবেন না। কেবল আপনার আর্টই স্বর্গীয় নয়, আপনার দেহও হচ্ছে ভগবানের দুর্লভ দান।"
একটু চাপাহাসি হেসে শুভা বললে, "মিঃ রয়! পৃথিবীর কোন্ মানুষের দেহ ভগবানের দান নয় বলতে পারেন ?"
কথার খেলায় হেরে যাচ্ছে দেখে তরুণ তৎক্ষণাৎ প্রসঙ্গ বদলে বললে, "আমার একটি অনুরোধ আছে।"
তরুণের মুখের উপরে পূর্ণদৃষ্টি স্থির রাখলে শুভা। একটু চুপ ক'রে রইল ভাবহীন মুখে। তারপরেই তার চক্ষে জাগল চপলার চমক। ওষ্ঠাধারে হাসির রং মাখিয়ে সে সকৌতুকে বললে, "আদেশ করুন।"
—"আগামী কল্য আপনি কি 'ফির্পো'র ওখানে ডিনারের আমন্ত্রণ গ্রহণ করবেন ?"
—"আপনার আমন্ত্রণ গ্রহণ না করবার সাধ্য আমার নেই। তবে ডিনারের নয়, বৈকালী চায়ের।"
তরুণ যেন কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হ'ল। বেলাবেলি চায়ের আসর হচ্ছে অত্যন্ত গদ্যময়—রোদে তখনো খট্‌খট্ করে, হৃদয়ম্বার উন্মুক্ত করা অসম্ভব। তবু মনে মনে সে নিজেকে আশ্বাস দিলে—ভয় কি, 'শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনম্'। প্রকাশ্যে বললে, "উত্তম, তাহ'লে সেই কথাই রইল। কাল আপনি প্রস্তুত হ'য়ে থাকবেন, আমি যথাসময়ে—"
যেন তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে শুভা বললে, "আপনি যথাসময়ে 'ফির্পো'য় উপস্থিত থাকলেই হবে। নিজের মোটরেই আমি আপনার আমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাব। এখন আমি বড় শ্রান্ত! নমস্কার।"
পথে আসতে হরেন বললে, "শুভা দেবী হাসিমুখে উপহার গ্রহণ করলেন, কিন্তু নমস্কার গ্রহণ করলেন বড়ই গম্ভীর মুখে। আলো আর ছায়া একসঙ্গে। রহস্যময়ী।"

ললিত বললে, "যে নারী সাত সমুদ্র তেরো নদীর জলে অবগাহন ক'রে হৃদয় কুড়িয়ে আর ছড়িয়ে দেশে ফিরে এসেছে, আমি তাকে বলি লীলাময়ী। অর্থাৎ ঝানু খেলোয়াড়। তরুণ শক্ত জমির উপরে বিচরণ করতে এসেছে, মাটিতে পায়ের দাগ বসবে না।"

তরুণ মুখে অবহেলার ভাব ফুটিয়ে বললে, "কাঞ্চনমূল্যের জয় সর্ব্বত্র। প্রথমবারেই অনেকটা অগ্রসর হয়েছি, দ্বিতীয় কি তৃতীয়বারে কেল্লা ফতে করতে পারি কিনা দেখা যাক্। আমি আশাবাদী।"

ফির্পোর ভোজনগারের দরজার সামনেই অপেক্ষা করছিল তিন বন্ধু। যথাসময়েই শুভার মোটর এসে হাজির।

হাত বাড়িয়ে তার হাত ধ'রে নিয়ে যাবার জন্য এগিয়ে এল তরুণ।

মুখ টিপে হেসে শুভা বললে, "আপনাকে অতটা কষ্ট স্বীকার করতে হবে না। আমি নিজেই চলতে পারব।" এই ব'লে সকলের আগে-আগেই গট্‌গট্ ক'রে অগ্রসর হয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগল।

হরেনের কানে কানে ফিস্‌ফিস্ ক'রে ললিত বললে, "দেখেছ, শুভা দেবী নিবিড় ঘনিষ্ঠতাকে আমল দিতে নারাজ?"

হরেন বললে, "উনি বোধ করি দুর্লভ হ'তে চাইছেন।"

—"উঁহু, লীলাময়ীর লীলা।"

দোতলায় উঠে ওরই মধ্যে কতকটা নিরিবিলি এক কোণে তরুণ টেবিল বেছে নিলে। সকলে আসন গ্রহণ করলে। উর্দ্দিপরা পরিবেশক সামনে এসে হাজির।

তরুণ সুধোলে, "চায়ের সঙ্গে খাবার আনতে বলব শুভা দেবী?"

শুভা বললে, "আপনার যা খুসি তাই। আমি পছন্দ অপছন্দের ধার ধারি না। বিশেষ আমার হাতে যখন সময় নেই।"

—"আজ একটা জলসায় আমার নাচবার কথা। পনেরো দিন আগে থেকেই তারিখ ধার্য হয়ে আছে। ছ'টার সময় জলসা আরম্ভ। আমাকে আবার 'মেক-আপ' করতে হবে।"

তরুণ কণ্ঠস্বরে মাধুর্য্য ঢেলে বললে "আপনার তো অতিরিক্ত 'মেক-আপে'র দরকার নেই শুভা দেবী। আপনি এখনই যা আছেন তার তুলনা হয় না। চারিদিকে তাকিয়ে দেখুন, সায়েব-মেমরা পর্য্যন্ত আপনাকে লক্ষ্য করছে। আপনার রূপে যে মাদকতা আছে তাই-ই যথেষ্ট, তার উপরে আবার নতুন 'মেক-আপ' হচ্ছে অনর্থক বাহুল্যের মত।"

মুক্তস্বরে হেসে উঠে শুভা বললে, "আপনি কি কবিতা লেখেন?"

—"এ সন্দেহ কেন?"

—"নইলে এমন মিষ্টি কথা বলছেন কেমন ক'রে?"

—"আমি কবিত্বের ধার ধারি না, কারণ আমি আইন-ব্যবসায়ী!"

খুব সহজভাবে ধীরে ধীরে শুভা বললে, "তাও আমি জানি। তার উপরে আর-একটা কথাও বলতে পারি। বাপের-দেওয়া 'গোবিন্দ' নাম ছেড়ে যিনি 'তরুণ' নামে পরিচিত হ'তে চান, তিনি কবি নন তো কী?"

তরুণ চমকে উঠে বললে, "একথা আপনি জানলেন কেমন ক'রে ?"
—"লোকের মুখে শুনেছি।"
—"আমার নাম নিয়ে লোকের এতটা মাথাব্যথা কেন ?" তরুণের কন্ঠস্বর রুদ্ধ।
অবিচলিতভাবে শুভা বললে, "অবশ্য কবিত্বের জন্যে না হোক, অন্তত আধুনিকতার জন্যেও অনেকে পিতৃদত্ত সেকেলে নামে পরিচিত হ'তে চায় না।"
হালে পানি পেয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে তরুণ বললে, "হ্যাঁ শুভা দেবী, ঠিক ঐ কারণেই গোবিন্দ নামটা আমি পছন্দ করি না।"
শুভার চোখদুটো একবার জ্বল্‌জ্বল্‌ ক'রে উঠেই নিবে গেল। তারপর মৃদুস্বরে বললে, "আমার নামটা আপনার কেমন লাগে ?"
—"চমৎকার! শুভা নামে আছে সঙ্গীতের মাধুর্য্য।"
—"কিন্তু আমার বাবা ও-নাম রাখেন নি।"
—"তবে ?"
—"ও নামটি নিজের জন্যে আমি নিজেই বেছে নিয়েছি।"
—"কেন ?"
—"আত্মগোপন করবার জন্যে।"
ধাঁধায় প'ড়ে তরুণ বললে, "আত্মগোপন করবার জন্যে ?"
—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"
—"তাহ'লে আপনার আসল নাম ?"
—"করুণা।"
তরুণের মুখ পাংশু হয়ে শুভার মুখের পানে তাকিয়ে রইল।
নিষ্করুণ কণ্ঠে শুভা বললে, "মিঃ রয়, করুণা ব'লে কাউকে আপনি চেনেন ?"
তরুণ স্তম্ভিত, নিরুত্তর।
নিম্ন অথচ তীব্র তিক্ত স্বরে শুভা বললে, "আমিই সেই উপেক্ষিতা করুণা। আমাকেও কি আপনি চিনতে পারছেন না ? নামবদলের সঙ্গে সঙ্গে আমার চেহারাও কি এতই বদলে গিয়েছে ? ও কি মিঃ রয়। অমন অস্থির হয়ে উঠে দাঁড়ালেন কেন ? চারিদিকে লোক গিজ্‌ গিজ্‌ করছে, এখানে কোন নাটকীয় দৃশ্য সকলের আপত্তিকর হ'তে পারে। ব'সে পড়ুন। চা আনতে বলুন। আমার হাতে আর বেশী সময় নেই।"
তারপর ?
তারপর কি হ'ল খবর পাইনি। সুতরাং এখানেই 'নোটেগাছটি মুড়ুলো'।

রাজরাণী হও

—বিমল মিত্র

বিয়ের সময় মা আশীর্বাদ করেছিল, তুমি রাজরাণী হও মা। স্বামী, পুত্র, শ্বশুর-শাশুড়ী নিয়ে সুখে ঘর-করনা করো।

আশ্চর্য, মায়ের সেই আশীর্বাদ যে এমন করে মিথ্যে হয়ে যাবে, তা কে জানতো! তাহ'লে গল্পটা গোড়া থেকেই বলি। বাইরের লোকের কাছ থেকে যে কত রকমে গল্প পাওয়া যায়, তা ভাবলেই অবাক হয়ে যাই।

এবার বারাণসীতে গিয়েছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল ঘুরে বেড়ানো। তারপর একে-একে যখন পরিচিতরা টের পেয়ে গেল যে আমি এসেছি, তখন সবাই এল আমার সঙ্গে দেখা করতে।

বারাণসী আমার পুরনো জায়গা। প্রায় প্রতি বছরই পুজোর পরে আমি সেখানে যাই। নানা সূত্রে আমার সঙ্গে তাদের পরিচয় হয়েছে। বলতে গেলে তাঁরা সবাই-ই সাহিত্য-রসিক। তাই সাহিত্য-রসিক মাত্রই আমার বন্ধু-স্থানীয়।

এঁদের মধ্যে একজনের নাম ডঃ নিরঞ্জন শর্মা। ডক্টরেট পেলেই সবাই সাহিত্য-রসিক হয় না, কিন্তু ডঃ শর্মার কথা আলাদা। তিনি দু'টো বিষয়ে এম-এ, এবং উপরন্তু ডক্টরেট। ডক্টরেট তো সংসারে গাদা-গাদা। ওটার আজকাল আর কোনও চমক নেই। কিন্তু শর্মাজীর কথা সত্যিই আলাদা। তিনি প্রায় রোজই সন্ধ্যেবেলা আমার ঘরে আসতেন এবং আমিও মনের মত লোক পেয়ে প্রাণ ভরে সাহিত্য-আলোচনা করতাম।

তিনি নিজে 'নাগরী প্রচারিণী' সভার সম্পাদক। এবং তাঁর স্ত্রী আনন্দময়ী মা'র আশ্রমে যে মেয়েদের স্কুল আছে তার শিক্ষিকা।

ডঃ শর্মা বলেছিলেন, আনন্দময়ী মা'র আশ্রমে একজন মহিলা আছেন, তাঁকে নিয়ে যদি কখনও গল্প লেখেন তো সেটা লোকের খুব ভালো লাগবে।

জিজ্ঞেস করলাম, কেন?

শর্মাজী বলেছিলেন, মহিলাটি একজন খুনী। খুনের দায়ে তার যাবজ্জীবন জেল হয়েছিল।

আবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, কেন?

শর্মাজী বলেছিলেন, সে এক অদ্ভুত কাণ্ড দাদা। আপনি যদি তাকে নিয়ে কখনও গল্প লেখেন তো আমি খুব খুশী হবো। আমি আমার স্ত্রীর কাছ থেকে সব শুনেছি। মহিলাটি ভালো লেখা-পড়া জানে না। কিন্তু খুব সচ্চরিত্র।

—খুনী মেয়ে কী করে সচ্চরিত্র হয়?

শর্মাজী বললেন, হয়। নইলে মা কেন তাকে শিক্ষার প্রতিষ্ঠানে আশ্রয় দেবেন। মহিলাটি সব কথাই খুলে বলেছে মা'কে। তাঁর মুখ থেকেই আমার স্ত্রী সব শুনেছে। আশ্রমের সব কাজের ভার এখন সেই মহিলাটির ওপর। অত বড় বিশ্বাসী মেয়ে আশ্রমে আর কেউ নেই। তাই মা নিজে তার হাতে ভাঁড়ারের চাবি তুলে দিয়েছেন।

—নাম কী মহিলাটির ?

শর্মাজী বললেন, অনিলা। নামেও অনিলা, কাজেও সত্যি-সত্যিই অনিলা। চোদ্দ বছরের জেল হয়েছিল। যার মানে 'ট্রান্সপোর্টেশন ফর লাইফ্'। সেটা কমে আট বছরে দাঁড়িয়েছিল। আট বছর জেল খাটা কি সোজা কথা ?

আট বছর পরে। আটও হতে পারে আবার সাড়ে সাতও হতে পারে। ও সব সঠিক হিসাব রাখা সম্ভব ছিল না তার। জেনানা ফাটকে কোথা দিয়ে বছরের পর বছর কেটে গেছে, তার হিসেব রাখা সম্ভবও নয়।

সব মিলিয়ে চোদ্দ বছরের মেয়াদ। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড-ভোগের কথা। কিন্তু বোধহয় তার ওপর দয়া হয়েছিল কর্তাদের। তার সম্বন্ধে রিপোর্টও ভালো ছিল। কখনও কাউকে গালাগালি দেওয়া দূরের কথা, একটু কড়া কথাও বলেনি সে। তাই যখন সে শুনলো যে, তাকে জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হবে, তখন বিশ্বাস করতেও ইচ্ছে হয়নি।

একজন মেয়ে ওয়ার্ডার তাকে এসে প্রথম খবরটা দিলে।

বললে, দিদি শুনছেন, আপনাকে ছেড়ে দেওয়া হবে!

জিজ্ঞেস করলে, তার মানে ? আমার তো এখানে চোদ্দ বছর থাকার কথা! ছেড়ে দেবে কেন হঠাৎ ?

সুশীলা বললে, জানি না, এই তো বড় দিদিমণির কাছে শুনলাম।

—ঠিক শুনেছিস তো ?

সত্যি-সত্যিই কথাটা প্রথমে কেউই বিশ্বাস করতে চায়নি।

এমন ঘটনা যে ঘটেনি তা নয়। আগেও খুনের অপরাধে অনেককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে কচিৎ কয়েকজনকে সাড়ে সাত বছর পরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক আসামীর নামে নাকি আলাদা-আলাদা ফাইল থাকে। সেই ফাইলে আসামীদের সব কিছুর রেকর্ড লেখা থাকে। কে কেমন ব্যবহার করছে, কে কতবার কর্তাদের হেনস্থা করেছে। কথায়-কথায় নালিশ তো সকলের লেগেই আছে। অথচ এতদিন তো তাদের ফাঁসি হয়ে যাবার কথা ছিল। নেহাৎ হাকিমের দয়ায় ফাঁসি না হয়ে হয়েছিল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। যাদের ফাঁসি হয়ে যাবার কথা, তাদের ফাঁসি না হয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে। এর জন্যে তো তাদের ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞ থাকাই উচিত। কিন্তু তা নয়, পান থেকে চুন খসলেই তাদের যত রাগ। ভাত একটু ঠাণ্ডা হলে কিম্বা তরকারীতে একটু নুন বেশী হলেই তারা একেবারে লঙ্কা-কাণ্ড বাধিয়ে বসবে।

কিন্তু অদ্ভুত এই আসামী অনিলা বিশ্বাস। জেনানা-ফাটকের ইতিহাসে নাকি এমন ভদ্র নিরীহ আসামী আগে আর কখনও আসেনি।

তে গেলে জেলখানার মধ্যে সুশীলাই অনিলাকে একটু বেশী খাতির করতো। সুশীলা জেলখানায় কতবছর কাজ করছে কে জানে। বেশ দশাসই পুরুষালি চেহারা। কালো কুচকুচে গায়ের রং। প্রথম দিনেই চুপি-চুপি অনিলাকে বলে গয়েছিল, পান-দোক্তা খাওয়ার নেশা আছে নাকি আপনার ?

অনিলা বলেছিল, না।

সুশীলা বলেছিল, নেশা থাকলে বলবেন। লজ্জা করবেন না। আমার নাম সুশীলা। আমি এখানকার সবাইকে নেশার খোরাক জোগাড় করে দিই। আমাকে জেলখানার কর্তা থেকে গেটের দারোয়ান পুলিশ পর্যন্ত খাতির করে।

অনেক পীড়াপীড়ির পরও অনিলা রাজি হয়নি। বলেছিল, না আমার কোন কিছুরই দরকার নেই।

তারপর কথাটা অনেকবার বলেছে সুশীলা। যেন শ্রীমতী অনিলা বিশ্বাসকে ও কোনও রকমে খুশী করতে পারলেই সে সুখী হবে।

শেষকালে অনিলা বলেছিল, কেন আমাকে ওসব লোভ দেখাচ্ছ ভাই, আমার কোনও কিছুরই দরকার নেই। তোমরা আমাকে খেতে না দিলেও আমি কিছু বলবো না। আমি কিছুই চাই না তোমাদের কাছে। আমার ফাঁসি হয়ে গেলে আমি আরো খুশী হতাম !

সুশীলা তার বাপের জন্মে এমন আসামী আগে আর দেখেনি।

একদিন অনিলার কাছে বসে খুব ভাব জমিয়েছিল। তারপর একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, আচ্ছা দিদি, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো ?

অনিলা বলেছিল, কী বলবে বলো না !

সুশীলা জিজ্ঞেস করছিল, আচ্ছা দিদি, আপনি কি সত্যিই খুন করেছিলেন ?

অনিলা প্রথমে কিছু বলেনি, শুধু চুপ করে কথাটা শুনেছিল।

—আপনি বলুন না দিদি, আমার বড় জানতে ইচ্ছে করছে !

—যা বলবার আমি তো হাকিমের কাছে সব বলেছি।

সুশীলা বলেছিল, কিন্তু আমি তো কোর্টে ছিলুম না। এখানকার খাতায় দেখলুম লেখা আছে, আপনি খুনের আসামী। কিন্তু আপনাকে দেখে আমার তা বিশ্বাস হয় না। খুনের আসামী তো আমি আগেও অনেক দেখেছি। কিন্তু আপনার চেহারা দেখে বিশ্বাসই হয় না যে, আপনি কাউকে খুন করতে পারেন। বলুন না দিদি সত্যিই আপনি খুন করতে পারলেন ?

অনিলা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিল, মানুষ সব করতে পারে !

—কিন্তু তা বলে আপনি ? আপনার মত এত ভালো মানুষ আমি জীবনে দেখিনি যে !

—বাইরে থেকে দেখে মানুষকে কি চেনা যায় ?

সুশীলা বলেছিল, হ্যাঁ চেনা যায়। আমি এখানকার সব মানুষকে চিনতে পারি। আর আমি এতদিন এখানে চাকরি করছি, মানুষ দেখে-দেখে আমার চুল পেকে গেল, আমি মানুষ চিনবো না ?

অনিলা এ-কথার কোনও উত্তর দেয়নি।

সুশীলা আরও জিজ্ঞেস করেছিল, সংসারে আপনার আর কে আছে দিদি ?

অনিলা বলেছিল, আমার ছেলে।
—কত বয়েস আপনার ছেলের ?
—এত কথা আমায় কেন জিজ্ঞেস করছো সুশীলা ? এত কথা জেনে তোমার ব লাভ হবে ?
—আমার বড় ভাল লাগে জানতে। যেদিন আপনি প্রথম জেলখানায় ঢুকলে সেইদিন থেকেই আপনাকে আমার খুব ভালো লেগেছে। দেখেন না, আপ এখানে আসার পর থেকেই আমি সব কাজ ফেলে আপনার কাছে বেশীক্ষণ কাটাই আর আপনার কাছে বেশীক্ষণ কাটাই বলে অন্য মেয়েরা কত কথা শোনা আমাকে।
অনিলা বলেছিলো, সত্যিই, তুমি আমার কাছে বসে থেকো না। তোমার কত কা চারদিকে, ওরা তো কথা শোনাবেই।
—আমি যাচ্ছি। কিন্তু আপনি কী ভাবেন এত সময় ?
সত্যি, অনিলার কি কম ভাবনা! সে-সব কথা তো পরকে বলা যাবে না। বলে তারা বুঝবেও না। সমস্তক্ষণ একলা-একলা খোকার মুখখানা ভেবে-ভেবেও যে কুল-কিনারা পেত না। চোদ্দ বছর। চোদ্দ বছর এইখানে কাটাতে হবে তাকে চোদ্দ বছর কি অনিলা বাঁচবে ? আর যদি বাঁচেও, বাড়ি ফিরে গিয়ে কী দেখবে সেই বাতাবীলেবু গাছটা তখন হয়তো আর দেখতে পাবে না সে। কত বড়-ব বাতাবী-লেবু হতো, সেই লেবুগাছতলায় খেলা করতো খোকা। চোদ্দ বছর পরে হয়তো বাড়ি গিয়ে খোকাকে দেখতেই পাবে না সে।
হঠাৎ সুশীলা এসে বলতো, দিদি, আপনার ভাত নিয়ে এসেছি, খেয়ে নিন।
প্রথম প্রথম অনিলা ভাবতো তার সমস্ত জীবনটা বুঝি এই জেলখানার মধ্যেই কেটে যাবে। কোথা দিয়ে সূর্য উঠবে, কোথা দিয়ে সন্ধ্যে হবে, কিছুই সে দেখতে পাবে না। তার নিজের জীবনের সূর্যোদয় যেমন সে দেখতে পায়নি, তেমনি তার জীবনের সূর্যাস্তটাও সে দেখতে পাবে না। এইখানে এই কয়েদখানার মধ্যেই তার জীবনের পূর্ণচ্ছেদ ঘটবে।
কিন্তু কোত্থেকে কে যে তার কাছে এই সুশীলাকে পাঠিয়ে দিয়েছিল। সে তাকে বেছে-বেছে ভালো জিনিসগুলো রান্নাঘর থেকে এনে দিত। বলতো, আজকে আপনার জন্যে একটা সন্দেশ এনেছি দিদি।
সন্দেশ! সন্দেশ দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল অনিলা। বরাবর ধান মেশানো চালের মোটা অসেদ্ধ ভাত আর তরি-তরকারীর ঘ্যাঁট। এই তার দু'বেলার খাদ্য! এর মধ্যে সন্দেশ কোথা থেকে এল!
—সন্দেশ কোথা থেকে পেলে ? কে পয়সা দিলে ?
সুশীলা বলতো, বাজার থেকে বাইরের জিনিস এখানে আনবার কায়দা আছে! ভেতরে সবই পাওয়া যায় পয়সা ফেললে! পান-দোক্তা দরকার হলে তাও পাওয়া যায়! যাদের আফিমের নেশা, তারা লোক দিয়ে আফিমও আনিয়ে নেয়। আফিম থেকে সুরু করে বিড়ি-সিগারেট-মাছ-মাংস-সন্দেশ-রসগোল্লা সবই আনিয়ে নেয়!
অনিলা অবাক হয়ে বলেছিল, এর জন্যে টাকা-পয়সারও দরকার হয় তো। সেসব টাকা-পয়সা কোথা থেকে আসে ?

—টাকা-পয়সাও বাইরে থেকে আসে ! স্বদেশী বাবুদের আমলে পিস্তল-রিভলবারও আসত। সবই টাকার খেলা !
অনিলার মনে পড়ে যেত তার শ্বশুরের কথা। শ্বশুরও বলতো, সবই টাকার খেলা টাকা দিয়ে যেমন ধান-চাল-কাপড়-নুন-তেল-মশলা কেনা যায়, তেমনি পাপই বলো আর পুণ্যই বলো, টাকা দিয়ে সংসারে সবই কেনা যায় !
শ্বশুরের সামনে অনিলা ঘোমটা মাথায় দিয়ে গিয়ে দাঁড়াতো।
শ্বশুর হেমন্ত বিশ্বাস বড় হিসেবী মানুষ ছিল। দিন-রাত টাকার হিসেব নিয়েই ব্যস্ত থাকতো। সোনার গয়না বন্ধক রেখে টাকা ধার দিত। অনেকে বন্ধকী গয়না আরও ছাড়াতেও পারতো না। সুদ দেওয়ার ক্ষমতাও থাকতো না অনেকের ! তখন সেগুলো নিজের সম্পত্তি হয়ে যেত শ্বশুরের। সেই টাকাগুলো শ্বশুরমশাই ব্যাঙ্কে রাখতো না, রাখতো পেতলের ঘড়ায়। পেতলের ঘড়াগুলো মেঝেতে গর্ত করে তাতে পুঁতে রেখে ওপরে বিছানা পেতে শুয়ে পড়তো। আর সামান্য কিছু টাকা ক্যাশ বাক্সতে রেখে কাজ চালাতো।
এক-একদিন হঠাৎ বৌমাকে দেখে অবাক হয়ে যেত শ্বশুরমশাই। একেবারে ভূত দেখার মতো চমকে উঠতো। টাকাগুলো তখনও ছড়ানো রয়েছে সামনে। শ্বশুর-মশাই মাঝে-মাঝে টাকাগুলো বাক্স থেকে বার করে গুণতো। সে সময় অন্য কেউ তার ঘরে আসুক তা সে চাইতো না।
হঠাৎ ঠিক সেই সময়ে মানুষের পায়ের শব্দ শুনে চমকে উঠে বলতো, কে ?
—আমি বাবা, আমি !
টাকা-পয়সাগুলো ধুতির কোঁচা দিয়ে ঢাকা দিয়ে দিত শ্বশুর-মশাই। তারপর মুখটা উঁচু করে বলতো, তা তুমি এ সময়ে কেন ? জানো তো এ সময়ে আমি কাজে ব্যস্ত থাকি।
—আপনার আফিমু আর দুধ এনেছি বাবা !
—তা এর জন্যে এ ঘরে আসবার কী দরকার ছিল ? আমাকে ডাকলেই তো আমি বাড়ির ভেতরে যেতে পারতুম !
তা তখন আর কিছু করবার নেই। বউমা ততক্ষণে যা দেখবার সব দেখে ফেলেছে। শ্বশুর বলতো, দাও—
আফিমের গুলিটা বউমার হাত থেকে নিয়ে শ্বশুর মুখে ছুঁড়ে দিত। তারপর দুধের বাটিটা নিয়ে দুধটা চুমুক দিয়ে খালি বাটিটা বউমার হাতে দিয়ে বলতো— এবার থেকে বউমা, তোমাকে আর কষ্ট করে আমার ঘরে আসতে হবে না, আমাকে একবার ডাকলেই আমি বাড়ির ভেতরে গিয়ে দুধ খেয়ে আসবো। বুঝলে ?
আসলে বউমা শ্বশুরের টাকা-কড়ি, গয়না-টয়নার পাহাড় দেখে ফেলবে, এটা শ্বশুর হেমন্ত বিশ্বাসের ভালো লাগতো না।
সেদিন থেকেই হেমন্ত বিশ্বাস সাবধান হয়ে গেল। বাড়ির সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়তো তখন বিছানাটা উঠিয়ে পেতলের ঘড়ার ভেতর থেকে টাকা-গয়না সব বার করতো। তারপর একটা কাগজের টুকরোয় সব লিখে রাখত। তা থেকে, আবার বেশী রাত পর্যন্ত জেগে পাকা খাতাটায় লিখে রাখতে হতো। সেই পাকা খাতাটা আবার যেখানে-সেখানে রাখলে চলবে না। বাইরে রাখলে কেউ না কেউ দেখলে

ফেলবে।
সেই সব দিনগুলোর কথা মনে পড়তো অনিলার।
সুশীলা মাঝে-মাঝে এসে পাশে বসতো।
বলতো, কী এতো ভাবছেন দিদি ?
অনিলা বলতো, ভাবনার কি শেষ আছে ভাই। আর না ভেবেই বা করবো কী? আর তো কোনও কাজ নেই আমার!
সুশীলা বলতো, অত ভাবা ছেড়ে দিন তো আপনি! এখানে কত লোক এল গেল, কত লোকের ফাঁসি হয়ে গেল দেখলুম, কেউ তো আপনার মত এত ভাবে না। দেখবেন কোথা দিয়ে যে চোদ্দ বছর কেটে যাবে, শেষকালে টেরও পাবেন না। এখানে এসে কত লোকের শরীর ভালো হয়ে গেছে, তাও দেখেছি আমি!

চোদ্দ বছর।
চোদ্দ বছর যে কী করে তার কাটবে, তাই ভেবেই অনিলা প্রথমে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ভয় পাওয়াটা অন্যায় কিছু নয়। 'জেল' কথাটা কানে শোনা ছিল অনিলার। লোকে খুন করে ফাঁসি-কাঠে ঝোলে, তাও লোকের মুখে শুনেছিল সে। কিন্তু সেই তাকেই যে একদিন জেলখানাতে আসতে হবে, তা সে-কি কোনোদিন কল্পনা করতে পেরেছিল!
জীবন জিনিসটা যে কী, তা ছোটবেলায় অনিলা বুঝতে পারেনি। বাপ মারা গিয়েছিল কবে তা মনে নেই। লোকে বলতো তার বাবা নাকি খুব ভালো মানুষ ছিল। কিন্তু সে তো শোনা কথা! বাবাকে অনিলা দেখেনি, কিন্তু মাকে দেখেছে। অনেক কষ্টে মা তাকে মানুষ করেছিল। বলতে গেলে মা নয়, মাসির কাছেই সে মানুষ হয়েছিল।
মাসি মা'কে সান্ত্বনা দিত। বলতো, কিছু ভাবিসনি তুই, আমি তো বেঁচে আছি আমি ঠিক তোর মেয়ের একটা হিল্লে করে দেব। মেয়ের জন্যে তোকে কিছু ভাবতে হবে না.
মা'র অম্বলের অসুখ ছিল। যখন অম্বল হতো তখন মা যন্ত্রণায় ছটফট্ করতো কবিরাজ বলে দিয়েছিল রোগটার নাম 'অম্লশূল'।
'অম্লশূল' রোগে নাকি বড় কষ্ট! কিন্তু নিজের বিধবা বোন বলে মাসিমা মা'কে যতদূর সাধ্য যত্ন করতো। মা'র জন্যে বিশেষ-বিশেষ রান্না করে দিত। মা বলতো, আমি আর বেশী দিন বাঁচবো না দিদি, আর বেশী দিন তোমাকে কষ্ট দেব না—
মাসি বলতো, তুই থাম তো, বেশী বক্-বক্ করিসনি। আমি যখন আছি তোর ভাবনাটা কীসের ?
মেসোমশাই মানুষটাও ভালো ছিল খুব। মাসির সঙ্গে যখন মেসোমশাই-এর বিয়ে হয়, তখন তার ভালো অবস্থা ছিল না। অনিলার বাবার মতই অবস্থা ছিল তার

কিন্তু পুরুষের ভাগ্য কখন খোলে তা কি বলা যায় ?
মেসোমশাই-এর অবস্থাও একদিন ভালো হয়ে গেল। বড়লোক হয়ে গেলেও কিন্তু শালীর ভালো-মন্দের দিকটা দেখতে ভোলেনি। মা কেবল মাসিকে বলতো, আমার অনিলার একটা ব্যবস্থা করে দিও দিদি, ও মেয়েটাই যে আমার গলায় কাঁটা হয়ে ফুটছে।
শেষকালে অনেক বলার পর তবে একটা পাত্র জুটলো।
পাত্র ভালোই। পাত্রের বাপ হেমন্ত বিশ্বাস মহাজন মানুষ। কুসুমগঞ্জের বাদা অঞ্চলে প্রায় নিজস্ব দেড় হাজার বিঘে ক্ষেত-জমি আছে। তাতে ভাগে চাষ-বাস করায় হেমন্ত বিশ্বাস। তাতে নিজেদের খাবার রেখেও মোটা টাকা আমদানি হয়। কুসুমগঞ্জের লোকেরা হেমন্ত বিশ্বাসকে খুব ভক্তি করে। তারই ছেলে হল পাত্র। নাম বসন্ত।
বসন্তকে একদিন দেখে পছন্দ করে এলো মেসোমশাই।
এসে বললে, সব ব্যবস্থা পাকা করে এলাম, বুঝলে গো ?
মাসিমা বললে, দিতে-থুতে হবে কী রকম ?
মেসোমশাই বললে, হেমন্ত বিশ্বাস মশাই-এর কি কম টাকা ? সে-কি টাকার ভিখিরী ?
মাসিমা জিজ্ঞেস করলে, আর পাত্তোর ?
—পাত্তোরকে দেখলে সকলের চোখ কপালে উঠবে। এমন চেহারা।
তা এও বোধহয় কপাল! নইলে বিধবার একমাত্র মেয়ে, অনিলার কপালে এমন পাত্র জুটবে, এটা কে কল্পনা করেছিল ?
পাত্র বসন্ত যেমন দেখতে, তেমনি শিক্ষিত। সে মেয়ে দেখতেও চাইলে না। বললে, বাবা যখন পাত্রী পছন্দ করেছে তখন আর তা দেখবার কী আছে।
কলকাতায় থেকে সে বি-এ পাশ করেছে। বুদ্ধি-বিবেচনা ভালো।
বসন্ত বলেছিল, বিয়ে আমি করছি, কিন্তু কোনও যৌতুক নিতে পারব না।
হেমন্ত বিশ্বাস বলেছিল, তাহ'লে বিয়ের খরচা কি আমি নিজের ঘর থেকে দেব বলতে চাস। দশটা গাঁয়ের লোক এসে পাত পেড়ে খাবে, তার জন্যে অন্ততঃ হাজার পাঁচেক টাকা খরচ হবে। সে খরচাটা খামাকো আমি কেন করতে যাবো ?
বসন্ত বলেছিল, বিয়েতে পণ নেওয়া পাপ বলে আমি মনে করি।
হেমন্ত বিশ্বাস বলেছিল, কলকাতায় গিয়ে লেখাপড়া শিখে তোমার এই বুদ্ধি হয়েছে ? এমন হবে জানলে আমি তোমাকে লেখা-পড়া শেখাতাম না। আমার এত টাকা-কড়ি, সোনার গয়না, সেই মহাজনী কারবার, আমি মরে গেলে এসব তো তোমাকেই দেখতে হবে একদিন। তোমার মতি-গতি দেখে তো মনে হচ্ছে না, এসব তুমি রাখতে পারবে !
বসন্ত বাবার কথায় প্রথম প্রথম চুপ করে থাকতো। কিছু বলতো না। কিন্তু বেশী পীড়াপীড়ি করলে বলতো, বেশী টাকা থাকা কি ভালো ?
হেমন্ত বিশ্বাস ছেলের কথা শুনে চমকে উঠতো! বলতো, তার মানে ? তুমি বলছো কী ? বেশী টাকা থাকা ভালো নয় ?
বসন্ত বলতো, না।

—কী বললে ?

যেন ভুল শুনেছেন কথাটা। যেন বিশ্বাসই করতে পারছেন না ছেলের মুখের জবাবটা। আবার জিজ্ঞেস করলে, কী বললে তুমি ? আবার ভালো করে বলো ?

বসন্ত বললে, আমি বলছি বেশি টাকা থাকা ভাল নয়।

হেমন্ত বিশ্বাস তবু যেন কথাটা বিশ্বাস করতে পারলো না। বললে, বেশি টাকা থাকা ভাল নয় কেন ? বেশি টাকা থাকাটা কি দোষের ? যত বেশি টাকা থাকবে ততোই তো সুখ। টাকার অভাব তো কখনও বুঝলে না, তাই ও-কথা বলছো। যাদের টাকা নেই, তাদের অবস্থাটা একবার গিয়ে দেখে এসো। দেখে এসো গিয়ে কী অবস্থায় তারা দিন কাটাচ্ছে, কী দুরাবস্থার মধ্যে তারা আছে। শীতের দিনে গায়ে দেবার মত একটা জামা নেই, এক সের চাল কেনবার মত পয়সা নেই। অনেক সময়ে পুকুরের কলমীশাক সেদ্ধ করে নুন দিয়ে খাচ্ছে। তুমি ওসব দেখনি, কিন্তু আমি দেখেছি। তুমি অভাব কাকে বলে তা জানো না বলেই এই কথা বলছো। আমি তোমাকে নিজের মাথার ঘাম পায়ে ফেলা পয়সা দিয়ে আরামে রেখেছি বলেই তুমি বলতে পারলে 'বেশি টাকা থাকা ভাল নয়'।

বসন্ত বললে, আমি তো বলিনি যে 'টাকা থাকা ভালো নয়'। আমি শুধু বলেছি যে 'বেশি টাকা থাকা ভালো নয়'।

—তা 'বেশি' বলতে তুমি কী বোঝ ? কত টাকা হলে বেশি টাকা হবে ? পনেরো হাজার ? বিশ হাজার, চল্লিশ হাজার না এক লাখ ?

বসন্ত বললে, আমি সে-সব জানি না। আমি শুধু এইটুকু জানি যে, দরকারের বেশি টাকা থাকা অন্যায় !

—দরকার ? দরকারের মাপকাঠি কী ? একটা ভারি অসুখ হলে চিকিৎসার খরচটুকুও থাকবে না, এইটেই কি তুমি বলতে চাও ?

বসন্ত বললে, না, তাতো আমি বলিনি। গ্রামের সবাই গরীব থাকবে, খেতে পাবে না, পেটের দায়ে আপনার কাছে জমি বন্ধক রাখবে আর দরকারের সময় জমি ছাড়িয়ে নিতে পারবে না, আর অন্যদিকে আমরা মজা করে খাবো-দাবো, এটা ভালো নয়।

রাগে হেমন্ত বিশ্বাসের আগা-পাশতলা জ্বলতে লাগলো। বললে, তুমি তো আগে এ-রকম ছিলে না! এ-রকম হলে কবে থেকে ? এখন দেখছি তোমাকে কলকাতায় পাঠানোই আমার আহাম্মকি হয়েছে। এসব কথা কি কলেজের প্রফেসরেরা তোমাকে শিখিয়েছে নাকি ?

বসন্ত বললে, না, আমি এ-সব আমাদের ইকনমিক্সের বইতে পড়েছি। কার্ল মার্ক্সের বই পড়ে শিখেছি।

—কার্ল মার্ক্স ? না, কী বললে তুমি ?

বসন্ত বললে, কার্ল মার্ক্স !

—কার্ল মার্ক্স ? সে আবার কে ? কী বই লিখেছে ?

বসন্ত বললে, সে আপনি বুঝবেন না। তিনি একজন মহাপুরুষ, তিনি মানুষের অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে বই লিখে গেছেন। অনেক লোক তাঁকে দেবতা বলে মানেন।

—দেবতা? অনেক দেবতার নাম শুনেছি। শিব, দুর্গা, কালী, গণেশ, কিন্তু কার্ল মার্কস বলে কোনও দেবতার তো নাম শুনিনি। কীসের দেবতা? কে তাকে পুজো করে? কারা তারা?

বসন্ত বললে, পৃথিবীর অনেক জ্ঞানী-গুণী লোকই পুজো করে।

—পাঁজিতে তার নাম আছে?

বসন্ত বললে, না পাঁজিতে নেই, কিন্তু তাঁকে নিয়ে হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ বই লেখা হয়েছে।

হেমন্ত বিশ্বাস বুঝলো জল অনেকদূর গড়িয়েছে।

বললে, যাক্‌গে, যা হবার তা হয়ে গেছে। এবার তো পাশ করে গেছ। এবার ও-সব কথা ভুলে যাও। কাল থেকে তুমি আমার কাজকর্ম দেখবে। আমার বয়েস হচ্ছে, আমিও আর বেশি দিন এত সম্পত্তি দেখাশোনা করতে পারবো না। তোমাকেই নিজে এ-সব কাজ করতে হবে। আমি চাই এখন থেকে তুমি সব বুঝে-সুঝে নাও।

হেমন্ত বিশ্বাস মুখে কথাগুলো বললে বটে, কিন্তু মনে-মনে বুঝলো, এ-ছেলেকে শোধরানো এখন শক্ত। তবু শক্ত হলেও চেষ্টা করতে হবে।

তাই পরের দিন থেকে বসন্তকে নিযে কাগজ-পত্র সব দেখাতে লাগলো। বললে, এই দেখ, এইগুলো হচ্ছে তমসুক। এইগুলো হচ্ছে জমা-খরচের হিসেব। কার কাছে কত টাকা পাই, কাকে কত টাকা দিয়েছি, কত বকেয়া পাওনা আছে, এতে তারই হিসেব লেখা আছে। এগুলো একদিনে বুঝতে পারবে না, বুঝতে সময় লাগবে। কিন্তু চেষ্টা করলে কী-ই না হয়? আমিই কি ছাই আগে বুঝতুম? চেষ্টা করে করে নিজেই বুঝে নিয়েছি। আর দেখ, এইগুলো হচ্ছে ম্যাপ, সেটেলমেণ্টের ম্যাপ। আমার কত জমি আছে তারই হিসেব।

প্রথম-প্রথম বসন্ত বাবার কাছে বসে কাগজ-পত্র দেখে বুঝতে শিখলো। হেমন্ত বিশ্বাসও মন প্রাণ দিয়ে ছেলেকে বোঝাতে লাগলো।

কিন্তু শুধু বোঝালে চলবে না। তাকে সংসারী করতে হলে প্রথম কাজ, তার একটা বিয়ে দিতে হবে। সেইদিন থেকেই পাত্রীর খোঁজে লেগে গেল হেমন্ত বিশ্বাস।

বাংলাদেশে কখনও বিয়ের পাত্রীর অভাব হয়নি, এখনও হলো না।

তাকে তো হেমন্তর বাড়িতে টাকার পাহাড়, তার ওপর পরিবার নেই। একটি মাত্র ছেলে—তা সেও আবার বি-এ পাশ। সেই পাত্রের সঙ্গে যার বিয়ে হবে, সে অভাবের মুখ কখনও দেখতে পাবে না।

সুমগঞ্জে মেয়ের অভাব নেই। অনেক লোকের অনেক অরক্ষণীয়া কন্যা আছে। তারা খবরটা পেলেই ঝুলোঝুলি আরম্ভ করে দেবে।

কিন্তু হেমন্ত এত সহজ লোক নয় যে, খবরটা রাতারাতি রটিয়ে দেবে আর একপাল মেয়ের বাপ এসে তার দরজায় ধর্ণা দেবে।

একজন খাতক এসে একবার খবর দিয়ে গিয়েছিল যে, দশ ক্রোশ দূরে দিনহাটাতে একটা বাপ-মরা মেয়ে আছে, সে দেখতে অপরূপ সুন্দরী। মেয়েটির মা আছে, কিন্তু বাপ নেই। তা না থাক। বাপ না থাকাই ভালো। বাপ থাকলে কথায়-কথায় বেয়াই-এর কাছে এসে টাকাটা-সিকেটা চাইবে। মেয়ের ভাইবোন কেউ নেই,

সেটাও ভালো। কথায়-কথায় তারাও জামাইবাবুর বাড়িতে এসে খেয়ে-থেকে যাবে উৎপাত করবে। খরচের চূড়ান্ত হবে তখন। অথচ কুটুম মানুষদের কিছু বলাও যাবে না।

থাকবার মধ্যে আছে এক অম্বুলে রুগী মা। তা সেও বেশিদিন বাঁচবে না। থাকে ভগ্নিপতির বাড়ি। মানে তাদের গলগ্রহ।

হয়তো কিছু বরপণ দিতে পারবে না। তা বরপণ দিতে না পারলো তো বয়েই গেল। বরপণ না নিলে বরং হেমন্তর গুণ-গানই করবে লোকে।

বলবে, হেমন্ত বিশ্বাস মহাজনী কারবার করলে কী হবে, কঞ্জুষ নয়। ছেলের বিয়ে দিয়ে একটা আধলাও নেয়নি।

তাতে দুর্নামের বরং কিছুটা লাঘব হবে।

হেমন্ত বিশ্বাস জিজ্ঞেস করলে, মেয়ের গোত্র কী?

গোত্র-বংশ সবই পছন্দসই। সবই মিলে গেল। একদিন নিজে গিয়ে পাত্রীকে চর্মচক্ষে দেখেও এল হেমন্ত বিশ্বাস। সেই দেখার সঙ্গে-সঙ্গে একজোড়া সোনার বালা দিয়ে একেবারে আশীর্বাদও করলো। বললে, পাত্রকে একার ইচ্ছে হলে দেখতে পারেন।

পাত্রীর মেসোমশাই যেন তখন হাতে সোনার চাঁদ পেয়েছে। বললে, দেখাদেখি আর কী আছে। দেখা আর আশীর্বাদ একসঙ্গেই করে আসবো আমি। তা সে ব্যবস্থাই পাকাপাকি হয়ে গেল সেদিন। পাঁজি দেখে দিন-ক্ষণ স্থির হয়ে গেল।

অনিলার মনে আছে, সে-দিনটা একটা অদ্ভুত রোমাঞ্চের মধ্যে কেটে গিয়েছিল। চিরকালের মত মাকে ছেড়ে পরের বাড়িতে চলে যেতে হবে, আর সেই বাড়িটাকে নিজের বাড়ি বলে ভাবতে হবে, সে এক অদ্ভুত অনুভূতি!

অনিলার ভয় হয়েছিল। মা বলেছিল, ভয় হচ্ছে কেন রে?

অনিলা বলেছিল, কোথায় পরের বাড়ি চলে যাবো, সেখানে কে আমাকে দেখবে, কে আমাকে যত্ন করবে কি করবে না। তুমি কোথায় থাকবে, আর আমি কত দূরে থাকবো।

মা বলেছিল, মেয়েমানুষ হয়ে জন্মালে বিয়ে একদিন করতে হবে মা, আর মেয়েমানুষের বিয়ে হলে তো পরের বাড়ি যেতেই হয়। এ সকলের বেলাতেই হয়। আমারও তাই হয়েছে, তোমার মাসিমারও তাই হয়েছে। তোমার কিছু ভয় নেই মা, ভয় কী? একবার বিয়ে হয়ে যাক, তখন দেখবে আমার বাড়িতে আর তুমি আসতেই চাইবে না।

অনিলা বলেছিল, কিন্তু সেখানে গিয়ে যে আমি তোমাকে দেখতে পাবো না মা!

মা বলেছিল, আমাকে না-ই বা দেখতে পেলে। তুমি তোমার স্বামী ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার করবে। রাজরাণী হবে। আমি আর মা কতদিন বাঁচবো? মা কারোর চিরকাল বেঁচে থাকে? তখন দেখবে আমাকে তুমি একেবারে ভুলে যাবে। আমার কথা মনেই পড়বে না তোমার! এরই নাম তো সংসার মা!

আশ্চর্য, বিয়ের পরদিন শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় কী কান্নাটাই না কেঁদেছিল অনিলা! এখন ভাবলে হাসি পায়।

পাড়ার লোকেরা বর দেখে প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ।

সবাই বললে, অনেক তপস্যা করলে তবে এমন বর পাওয়া যায় গো। ছুঁড়ির কপালটা ভালো।
সত্যিই বসন্তকে দেখতে ভালো। অনেক তপস্যা করলেই অমন স্বামী মেয়েমানুষের কপালে জোটে বটে। আর শুধু তো চেহারা নয়, তার ওপর লেখাপড়া জানা বর। আর সকলের ওপর বাপের টাকা। টাকার খবরটা কেমন করে জানি না সারা গ্রামে রটে গিয়েছিল। লোকের মুখে-মুখে সবাই জেনে গিয়েছিল যে, বাপের দেড় হাজার বিঘের মত জমি-জমা আছে। তা ছাড়া আছে টাকার পাহাড়।
তা কথাটা যে মিথ্যে নয়, তা বৌভাতের দিনেই বোঝা গেল। যারা নেমন্তন্ন খেতে এলো তারা বসন্তর বউ দেখে অবাক। একেবারে মাথা থেকে পা পর্যন্ত সোনার গয়নায় মোড়া।
বসন্ত নাকি আপত্তি করেছিল প্রথমে।
কিন্তু হেমন্ত বিশ্বাস শোনেনি। বলেছিল, তুমি থামো, আমার বাড়ির এই প্রথম আর এই-ই শেষ বিয়ে, বউকে না সাজালে লোকে বলবে কী? বলবে হেমন্ত বিশ্বাস গরীব মানুষ, তার টাকা নেই।
বসন্ত বলেছিল, টাকা না-থাকাটা কি লজ্জার?
হেমন্ত বিশ্বাস বললে, লজ্জার নয়? বলছো কী তুমি? যার টাকা নেই, তাকে কি লোকে ভালো চোখে দেখে? তাকে কি শ্রদ্ধা করে,সম্মান করে?
—শ্রদ্ধা আর সম্মান বড়, না ভালোবাসা বড়ো?
হেমন্ত বিশ্বাস বললে, শুকনো ভালোবাসায় কি পেট ভরে? এই যে তোমার বৌভাতে আজ দশখানা গ্রামের লোক আমার বাড়িতে পাত পেড়ে খাবে, এতে তারা খুশী হবে না বলে মনে করো? সবাই খেয়ে আমাকে ধন্য-ধন্য করবে, তা জানো?
—আমি তা মনে করি না। সবাই পেট পুরে খাবে, কিন্তু মনে-মনে সবাই আপনাকে হিংসে করবে।
—হিংসে করবে? হিংসে করবে কেন?
—আপনার টাকা আছে বলে হিংসে করবে। তারা পেট পুরে খেয়ে বলবে, বিশ্বাসমশাই আমাদের খাইয়ে তার ঐশ্বর্য দেখাচ্ছে। এতে তারা আপনাকে অভিশাপ দেবে।
—তাহ'লে কি বলতে চাও আমি আমার রক্ত-জল-করা টাকাগুলো পরকে বিলিয়ে দিই? তুমি কি তাই-ই চাও?
—আমি কি বলেছি, আপনি টাকাগুলো পরকে বিলিয়ে দিন?
—প্রকারান্তরে তাই-ই তো তুমি বলছো।
বসন্ত বললে, না, আমি তা বলছি না। আমি আপনার ঐশ্বর্য এত ঘটা করে পরকে দেখাবেন না। দেখালে যাদের নেই, তাদের মনে কষ্ট হবে।
হেমন্ত বিশ্বাস বললে, ছেলে-মেয়ের বিয়েতেই তো লোকে ঘটা করে। এই সব ব্যাপারে যদি ঘটাই না করি, তো কবে ঘটা, করবো? আমার যে টাকা আছে, তা কবে কি করে লোককে দেখাবো তা হলে?
বাড়িতে একটা গৃহিণী নেই, মা-পিসী-মাসী-দিদি-দিদিমা-ঠাকুমা নেই যে ব্যবস্থা করবে। বিয়ের ব্যাপারে যা-কিছু করণীয় সবই করছে পাড়ার মেয়েরা। তারাই

বউ-বরণ, ফুলশয্যা, গায়ে-হলুদের ব্যাপারট্যাপার সব কিছুতেই সাহায্য করেছিল। বসন্ত যখন নতুন বউ নিয়ে কুসুমগঞ্জের বাড়িতে এল তখন পাড়ার ন'কাকিমা, বড়-পিসিমারাই বউকে বরণ করে ঘরে তুললো। অচেনা জায়গা, অচেনা মুখ, অচেনা পরিবেশ। কান্না পেতে লাগলো অনিলার। কার সঙ্গে সে তার মনের কথা বলবে তাও সে ভেবে পেলো না!

নতুন বউ-এর মুখ দেখে সবাই বাহবা দিয়ে উঠলো।

কে একজন বুড়ি মতন মহিলা এসে অনিলার বেনারসী ঘোমটা তুলে বলল, ওরে, এ যে সগ্যের অপ্সরাকে বিয়ে করে এনেছিস রে বসন্ত, তুই কত ভাগ্যি করেছিলি রে। তোর বউ-ভাগ্যি তো ভালো।

সবারই মুখে ওই একই কথা! বললে, যুগ্যি ছেলের যুগ্যি বউ!

কথাগুলো সকলের কানেই গেল। হেমন্ত বিশ্বাস একদিনের জন্যে তার প্রাত্যহিক কাজ থেকে ছুটি নিয়েছিল। জামা-কাপড় পরে শ্বশুর হেমন্ত বিশ্বাসের সেদিন অন্য চেহারা। অন্যদিন হেমন্ত বিশ্বাস গায়ে শুধু একটা ফতুয়া পরেই থাকে। আর পরনে থাকে একটা মোটা আটহাতি ধুতি। ওইতেই দিন কেটে যায়। হেমন্ত বিশ্বাসের তাতে খরচও বাঁচে আর আরামও হয়।

তা সেদিন কাল-রাত্রি। অনিলাকে একলা রাত কাটাতে হলো না। আশে-পাশের বাড়ি থেকে মেয়েরা এসেই তাকে সঙ্গ দিলে! কত রকমের গল্প-গুজব-হাসি-ঠাট্টাতে কোথা দিয়ে যে দিনটা কেটে গেল বোঝা গেল না। কে একজন পাড়ার বুড়ি দিদিমার বয়েসী মেয়েমানুষ বললে, আজ নাত-বউ-এর পাশে আমি শোব, আজকে আর নাতির সঙ্গে তোমাকে শুতে নেই।

দিদিমার কথায় অন্য মেয়েরা সবাই হেসে উঠলো।

তার পরদিনই ফুলশয্যা বা বৌভাত। সমস্ত বাড়িখানা একেবারে লোকে-লোকারণ্য। গ্রামের মহাজনের একমাত্র ছেলের বিয়ে। সেদিন আর কারো বাড়িতে রান্না হলো না। দশখানা গ্রামের লোক ঝেঁটিয়ে এসেছে নেমতন্ন খেতে।

অনিলার আজও মনে আছে সে-দিনটার কথা!

সকাল থেকে নানা-রকম রান্নার গন্ধতে বাড়িটা ভুর ভুর করছে। হেমন্ত বিশ্বাস কৃপণ মানুষ হলে কী হবে। ছেলের বিয়েতে একেবারে মুক্তহস্ত। তোমরা দেখে যাও আমি ছেলের বিয়েতে কত খরচ করছি। একটা কানা-কড়িও আমি নিইনি পাত্রীপক্ষের কাছ থেকে। তোমরা আমাকে কৃপণ-সুদখোর মানুষ বলো, তা আমি জানি। কিন্তু এবার দেখে যাও, আমি কত খরচও করতে পারি। লুচি করেছি, আবার পোলাও-ও করেছি। দু'রকম মাছ। পোনা মাছ আর বাগদা চিংড়ি। যারা নিরামিষ খাবে তাদের জন্যে আলু-পটলের দোর্মার সঙ্গে ছানার ডালনাও করেছি। আর মিষ্টি? মিষ্টিই কি কিছু কম করেছি তা বলে। রসগোল্লা, পানতুয়া, দরবেশ, ছানার জিলিপি, আবার-খাবো সন্দেশ, রাবড়ি, দই, পাঁপড়ভাজা। কোন কিছুরই কমতি নেই। খরচ করতে বসেছি যখন—তখন আর হাত-টান করিনি কোনও ব্যাপারেই। আর পাত্রীর বাড়ির ফুলশয্যার তত্ত্ব দেখে তোমরা নিন্দে করো না। আমি তো কুটুমের পয়সা দেখে সম্বন্ধ করিনি। আমি শুধু দেখেছি মেয়ের রূপ আর দেখেছি মেয়ের গুণ।

—ও মুকুন্দ, তুমি হাত গুটিয়ে বসে কেন ? খাও, হাত চালাও।
মুকুন্দ বলে, খাচ্ছি তো খুড়োমশাই, কিন্তু এত আয়োজন করেছেন যে আর পেটে ধরছে না।
হেমন্ত প্রত্যেকের কাছে গিয়ে-গিয়ে ওই একই কথা বলছেন—কী রকম বউ দেখলে বলো হরিহর। এমন বউ আগে আর কারো ঘরে এসেছে ?
হরিহর গ্রামের মিস্ত্রি মানুষ। খেতে পেয়ে একেবারে বর্তে গেছে।
পেটে আর তার ধরে না, তবু গোগ্রাসে গিলছে। কোনও রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, রাজপুত্তুরের বউ কি আর ঘুঁটেকুড়ুনীর মত হবে দাদামশাই ? যুগ্যি জায়গায় যুগ্যি কনেই এয়েচে।
অনিলা যে ঘরে বউ হয়ে সোনার গয়নায় মুড়ে বসেছিল তার পাশের ছাদেই লোকেরা খেতে বসেছিল। সব কথাই টুকরো-টুকরো ভাবে তার কানে আসছিল। মাসিমা-মেসোমশাই মা সবাই এসেছিল। যাবার আগে সবাই এসে দাঁড়ালো। বললে, যাই রে বুড়ি, তোর কপাল ভালো যে এমন রাজ-বাড়িতে পড়েছিস। রাত হয়ে যাচ্ছে, আমরা আসি মা। স্বামী-সংসার নিয়ে সুখে ঘর করো, রাজরাণী হও, এই আশীর্বাদ করি মা। আর দু'দিন পরেই বেয়াই মশাইকে বলে তোমাকে নিয়ে যাবো। একদিন একটু কষ্ট-সষ্ট করে থাকো মা।
অনিলা আর কী বলবে। তার চোখ দু'টো তখন কান্নায় ছলছল করছে।
মা চিবুকে হাত দিয়ে বললে, ছি, কাঁদে না মা, কাঁদতে নেই। অনেক ভাগ্য করলে এমন ঘর-বর পাওয়া যায়, তবু তোমার কান্না আসছে, ছিঃ—
অনিলা বলতে গেল, মা তোমার শরীরের দিকে একটু যত্ন নিও—কিন্তু বলতে গিয়েও কথাগুলো তার মুখ দিয়ে বেরোল না। চোখ দু'টো ঝাপসা হয়ে এল। গলাটা কান্নায় বুজে এল। সবাই চলে গেল।

সুশীলা সেদিন সব দেখে অবাক। বললে, এ কি দিদি, কিছুই খাননি যে আপনি ? সবই পড়ে রয়েছে যে।
অনিলা বললে, আর খাবো না সুশীলা, আমার ক্ষিধে নেই।
—তা আপনারই বা দোষ কী ? কত বড় ঘরের বউ আপনি আমি কি তা জানি না, আমি সবই শুনেছি। জেলখানার এসব খাবার আপনার মুখে রুচবে কেন ?
বলে এঁটো থালাটা ভাত সুদ্ধ তুলে নিয়ে যায়। সুশীলার অনেক কাজ। জেনানা-ফাটকে আরো অনেক কয়েদী আছে, তাদেরও দেখতে হয় তাকে। কাজে গাফিলতি হলে তাকেও গাল-মন্দ খেতে হয়। তাই বেশিক্ষণ বসতে পারে না অনিলার কাছে।
তবু সময় পেলেই দৌড়ে আসে। এসে বলে, একটু হাঁ করুন তো দিদি, হাঁ করুন—
অনিলা বুঝতে পারে না। বলে, কেন হাঁ করতে যাবো কেন ? হাতে কী তোমার ?
সুশীলা তবু জোর করে। বলে, হাঁ করুন না একটু, একটা জিনিস খাওয়াবো।

আপনাকে।
—জিনিসটা কী তা-ই বলো না ?
সুশীলা তবু ডান হাতটা মুঠো করে থাকে। বলে, আগে হাঁ করুন, তারপর নিজেই বুঝতে পারবেন। ভয় নেই, আমি বিষ খাওয়াবো না, আপনি হাঁ করুন—
শেষ পর্যন্ত অনিলা হাঁ করল। আর সঙ্গে-সঙ্গে সুশীলা ডান হাতের মুঠোর জিনিষটা পুরে দিলে অনিলার মুখে।
অনিলা জিনিসটা খেয়ে বুঝতে পারে, পান। পানের খিলি একটা।
পান চিবোতে-চিবোতে অনিলা বলে, পান কোথায় পেলে তুমি ?
সুশীলা বললে, শুধু পান কেন, জেলখানায় আপনি যা চাইবেন তা-ই জোগাড় করে দিতে পারি আপনাকে। এখানে কোনও জিনিসের অভাব নেই। এ শুধু নামেই জেলখানা। শুধু বাইরে বেরোন যায় না, এইটেই একটা অসুবিধে।
কেন যে সুশীলা এই আট বছর ধরে তাকে এত খাতির-যত্ন করে এসেছে, তা অনিলা বুঝতে পারেনি। মনে আছে, কোর্টে যখন প্রথম সে জজসাহেবের রায় শুনেছিল তখন প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাবার অবস্থাই হয়েছিল তার। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। সারাটা জীবন জেলখানায় কাটাতে হবে, এ যেন কল্পনাও করতে পারেনি সে।
কিন্তু না, পরে শুনেছিল সারা জীবন মানে চোদ্দটা বছর। তা চোদ্দটা বছরও কি কিছু কম ? তখন সে যে বুড়ি হয়ে যাবে। তখন আর জীবনের বাকিটা কী থাকবে। প্রথমেই মনে পড়ল সুমন্তর কথা।
কত কষ্ট করে সুমন্তকে মানুষ করেছে সে। সব ছেলেদের মানুষ করা কষ্টের। টাকার কষ্টটা বড় কথা নয়। হেমন্ত বিশ্বাস যার শ্বশুর তার টাকার কষ্ট হবার কথা নয়। কুসুমগঞ্জের মানুষেরা সবাই জানতো, বিশ্বাস-বাড়িতে টাকার অভাব নেই। দারিদ্র্যের জন্যে কেউ মানুষ হতে পারবে না, বিশ্বাস বাড়িতে এ-ঘটনা ঘটা অসম্ভব।
বরং উল্টোটাই সত্যি। শ্বশুর হেমন্ত বিশ্বাস মশায় খুব ভালোবাসতো অনিলাকে। বলতো, বউমা, তুমি একটু বসন্তকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সংসারী করে তুলতে পারো না ?
সত্যিই বসন্ত ছিল অন্য ধাতুর মানুষ। বৌভাতের দিনেই সেকথা বুঝতে পেরেছিল অনিলা। সেই গয়না পরা নিয়েই শুরু হয়েছিল। প্রথমে বাবার সঙ্গে কথা কাটাকাটি। ছেলে বাবার মহাজনী ব্যবসাই পছন্দ করতো না। ওই মহাজনী কারবারের ওপরেই বসন্তের ছিল যত রাগ।
হেমন্ত বিশ্বাস সেটা জানতো। তাই ছেলের জন্যে এমন একটি বউ খুঁজতে আরম্ভ করেছিল, যে সুন্দরী। যৌতুকের দরকার নেই, দেনাপাওনার দরকার নেই, বংশ-গৌরব থাকুক বা না থাকুক, তা জানবারও দরকার নেই। শুধু কনে রূপসী হলেই চলবে।
হেমন্ত বিশ্বাস অনেক পাত্রী দেখেছিল। ঘটকও লাগিয়েছিল অনেকগুলো। পাত্রী শুধু সুন্দর হওয়া চাই। তাও আবার যেমন-তেমন সুন্দরী নয়। ডাকসাইটে সেরা সুন্দরী। যেন বউ দেখে লোকে বলে, হ্যাঁ বিশ্বাস মশাই বউ করেছে বটে, যেন ডানা-কাটা পরী।

এখন অবশ্য অনিলার আর সে-রূপ নেই। জেলখানার লপ্সি খেয়ে-খেয়ে সে রূপ নষ্ট হয়ে গেছে।

তবু সুশীলা বলতো, এমন রূপ কোথা থেকে পেলেন দিদি ?

অনিলা মনে-মনে হাসতো। হ্যাঁ, এমন রূপ না পেলেই হয়তো তার জীবনে অন্তত আর কিছু না হোক শান্তি আসতো। তার মা বিয়ের পর থেকে সারা জীবন বিধবা হয়ে কাটিয়েছে। মা'রও রূপ ছিল, কিন্তু অনিলার তুলনায় তা কিছুই নয়। হয়ত তার বাবা ছিল রূপবান পুরুষ। বাবাকে জন্মে ইস্তক দেখেনি। কিন্তু মাকে দেখেছে। মা-ও হয়তো তার বয়েসে রূপসী ছিল। তবে অম্বলের রোগে মা শেষের দিকে একেবারে কালচে হয়ে গিয়েছিল। তার ওপর ছিল মাসির বাড়ির গলগ্রহ। ভাবনায়-চিন্তায় মার রোগ শেষের দিকে আরো বেড়ে গিয়েছিল। মেয়ের বিয়ে যখন পাকা হলো তখন মার মুখে প্রথম হাসি বেরোল। মা গিয়ে মঙ্গল চণ্ডীতলায় পুজো দিয়ে এল।

বললে, এতদিন পরে মা তবু মুখ তুলে চাইলে।

হ্যাঁ, মুখ তুলে চাইলোই বটে। এমনই মুখ তুলে চাইল যে, একদিন খুনের আসামী হয়ে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হলো।

কিন্তু ভাগ্যিস মা তখন বেঁচে নেই। বেঁচে থাকলে হয়তো মা গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হতো, কিংবা দম আটকে মারা যেত !

অনেক দিন জেলখানার ভেতর যখন রাত্রে ঘুম আসতো না তখন মাকে উদ্দেশ্য করে বলতো, মা, তুমি আমায় ক্ষমা করো মা, আমি যা কিছু করেছি আমার সুমন্তর কথা ভেবে করেছি। তুমি কি চাও মা, যে আমার সুমন্ত পথের ভিখিরি হোক, পথে-পথে পেটের দায়ে সে ভিক্ষে করে বেড়াক ?

সকালবেলা সুশীলা যথারীতি আসতো। অনিলার চেহারা দেখে সে অবাক হয়ে যেত। বলতো, কী হলো দিদি, আপনার কি রাতে ঘুম হয়নি ?

অনিলা বলতো, না, তুমি কিছু ভেবো না, আমার ঘুম হয়েছে।

—না দিদি, আপনি মিথ্যে কথা বলছেন, নিশ্চয়ই আপনার ঘুম হয়নি, চলুন আজকেই আপনাকে আমি ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে যাবো ডাক্তারবাবুকে খুব ভালো ওষুধ দিতে বলবো।

অনিলা মাথা নাড়তো—ও কিছু না, তুমি ভুল দেখছো।

সুশীলা তবু ছাড়তো না। জোর করে অনিলাকে হাসপাতালে নিয়ে যেত। জেলখানার হাসপাতাল, নামেই শুধু হাসপাতাল। যেমন সেখানকার ডাক্তার, তেমনি সেখানকার ওষুধ। সে ডাক্তার মন দিয়ে কারোর চিকিৎসাও করে না, আর সেই জল-মেশানো ওষুধে কারো রোগও সারে না।

অনিলা ঘরের ভেতরে এসে লুকিয়ে-লুকিয়ে সে-ওষুধ না খেয়ে নর্দমায় ঢেলে দিত। সুশীলা সে-সব জানতেও পারতো না !

অনিলা মনে মনে ভাবতো, 'কোথায় কত দূরে কোন্ কুসুমগঞ্জে পড়ে রইল তার নিজের ছেলে সুমন্ত। আর কোথায় জেলখানার ভেতরে কোন এক অচেনা মানুষ তাকে নিজের করে নিয়েছে। এরই নাম বোধহয় ভালোবাসা ! ভালোবাসার দেবতা সত্যিই অন্ধ।

সুশীলা বারবার তাকে জিজ্ঞেস করতো, আচ্ছা, আপনি সত্যি বলুন তো দিদি, আপনি কি সত্যিই খুন করেছিলেন? আমার তো বিশ্বাসই হয় না, আপনি কাউকে সত্যি-সত্যি খুন করতে পারেন?

অনিলা হাসতো সুশীলার কথা শুনে। বলতো, জজসাহেব যখন আমাকে খুনী বলে রায় দিয়ে দিয়েছেন, তখন আর আমাকে ও-কথা জিজ্ঞেস করছো কেন?

সুশীলা বলতো, বা রে, জজসাহেব বুঝি ভুল রায় দিতে পারেন না? জজসাহেবও তো মানুষ। তারও তো ভুল হতে পারে। তা আপনি আপিল করেছিলেন?

অনিলা বলতো না! আপিল করে কী হবে? সরকারী উকিল আপিল করবে বলেছিল, আমি রাজি হইনি! আর আপিল করেই বা কী হবে? কপালে যা আছে তাই-ই হবে। মানুষ কি নিজের ইচ্ছেয় কিছু করে? ভগবানই সব করায়, আর লোকে বলে তারা নিজেরাই সব কিছু করে। আমার কপালে বোধহয় এই শাস্তিই ছিল। সবই ভগবানের ইচ্ছে। তুমিও কেউ নও, আর আমিও কেউ নই। নইলে আমিই বা বিধবা হবো কেন হঠাৎ?

সুশীলা আরো কৌতূহলী হয়ে উঠতো। জিজ্ঞেস করতো, সত্যি দিদি, তুমি বিধবা হলে কী করে? কী অসুখ হয়েছিল তোমার স্বামীর?

—তিনিও খুন হয়েছিলেন।

—কে খুন করেছিল?

অনিলা এক-কথায় কথাটার জবাব দিত—টাকা।

সত্যি টাকাই মানুষকে বাঁচায়, আবার সেই টাকাই মানুষকে খুন করে।

এ পৃথিবী বড় বিচিত্র জায়গা। কবে কত হাজার বছর আগে মানুষই একদিন টাকাকে আবিষ্কার করেছিল নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে। আবার সেই টাকাই নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে মানুষকে খুন করছে। হেমন্ত বিশ্বাস জানতো শুধু টাকা। আর তাঁর ছেলে সেই টাকার মূল্যে বুঝতো না।

ফুলশয্যার দিন যখন সবাই ঘর ছেড়ে চলে গেল, বসন্ত ঘরের দরজাটায় খিল দিয়ে একপাশে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। অনিলার তখন এক অস্বস্তিকর অবস্থা। লজ্জায় একপাশে জড়ো-সড়ো হয়ে সে-ও দাঁড়িয়েছিল। কে আগে কথা বলবে, তাই নিয়েই যেন প্রতীক্ষা।

কিন্তু সারা রাত তো প্রতীক্ষা করা চলে না। এক সময়ে যেমন দিন শেষ হয়ে রাত্রি আসে, তেমনি প্রতীক্ষার শেষে আবার কথাও হয়।

প্রথমে কথা বললে বসন্তই। বললে, দেখ, তোমার সঙ্গে যে আমার বিয়ে হয়েছে সে বাবার কথাতে। বাবাই তোমাকে পছন্দ করেছে, বাবাই আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিয়েছে। আমি বউ পছন্দ করবার জন্যে তোমাকে একবার দেখতেও যাইনি। তা তো জানো?

অনিলা চুপ করে রইল।

বসন্ত খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে বললে, কই, জবাব দিচ্ছ না যে?

অনিলা তবু সে-কথার কোনও জবাব দিলে না।

বসন্ত বললে, আমি জানি তুমি নতুন বউ, এত তাড়াতাড়ি নতুন স্বামীর কথার জবাব দিতে নেই—তবু জিজ্ঞেস করছি। তুমি শুধু বলো 'হ্যাঁ' কি 'না'—

অনিলা কোনক্রমে জবাব দিলে, হ্যাঁ।

বসন্ত বললে, হ্যাঁ, জেনে রাখো, আমি তোমাকে বিয়ে করিনি, বাবা তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছে, তার উদ্দেশ্য আমাকে সংসারী করা। আর আমিও বিনা প্রতিবাদে তোমাকে বিয়ে করেছি।

এ-কথার জবাব দেবার দরকার ছিল না, তাই অনিলাও কিছু জবাব না দিয়ে চুপ করে রইল।

বসন্ত আবার বলতে লাগলো, কিন্তু একটা কথা তোমাকে আগে থেকে বলে রাখা ভালো যে, যদিও আমি এ-বাড়ির ছেলে তবু বাবার আদর্শের সঙ্গে আমার আদর্শের আকাশ-পাতাল তফাত। বাবা মনে করে টাকার জন্যেই মানুষ, আর আমি মনে করি মানুষের জন্যেই টাকা। আমাদের এ ঝগড়া চিরদিন চলবে, কোনও দিনই এ মিটবে না। আমি নিজের চোখে দেখেছি, এই বাড়িতে দেনাদাররা একটা পয়সার জন্যে চোখের জলে ভেসেছে, তবু বাবার মন গলে না। কত লোক বাসন-কোসন-থালা-ঘড়া-বাটি-গাড়ু বেচে বাবাকে সুদের টাকা শোধ করে দিয়ে গেছে। সুদের একটা পয়সা রেহাই দেবার জন্যে বাবার হাতে-পায়ে ধরে তারা কান্নাকাটি করেছে, তবু বাবা তাঁর একটা পয়সা সুদও ছাড়েনি। এই যে-বাড়িটা তোমার শ্বশুরবাড়ি, এর প্রত্যেকটা ইঁটে গরীব প্রজাদের গরম রক্ত লেগে আছে, এটা মনে করে রেখে দিও। তোমার নিঃশ্বাসের সঙ্গে যে-হাওয়া তুমি এখন টানছো আর ছাড়ছো, সে-হাওয়াটা পর্যন্ত বিষাক্ত, এ-কথাটা মনে রেখে দিও। আর মজাটা এই যে, আমি সেই রক্ত-চোষা টাকা দিয়ে লেখাপড়া শিখেছি, বি-এ পাশ করেছি বা মানুষ হয়েছি—

বলে বোধহয় দম নেবার জন্যে বসন্ত একটু থামলো।

তারপর বললে, আমার যা বলবার তা বলা হয়ে গেছে, এবার তোমার যদি কিছু বলবার থাকে তো বলো।

অনিলা তবু কিছু বললে না। বসন্ত বললে—কই, তবু তুমি কিছু বলছো না যে? কিছু একটা বলো, একটা কিছু জবাব দাও?

অনিলা বললে, আমি কী বলবো?

বসন্ত বললে, কিছু যদি না বলবে তো শুয়ে পড়ো। সারাদিন তোমারও তো খুব খাটুনি গিয়েছে।

অনিলা তবু কী করবে বুঝতে পারছিল না। সারা গায়ে তখনও এক-গাদা গয়না রয়েছে। বসন্ত বললে, শোবার আগে ওই গয়নাগুলো আগে খোল। ওই গয়নাগুলো পরা নিয়ে আগে বাবার সঙ্গে আমার অনেক কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে। কিন্তু এখন তো আর ওগুলো কাউকে দেখাবার দরকার নেই। যাদের দেখাবার জন্যে ও-গুলো পরা তারা চলে গেছে। এখন খুলে ফেল।

অনিলা আস্তে-আস্তে একটা-একটা করে গয়না খুলতে লাগল। বসন্ত ঘরের

আলমারির পাল্লা দুটো চাবি দিয়ে খুলে দিলে। বললে, এর ভেতরে ওই কঙ্কালগুলো রাখো।
কঙ্কাল! কথাটা অনিলার এখনও মনে আছে। ওগুলো নাকি মানুষের কঙ্কাল!
অনিলাকে একটু দ্বিধা করতে দেখে বসন্ত বললে, ওই প্রত্যেকটা গয়না অন্য লোকেদের। ওগুলো অভাবের সময় তারা বাবার কাছে বাঁধা রেখেছিল, কিন্তু আর ছাড়িয়ে নেবার সুযোগ পায়নি। ওদের সঙ্গে তাদের অভিশাপ আর দীর্ঘশ্বাস জড়িয়ে আছে। তুমি যদি ওগুলো কখনও পরো, তা হলে সে অভিশাপ আর সেই দীর্ঘশ্বাস তোমার গায়েও লাগবে। যা বলছি, তুমি বুঝতে পারছো?
অনিলা মাথা নাড়লে। বললে, হ্যাঁ।
অনিলা নিঃশব্দে সব গয়নাগুলো বসন্তর হাতে দিলে। তারপর বসন্ত সেগুলো কোথায় রাখলে আবছা আলোয় তা আর দেখা গেল না।
তারপর আলমারিটা তালা বন্ধ করে দিয়ে বসন্ত বললে—এবার শুয়ে পড়ো, সারাদিন তোমার খাটুনি গেছে।
অনিলা আর কিছু না বলে বিছানার এককোণে গিয়ে জড়ো-সড়ো হয়ে শুয়ে পড়লো।

সুশীলা সেদিন আবার এল। বললে, কাল রাত্তিরে কিছু শব্দ শুনেছিলেন দিদি? খুব হৈ-চৈ শব্দ?
—কীসের শব্দ?
সুশীলা বললে, কাল একজন গুণ্ডা খুনীর ফাঁসি হয়ে গেল। সে খুব কান্নাকাটি করেছে। সবাই টের পেয়েছিল। আপনি টের পাননি?
অনিলা বললে, পেয়েছিলাম, কিন্তু কেন কীসের হৈ-চৈ হচ্ছে তা বুঝতে পারিনি। কী করেছিল সে? কেন ফাঁসি হলো তার?
—সে নিজের বউকে বিষ খাইয়ে মেরেছিল।
—বিষ?
সুশীলা বললে, হ্যাঁ, বিষ!
—কেন, তার বউ কী করেছিল?
সুশীলা বললে, তার বউটা বুঝি কোন্ পর-পুরুষের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল। আমি তো বলি দিদি সে বেশ করেছে খুন করেছে। বউটা যেমন পাজি, তেমনি শাস্তি হয়েছে। হবে না? কী বলুন দিদি, তোর এত কুট্‌কুটানি যে তুই নিজের সোয়ামীকে ছেড়ে, ছেলেমেয়েদের ছেড়ে পরের সঙ্গে পালালি?
সুশীলা আরো কত কী বলে গেল, কিন্তু অনিলা কোনও মন্তব্য করলে না।
কথাটা শোনবার পর থেকেই সে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। অনেক পুরনো কথা মনে পড়তে লাগলো তার। জীবনটা যে কেমন করে কোথা দিয়ে তার কেটে গেল তাই-ই সে কেবল ভাবতো। সব মানুষের জীবনই কি এমনি? সকলের জীবনেই কি এত অশান্তি? তারও তো ফাঁসি হয়ে যেতে পারতো! যদি ফাঁসি হতো

তা'হলে সেও কি অমনি করে ফাঁসির আগে ভয়ে কান্নাকাটি করতো? প্রাণের ভয়ে হৈ-চৈ করতো? কে জানে—হয়তো করতো? কিংবা হয়তো করতো না।
আসলে জজসাহেবের মনে বোধহয় তাকে দেখে একটু দয়া হয়েছিল। কী দেখে দয়া হয়েছিল। তার রূপ দেখে না তার বৈধব্য দেখে! বিধবা হওয়া কি লোকের কাছে করুণার পাত্রী হওয়া?

বিয়ের পর একবার বাপের বাড়ি যেতে হয়। মাসিমা তাকে খুব আদর করেছিল সেদিন। মা-ও অসুস্থ শরীর নিয়ে মেয়েকে দেখে খুব খুশী হয়েছিল। মাসি জিজ্ঞেস করেছিল, কী রে, তোর অত গয়না দেখে এলুম, সেগুলো কোথায়? সেগুলো পরে আসিসনি যে? সে-সব কোথায় গেল?
অনিলা কী আর বলবে। চুপ করে রইল।
শুধু বললে, উনি গয়না পরা মোটেই পছন্দ করেন না।
—ওমা, সে কি? মেয়েমানুষ গয়না পরবে না?
অনিলা বললে, উনি বলেন একদিনের জন্যে বাপের বাড়ি যাচ্ছো, অত গয়না পরার কী দরকার?
মা আড়ালে ডেকে নিয়ে একান্তে জিজ্ঞেস করলে, হ্যাঁরে, জামাই তোকে আদর করে?
অনিলা সে-কথার জবাব দেয়নি। মা বললেন, বল না, বল আমাকে। আমার জেনেও সুখ। জামাই আদর করে তো?
তবু কিছু জবাব দেয়নি অনিলা।
মা আবার বলেছিল, আমি আর বেশিদিন বাঁচবো না রে। যাবার আগে আমি জেনে যেতুম যে তুই সুখী হয়েছিস! তুই ছাড়া তো আমার আর কেউ নেই, কিছু নেই। জামাই তোকে ভালোবেসেছে জানতে পারলে আমি মরলেও সুখে মরবো। মা'র সামনে লজ্জা করতে নেই, বল মা আমাকে, বল তুই।
অনিলা মুখটা নিচু করে বললে, হ্যাঁ—
মা বললে, যাক্, বাঁচলুম মা, তোর কথা শুনে বাঁচলুম। এখন আমার মরতেও আর কোনও আপত্তি নেই। তুই ছিলি আমার গলার কাঁটা। তোর যখন একটা গতি হয়েছে তখন ভগবান আমার সাধ মিটিয়ে দিয়েছেন, আর আমার কোনও সাধ অপূর্ণ নেই।
তা ভালোই হয়েছে এখন মা বেঁচে নেই। বেঁচে থাকলে তাকে দেখে যেতে হতো যে তার মেয়ে এখন খুনের দায়ে জেল খাটছে। আর শুধু মা-ই বা কেন, মাসি আর মেসোমশাইও নেই যে তার বদনামে তাদের মুখ পুড়বে। তারা চলে যাবার আগে সবাই-ই জেনে গেছে যে, অনিলা ভালো পাত্রের হাতে পড়েছে।

মনে আছে, একদিন বসন্ত আর হেমন্ত বিশ্বাসের মধ্যে খুব ঝগড়া বেঁধে গেল অনিলা ভেতর বাড়িতে ছিল। দু'জনের কথাবার্তা কানে এল তার। শ্বশু হেমন্ত বিশ্বাস বললে, বউমা'র সব গয়নাগুলো তো তোমার কাছেই আছে !
বসন্ত বললে, আমার কাছে আপনার কোনও গয়না নেই !
—সে কি ? কী বলছো তুমি ? ফুলশয্যার দিন তো সব গয়নাই বউমার গা পরানো হয়েছিল, তারপর কোথায় গেল ?
—সে আপনার বউমাই জানে। সে-গয়নার কথা আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন আপনার বউমাকেই জিজ্ঞেস করুন।
—ঠিক আছে আমি বউমাকে জিজ্ঞেস করছি—বলে হেমন্ত বিশ্বাস ডাকতে লাগলো বউমা, বউমা এদিকে একবার এসো তো বউমা—
তখন মাত্র চারদিন হলো বিয়ে হয়েছে অনিলার। আর আগের দিন রাত্রে মা ফুলশয্যা হয়েছে। শ্বশুরের সামনে যেতে লজ্জা করছিল অনিলার। তব লজ্জার মাথা খেয়ে অনিলা মাথার ওপর লম্বা ঘোমটা তুলে দিয়ে দাঁড়ালো গি শ্বশুরের সামনে।
অনিলা যেতেই হেমন্ত বিশ্বাস জিজ্ঞেস করলে, হ্যাঁ বউমা, কাল যে গয়নাগুলে তোমাকে পরতে দিয়েছিলুম, সেগুলো কোথায় গেল ?
অনিলা মহা মুশকিলে পড়লো। কী জবাব দেবে বুঝতে না পেরে থর থর ক কাঁপতে লাগলো। এদিকে শ্বশুর দাঁড়িয়ে আর একদিকে স্বামী বসন্ত। যা বলে যে গয়নাগুলো সে স্বামীকে দিয়েছে, তাহ'লে শ্বশুর স্বামীকেই চে ধরবে।
শ্বশুর জিজ্ঞেস করলে, তুমি কি শুতে যাবার আগে গয়নাগুলো খুলে কোথা রেখেছিলে না গয়নাগুলো পরেই শুতে গিয়েছিলে ?
অনিলা থর-থর করে কাঁপতে কাঁপতেই বললে, আমার তো মনে পড়ছে না ঠিক—
শ্বশুর বললে, সে কি, এই তো কালকের রাতের ঘটনা, এরই মধ্যে ভুলে গেলে এত ভুলো মন কেন তোমার ? কিন্তু এত ভুলো মন হলে তো চলবে না বউমা একটু মনে করে দেখো সেগুলো কোথায় রেখেছ। ও-সব গয়নার তো হিসে রাখতে হবে আমাকে।
অনিলা এ-কথার জবাবে কিছুই বললে না। ঘোমটার আড়ালে শুধু মুখ ঢে কাঠের পুতুলের মত সামনে দাঁড়িয়ে রইল।
হেমন্ত বিশ্বাস তাকে লক্ষ্য করে আবার বলতে লাগলো, এ বাড়িতে তোমা শ্বাশুড়ি নেই। তার মানে তুমিই এ-বাড়ির গিন্নী হলে। এ-বাড়ির সব কিছু হিসেব এখন থেকে তোমাকেই রাখতে হবে। শুধু গয়নাই নয়, চাল-ডাল-তেল নুন-মশলা সব কিছুর হিসেব। আমি পুরুষমানুষ, আমি আমার মহাজনী ব্যবস নিয়ে সারা দিন-রাত ব্যস্ত থাকবো। বাড়ির ভেতরে অন্দর মহলে কী ঘটছে, ত

দেখবার-শোনবার সময় হবে না আমার। আর বসন্ত, তোমার স্বামী, ওর দ্বারা কিছুই হবে না। ওর ওপরে আমার কোনও ভরসাই নেই। ও শুধু লেখা-পড়া নিয়েই থেকেছে এতদিন। কোথা দিয়ে কেমন করে সংসার চলছে, কোথা থেকে টাকা আসছে, ও তার কিছুই খবর রাখে না। ও শুধু জানে বই আর বই। তোমাকে আমি গরীব ঘর থেকে তোমার রূপ দেখে এনেছি। তোমার কাজ ওই বসন্তকে তুমি সংসারী করে তুলবে, যাতে সংসারে ওর মন বসে সেই চেষ্টা করবে। তাই বলছি এত ভুলো মন হলে তোমার তো চলবে না বউমা। সব গয়নাগুলো কোথায় রাখলে মনে করতে চেষ্টা করো, আমি জানতে চাই।

অনিলা তেমনি মাথা নিচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

বসন্তও পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। হেমন্ত বিশ্বাস তার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে, কী রে, তুই চুপ করে দাঁড়িয়ে কী ভাবছিস? বউমা যখন তোর ঘরে ঢুকলো তখন তুইও তো সেখানে ছিলি, তুইও দেখিসনি বউমা গয়নাগুলো গায়ে পরে শুলো না খুলে শুলো? গয়না পরে যদি শুতো, তাহ'লে তো সকালবেলায়ও সেগুলো গায়ে পরা থাকতো। কিন্তু সেগুলো যখন গায়ে নেই তখন নিশ্চয়ই খুলে শুয়েছে। খুলে কোথায় রাখলো দেখিসনি তুই?

বসন্ত বললে, না, আমি দেখিনি।

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, তাহ'লে কি গয়নাগুলো উড়ে গেল ঘর থেকে? গয়না-গুলোর কি পাখা আছে যে ঘর থেকে উড়ে যাবে? না কি ঘরের ভেতরে চোর লুকিয়ে ছিল, সে চুরি করে নিয়ে পালিয়ে গেল?

তারপর একটু থেমে আবার বলতে লাগলো, তা উড়েই যাক আর চোরে চুরি করে নিয়েই যাক, ও গয়নাগুলো আমার চাই। এই তোকে আমি বলে রাখলুম। ও তোর শ্বশুরবাড়ির দেওয়া গয়না নয়। ও আমার বন্ধকী গয়না। দেনাদারদের গয়না। আমি তো ওই গয়না দিয়ে বউমাকে সাজিয়ে দিয়েছিলাম পাছে লোকে নিন্দে করে তাই। কিন্তু তাই বলে কি হারিয়ে যাবে? টাকা কি অত সস্তা? টাকা উপায় করতে গায়ের রক্ত জল হয় না?

হেমন্ত বিশ্বাস বোধহয় আরো অনেক কিছু বলতো। কিন্তু বাইরে থেকে কে একজন ডাকতে এল। কোনও দেনাদার হয়তো দেখা করতে এসেছে। তাকে বললে, বল্, বসতে, আমি যাচ্ছি।

লোকটা চলে গেল।

হেমন্ত বিশ্বাস যেতে যেতেও বললে, তোমাদের দু'জনকেই বলছি, ও গয়না আমার চাই। যেমন করে হোক ও-গয়না আমাকে ফিরিয়ে দিতেই হবে। আমার সব সম্পত্তি একদিন তোমরাই পাবে। আমি শ্মশানে নিয়ে যাবো না ও সব, আমি মরবার পর তখন তোমরা আমার টাকা উড়িয়েই দাও আর বেচেই দাও, কি দান করে দাও আমি তখন তা দেখতে আসছি না। কিন্তু এখন আমার জিনিস আমাকে ফিরিয়ে দেওয়া চাই—

বলে হেমন্ত বিশ্বাস আর দাঁড়াল না, সোজা আবার বাইরের দিকে চলে গেল। তার সকাল থেকে অনেক কাজ। তার কাছে অনেক লোক অনেক আর্জি নিয়ে আসে।

হেমন্ত বিশ্বাস বৈঠকখানায় যেতেই দেখলে একজন লোক বসে-বসে কাঁদছে।
হেমন্ত বিশ্বাস ঘরে যেতেই লোকটা তার পা জড়িয়ে ধরলো। হেমন্ত বিশ্বাস তাড়াতাড়ি ছাড়িয়ে নিয়ে বললে, কী রে, কাঁদছিস কেন রে ইসমাইল?
ইসমাইল বললে, হুজুর, আমার ছেলেটা মরো-মরো, কিছু টাকা দেন দয়া করে।
হেমন্ত বিশ্বাস বললে, টাকা নিতে এসেছিস তাই বল, তা কাঁদছিস কেন? ডাক্তার দেখালেই তো তোর ছেলে বেঁচে যাবে। তোর আগেকার টাকা এখনও শোধ হলো না, তার ওপর আবার টাকা? আগেকার টাকাগুলো আগে শোধ কর্।
ইসমাইল শেখ বললে, তা যদি শোধ করতে পারতুম, তাহ'লে কি আর আমার এত দুঃখু হুজুর!
হেমন্ত বিশ্বাস বললে—টাকার বুঝি আমার গাছ আছে ইসমাইল। কাল আমার ছেলের বৌভাত গেছে, কতগুলো টাকা আমার বেবাক নষ্ট হয়ে গেল বল দিকি! এই অবস্থায় আমি যদি তোদের টাকাগুলো না পাই, তাহ'লে আমার চলে কী করে তাই বল?
ইসমাইল শেখ তখন কাপড়ের খুঁট খুলে একটা রুপোর হাঁসুলি বার করে এগিয়ে দিতেই হেমন্ত বিশ্বাস হাঁসুলিটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে।
রেগে গিয়ে বললে, তুই রুপোর জিনিস দিচ্ছিস আমাকে? আমি রুপো বন্ধক রাখি? সোনা দিতে পারলি নে?
ইসমাইল শেখ বললে—আজ্ঞে এ-ছাড়া আমার আর কিছুই নেই যে।
—তাহ'লে তোর বলদ-জোড়া বাঁধা রাখ। কিংবা বলদ-জোড়া বেচে দে আমাকে।
—আজ্ঞে বলদ-জোড়া আছে বলেই তো চাষ-বাস করছি। বলদ-জোড়া বেচলে আমি খাবো কী?
হেমন্ত বিশ্বাস বললে, তা আগে খাওয়া না আগে মহাজনের দেনা শোধ করা? কোনটা বড়?
ইসমাইল কেঁদে-কেঁদে বললে, আজ্ঞে সব তো বুঝি, কিন্তু আপনি হলেন গাঁয়ের মাথা, আপনি যদি ক্ষ্যামা-ঘেন্না না করেন, তাহ'লে আমাদের মত গরীব লোকের বাঁচে কী করে?
হেমন্ত বিশ্বাস বললে—তোদের তো আমি বলেই দিয়েছি, আমি গরীবদের মহাজন নই, আমি বড়লোকের মহাজন।
—তাহ'লে আমরা গরীবরা যাবো কোথায় বলুন? আমরা কি তাহলে মরে যাবো?
হেমন্ত বিশ্বাস বললে—তোরা মর না। তোরা মরলে তো পৃথিবী একটু হাল্কা হয়। তোরা মরেও একটু উপকার করতে পারবি নি?
ইসমাইল শেখ একটু চুপ করে রইল। তারপর বললে, তাহ'লে কী করবো আপনি বলুন হুজুর।
—যা বললুম ওই বললুম। ওই-ই আমার শেষ কথা!
ইসমাইল শেখ চোখের জল মুছতে-মুছতে উঠে দাঁড়াল। তারপর আস্তে-আস্তে বাইরের রাস্তার দিকে পা বাড়ালো।

বসন্ত নিজের ঘরে ঢুকে জামা-কাপড় পরে কোথায় বাইরে যাচ্ছিল, অনিলা এসে পাশে দাঁড়ালো।

জিজ্ঞেস করলে, কোথায় যাচ্ছো ?

—একটা কাজ আছে আমার।

—কিন্তু বাবার সেই গয়নাগুলো কোথায় ?

—কেন, ও-কথা জিজ্ঞেস করছো কেন ? কাল রাত্তিরে তো দেখলে আমি কোথায় রাখলুম!

অনিলা বললে, সে কথাটা বাবার সামনে বলতে পারলে না!

—সে কথা তো বাবা তোমাকেই জিজ্ঞেস করলে। তখন তুমিই বা সেকথা বললে না কেন ?

—তোমার কথার ওপরে আমি কথা বলবো ? আমার ভয় হলো হয়তো তুমি তাতে রেগে যাবে।

—তোমার সঙ্গে মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার আলাপ, তাতেই আমাকে এত ভয় ? আমাকে কি সত্যিই তুমি ভয় পাও ?

অনিলা বললে, তোমার বাবা আমাকে গরীবের ঘর থেকে এনেছেন, আমি এ-বাড়িতে এসে রাজরাণী হয়েছি। কবে একদিন এই রাজত্ব চলে যাবে, তা তো বলা যায় না। তাই শুধু ভয় হয়—

—তুমি তো দেখলুম কাল রাতে খুব নাক ডাকিয়ে ঘুমোলে! ওটা কি ভয়ের লক্ষণ ?

অনিলা লজ্জায় পড়লো। বললে, আমায় ক্ষমা করো তুমি। ক-দিন খুব পরিশ্রম হোল তো!

—পরিশ্রম ? পরিশ্রমটা তোমার আবার কী হলো। তুমি তো গয়না পরে বেনারসী জড়িয়ে সেজে-গুজে কাটিয়েছ। তোমার আবার পরিশ্রমটা কী ?

অনিলা একটু থেমে রইল। প্রথমে কিছু জবাব দিতে পারলে না। তারপর মাথা নিচু করে বললে, মেয়েমানুষ হলে তুমি বুঝতে পারতে বিয়েতে মেয়েদের পরিশ্রম হয় কি-না!

বসন্ত বললে—মেয়েমানুষ না হয়েও বোঝা যায়!

অনিলা বললে, তাহ'লে তুমি বললে না কেন যে, গয়নাগুলো তুমিই রেখে দিয়েছ ?

বসন্ত বললে—গয়নার জন্যে দেখছি তোমারই বেশি মাথাব্যথা!

অনিলা বললে—মাথাব্যথা হওয়াই তো স্বাভাবিক। নইলে বাবার কাছে জবাবদিহি করতে তো হবে সেই আমাকেই। কারণ বাবা তো আমাকেই তার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছেন।

বসন্ত বললে—আসলে তা নয়, আসলে আমাকে সংসারী করবার জন্যেই তোমাকে

আনা হয়েছে। সেই জন্যেই তুমি আমাকে বলছো।
অনিলা বললে—কেউ কি কাউকে জোর করে সংসারী করতে পারে?
বসন্ত বললে—তুমি আমাকে তোমার রূপ দেখিয়ে সেই চেষ্টা করো না!
অনিলা গম্ভীর হয়ে গেল। বললে, তার চেয়ে গয়নাগুলো দিয়ে দাও, আমি বাবাকে দিয়ে দিই। বাবার কাছে দেওয়াই ভালো।
বসন্ত বোধহয় ব্যস্ত ছিল খুব। পকেট থেকে চাবি বার করে অনিলার দিকে এগিয়ে দিলে। বললে, এই নাও, গয়নাগুলো আলমারির ভেতরে রেখে দিয়েছি, সেগুলো নিয়ে বাবাকে দিতে পারো।
তারপর একটু থেমে বললে, কিন্তু একটা কথা জেনে রাখো, ওগুলো আমারও নয়, তোমারও নয়, এমন কি বাবারও নয়। ওগুলো আমাদেরই গ্রামের গরীব লোকদের রক্ত-জল-করা পয়সায় কেনা। ওগুলো গায়ে পরে তুমি স্বর্গে যাবে না।
বলে বাইরে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু অনিলা বললে, একটু দাঁড়াও—
বসন্ত ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, কী?
অনিলা বললে, এগুলো নিয়ে তবে যাও—
বলে আলমারি খুলে সব গয়নাগুলো স্বামীর হাতে দিলে।
বসন্ত বললে—এগুলো নিয়ে আমি কী করবো?
অনিলা বললে—যাঁর জিনিস তাঁকে দিও।
—এগুলো কার জিনিস?
অনিলা বললে—ওই যে তুমি বললে, যাদের জিনিস তাদের। গ্রামের যে-গরীব লোকদের রক্ত-জল-করা পয়সায় কেনা, তাদের।
বসন্ত গয়নাগুলো হাতে করে নিয়ে খানিকক্ষণ স্থানুর মত সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বললে, তুমি তো বলেই খালাস, কিন্তু জানো না, এগুলো বাবার বুকের এক-একখানা পাঁজরা। এই একটা পাঁজরার যদি হিসেব না মেলে তাহ'লে বাবা মুখে রক্ত উঠে মারা যাবে।
অনিলা বললে, তার মানে?
—তার মানে এগুলো হারিয়ে গেলে বাবাকে আর বাঁচানো যাবে না। এগুলো তোমাকে পরানো হয়েছিল একরাত্রির জন্যে। আর তুমি ছিলে একদিনের রাণী। এগুলো বাবাকে ফিরিয়ে দিলে আবার এগুলো বাবার সিন্দুকে গিয়ে জমবে!
—তা সিন্দুকে গিয়ে জমলে ক্ষতি কী?
বসন্ত বললে—ক্ষতি বাবার কিছুই নেই, ক্ষতি সেইসব লোকদের যাদের রক্ত দিয়ে কেনা ওই জিনিসগুলো। তুমি জানো কিনা জানি না, এই কুসুমগঞ্জে বেশির ভাগ লোকই গরীব। এদের যথা-সর্বস্ব ওই গয়নাগুলোই। দরকারে-অদরকারে ওগুলো কেমন এক কায়দায় একদিন বাবার কাছেই পিছলে চলে আসে, তারপরে আর তারা আসল মালিকের কাছে ফিরে যায় না।
অনিলা বললে, তবু এগুলো যখন এখন বাবার সম্পত্তি, তখন বাবার কাছেই এগুলো চলে যাওয়া উচিত।
বসন্ত বললে, আইনতঃ তাই-ই হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের দেশে অনেক বেআইনী কাজকেও আইনী বলে চালানো হয়। সেটা আমি মনে করি ভালো

নয়।
বসন্ত এর পরে আর দাঁড়ালো না। বললে, আমি এখন চলি—
বলে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে গেল।
বারবাড়ি থেকে হেমন্ত বিশ্বাস কাজের পর এসে ডাকলো, বউমা—
অনিলা মাথায় ঘোমটা দিয়ে দাঁড়ালো শ্বশুরের সামনে। হেমন্ত বিশ্বাস জিজ্ঞেস করলে, কী বউমা, খুঁজে পেলে?
অনিলা বললে—হ্যাঁ বাবা, পেয়েছি।
—কোথায় ছিল?
গয়নাগুলো হাতে পেয়ে হেমন্ত বিশ্বাসের মুখে যেন হাসি ফিরে এল। বললে, জানো বউমা, এর অনেক দাম। এইগুলো আছে বলেই এখনও আমার বুকে বল আছে। নইলে কবে মরে যেতুম। তা এগুলো কোথায় রেখেছিলে তুমি?
অনিলা বললে, আমি রাখিনি—
—তাহ'লে বসন্ত রেখেছিল বুঝি? ও এক অদ্ভুত ছেলে হয়েছে। আমার টাকা-পয়সার দিকে মোটে নজর নেই। তুমিই বলো, টাকা-পয়সা কি ফ্যালনা জিনিস? এই টাকা-পয়সা আছে বলেই তো এখনও আমার সংসার চলছে। তুমি তো গরীবের মেয়ে, গরীব হওয়ার দুঃখ-কষ্ট তুমি যেমন বুঝবে, বসন্ত তেমন বুঝবে না। তাই তো তোমাকে বউ করে এনেছি। তুমি একটু বসন্তকে বুঝিয়ে বলবে, বুঝলে? বলবে টাকা-পয়সার এত হ্যালা-ফ্যালা ভালো নয়। টাকা আছে বলেই সংসার চলছে, নইলে কবে সব কিছু উল্‌টে-পাল্‌টে যেত। বসন্ত কিছুছু বোঝে না। বরাবর কলকাতায় গিয়ে থেকেছে তো, আর আমিও ওকে মাসে মাসে মোটা টাকা পাঠিয়েছি। কাকে বলে টাকার অভাব তা ও জানে না। তাই ওকে আমি বলেছি, টাকাকে তুই এত হ্যালা-ফ্যালা করিস এটা ভালো নয়, তাহলে টাকাও একদিন তোকে হ্যালা-ফ্যালা করবে। টাকা হলো গিয়ে লক্ষ্মী। টাকাকে অত অবহেলা করলে লক্ষ্মীকেও অবহেলা করা হয়। কী বলো বউমা, আমি ঠিক কথা বলিনি?
অনিলা নতুন বউ। সে আর কী বলবে? সে শুধু শ্বশুরের কথাগুলো মন দিয়ে শুনেছিল।

বিয়ের কিছুদিন বাদেই অনিলা বুঝতে পেরেছিল যে তার স্বামী অন্য ধাতের মানুষ। হেমন্ত বিশ্বাস ছেলের সম্বন্ধে যা বলেছিল, তার এক বর্ণও মিথ্যে নয়।
একদিন অনেক রাত্রে বাড়ি এল বসন্ত। অনিলা জিজ্ঞেস করলে, এত রাত পর্যন্ত কোথায় ছিলে?
বসন্ত বললে—একটা কাজ ছিল।
অনিলা সে-জবাবে খুশী হয়নি। জিজ্ঞেস করেছিল, কী এত কাজ থাকে তোমার রোজ? কোথায় যাও তুমি?
বসন্ত বলেছিল—সে তুমি বুঝবে না।

অনিলা বলেছিল—তুমি যদি বুঝিয়ে বলো তো কেন বুঝবো না ?
বসন্ত বলেছিল—তোমাকে বোঝাবার মত এখন সময় নেই আমার।
অনিলা বলেছিল, আজ সময় না থাক কিন্তু অন্য কোনও দিন বুঝিয়ে বোলো। তোমার তো বাড়ি ফিরতে রোজই রাত হয়।
বসন্ত বলেছিল—আমার এমনি রোজই রাত হবে। পুরুষমানুষের কাজ থাকেই, তা বলে তোমার কাছে তার জবাবদিহি করতে হবে নাকি ?
অনিলা বলেছিল—না, বাবা জিজ্ঞেস করছিলেন তাই বলছি।
বসন্ত বলেছিল—বাবার কথায় কান দিও না। এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দিও।
অনিলা বলেছিল—তুমি সারাদিন বাড়ির বাইরে থাকো, তুমি বাবার কথা না শুনলেও পারো। কিন্তু আমাকে তো সারাদিন বাড়ি থাকতে হয়, আমি না শুনে কী করে থাকি বলো ?
বসন্ত বলেছিল—তুমি চুপ করে থাকবে।
অনিলা বলেছিল—বাবার কথায় চুপ করে থাকা যায় ?
বসন্ত বলেছিল—না চুপ করে থাকতে পারো তো বলবে তুমি জানো না।
অনিলা বলেছিল, নিজের স্বামীর ব্যাপার স্ত্রী হয়ে জানি না বললে, তিনি কী ভাববেন বলো তো। আমাকে তো বলেই দিয়েছেন তোমাকে সংসারী করবার জন্যেই আমাকে এ-বাড়িতে আনা।
বসন্ত বলেছিল, আমি বুঝি ছেলেমানুষ যে আমাকে তুমি সংসারী করবে ? সংসার কাকে বলে আমি কি তা জানি না ?
বসন্ত আবার বললে, আমি সংসার না করেও সংসারের সব বুঝি। বাবার কাছে যার নাম সংসার, আমার কাছে তা অত্যাচার।
—অত্যাচার ? অত্যাচার মানে ?
বসন্ত বলেছিল—বাবা চায় গাঁয়ের লোকদের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে তাদের শোষণ করতে। আমি জীবনে তা পারবো না। ওকেই যদি সংসার করা বলে তাহ'লে তুমি হাজার চেষ্টা করলেও আমাকে সে-রকম সংসারী করতে পারবে না।
অনিলা বলেছিল, তা যদি না পারবে তো আমাকে কেন বিয়ে করে এ-বাড়িতে আনলে ?
বসন্ত বলেছিল— গরীবদের অত্যাচার না করেও সংসার করা যায়।
অনিলা বলেছিল—তাহ'লে সেই রকম সংসারই তুমি করো না দেখি।
বসন্ত বলেছিল—তাহ'লে বলো এ-বাড়ি ছেড়ে তুমি আমার সঙ্গে অন্য কোথাও, অন্য কোনও বাড়িতে চলে যাবে ?
—আর বাবা ?
—বাবা তাঁর টাকা-পয়সা জমি-জমা নিয়ে এ-বাড়িতে থাকুন।
অনিলা বলেছিল, তাহ'লে এই বয়েসে কে তাঁকে দেখবে ? কে তাঁকে ঠিক সময়ে ভাত রান্না করে দেবে ?
বসন্ত বলেছিল—বাবার ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। তাঁর অনেক টাকা-কড়ি আছে, তিনি একটা মাইনে-করা লোক দিয়ে সব করিয়ে নেবেন।

—আর বাবার টাকা ?
—বাবার টাকার কথা বাবাই ভালো বুঝবেন।
অনিলা বলেছিল, কিন্তু তুমি তো চাকরিও করো না, ব্যবসাও করো না, তোমার চলবে কী করে ?
—ভাবছো তোমাকে ঠিকমত খাওয়াতে-পরাতে পারবো কিনা ?
অনিলা বলেছিল, তুমি কি চাকরি করবে ?
—সে আমি কি করবো না-করবো আমি বুঝবো। তুমি আমার সঙ্গে এ-বাড়ি ছেড়ে যেতে রাজি কিনা তাই বলো আগে।
অনিলা বলেছিল—তোমার সঙ্গে আমার যখন বিয়ে হয়েছে, তখন তুমি যেখানে যেতে বলবে আমি সেখানেই যাবো।
বসন্ত বলেছিল—ঠিক আছে, আমি তাহ'লে সেই ব্যবস্থাই করবো। মোট কথা আমার এ বাড়িতে থাকতে ঘেন্না করে!
অনিলা জিজ্ঞেস করেছিল, কেন বলো তো ? এ বাড়ি কী দোষ করলো ?
বসন্ত বলেছিল—সে তুমি মেয়েমানুষ, বুঝবে না। তুমি তো বাইরে বেরোও না। বাইরে বেরোলে বুঝতে পারবে বাবাকে কেউ দেখতে পারে কি না।
—দেখতে পারে না মানে ?
বসন্ত বলেছিল—তুমি জানো না, বাবাকে আশপাশের গ্রামের সব লোকই সুদখোর বলে গালাগালি দেয়। এই আমাদের যে বাড়ি দেখছো, এর সমস্ত কিছু সুদের টাকায় তৈরি। এর প্রত্যেকটা ইঁটে গরীব লোকদের রক্ত লেগে আছে।
—তা সুদ নেওয়া কি দোষের ?
বসন্ত বলেছিল—সুদ নেওয়া দোষের নয় তো কি সম্মানের ?
—শুনেছি ব্যাঙ্কও তো সুদ নেয়!
বসন্ত বলেছিল, তুমি ব্যাঙ্কের সঙ্গে বাবার তুলনা করছো ? ব্যাঙ্ক যে সুদ নেয়, বাবা নেয় তার হাজার গুণ! এ সুদ নেওয়া নয়, রক্ত চোষা। জমি-জমা, গয়না বাঁধা রেখে তারা অভাবের সময় টাকা নেয় বাবার কাছ থেকে। কিন্তু কোনও দিনই তারা সেই জমি-জমা গয়না ফেরত নিতে পারে না। এত চড়া সুদ বাবার ব্যবসায়। বাবার জন্যে যে কত লোক ধনে-প্রাণে ফতুর হয়ে গেছে, তার ঠিকানা নেই। তারা যদি কোনও দিন পারে তো বাবার মাথাটা কেটে ফেলতে পারে, এত তাদের রাগ বাবার ওপর।
কথা বেশি দূর এগোয়নি। তার মধ্যেই বসন্ত ঘুমিয়ে পড়েছিল। বড় ক্লান্ত থাকতো সে। মাঝে-মাঝে কয়েকদিন বাড়িতেই আসতো না। আবার হয়তো একদিন হুট্ করে হঠাৎ বাড়িতে এসে হাজির হতো।
অনিলা যথারীতি জিজ্ঞেস করতো, এতদিন কোথায় ছিলে ?
বসন্ত অন্যমনস্ক হয়ে জবাব দিত। বলতো, একটা কাজের চেষ্টা করছি কলকাতায়।
অনিলা মনে করতো বসন্ত এ-বাড়ি ছেড়ে অন্য কোনও আস্তানার ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত।
ছেলে বাড়ি এলে হেমন্ত বিশ্বাস জিজ্ঞেস করতো, এতদিন কোথায় ছিলি বাড়ি

ছেড়ে ?

বসন্ত বলতো, একটা কাজের চেষ্টা করছি।

হেমন্ত বিশ্বাস বলতো—কী কাজ ?

বসন্ত বলতো—যে-কোনও একটা কাজ। বিয়ে করেছি, কাজের চেষ্টা তো করতে হবে।

হেমন্ত বিশ্বাস বলতো—তার মানে ? তুমি কী রোজগার করে বউকে খাওয়াবে মতলব করছো ?

বসন্ত জবাব দিত না। হেমন্ত বিশ্বাস বলতো, ওসব বদ মতলব ছাড়ো। তোমাকে কোনও কাজের চেষ্টা করতে হবে না। আমি যে কাজ করছি, সেই কাজই বরং তুমি করো, এখন থেকে সে-কাজ শিখে নাও। আমার বয়েস হচ্ছে, একদিন তোমাকেই এ-কারবার করতে হবে। এখন থেকে এসব দেখে শুনে নাও তুমি।

বসন্ত বলতো, আমি কলকাতায় কাজের চেষ্টা করছি।

যেন আকাশ থেকে পড়তো হেমন্ত বিশ্বাস। বলতো, কলকাতায় ? কাজের চেষ্টা করছো ? তাহ'লে বউমা ? বউমাও কি কলকাতায় থাকবে ? তাহ'লে এখানকার আমার এত জমি-জমা-ক্ষেত-খামার, সম্পত্তি, এসব ? এসব কাকে দিয়ে যাবো ?

বসন্ত বলতো—তা আমি জানি না।

হেমন্ত বিশ্বাস বলতো—তাহ'লে এতদিন আমি এত সম্পত্তি কার জন্যে করেছি ? আমার নিজের জন্যে ? আমার একলার জন্যে ক'টা টাকার দরকার হয় ? তোমরা যাতে পুরুষানুক্রমে এই সম্পত্তি ভোগ করতে পারো সেই জন্যেই হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেছি। তা সেই তুমিই যদি এখানে না থাকো, তো আমি এতদিন কার জন্যে খাটলুম ?

কিন্তু এসব কথা বেশিক্ষণ বলার সুযোগ থাকতো না হেমন্ত বিশ্বাসের। কথা শেষ না হবার আগেই কেউ না কেউ এসে যেত, আর কথার মাঝখানে বাধা পড়তো। কাজ শেষ করে যখন সে আবার ছেলের সঙ্গে কথা বলতে আসতো তখন দেখতো বসন্ত নেই।

জিজ্ঞেস করতো, বসন্ত কোথায় গেল বউমা ?

অনিলা বলতো, তিনি তো নেই, এখুনি বেরিয়ে গেলেন।

—কখন ফিরে আসবে ?

অনিলা বলতো—তা তো বলে যায়নি বাবা!

এমনি করেই দিন কাটতো অনিলার। বিবাহিত জীবনের প্রথম দিকটা এই রকম ছিল। যখন নতুন বউ হয়ে এ-বাড়িতে এসেছিল সে তখন কত হিংসে করেছিল বাপের বাড়ির দেশের লোকেরা।

মাও বলেছিল, অনেক ভাগ্যি করলে অমন সোয়ামী-শ্বশুর পায় মা।

মাসিমা-মেসোমশাইও বলেছিল, অনিলার শ্বশুর-স্বামী ভাগ্যটা ভালো। একটা পয়সা লাগলো না অনিলার বিয়েতে, এমন তো দেখা যায় না।

কিন্তু যত দিন যেতে লাগলো, ততই অনিলা দেখলো যে এ এক অদ্ভুত বাড়ি। শ্বশুরের অগাধ টাকা, স্বামীও শিক্ষিত, বিদ্বান, রূপবান। কিন্তু বাপ-ছেলের মিল নেই মনের। স্বামী যে মাঝে-মাঝে কোথায় চলে যায় কে জানে। শুধু যাবার

সময় বলে যায় তার ফিরতে কয়েকদিন দেরি হবে।

এই রকম অবস্থাতেই একদিন সুমন্ত এল।

সুমন্ত! জেলখানার ভেতর তার কথা মনে পড়লেই অনিলার চোখ দু'টো জলে ভিজে আসতো। ছোটবেলায় ওই সুমন্ত কত দুষ্টু ছিল। হেমন্ত বিশ্বাস নাতির মুখ দেখলে একটা সোনার গিনি দিয়ে। যেন নিশ্চিন্ত হলো মনে-মনে। যখন হেমন্ত বিশ্বাস নিজের ঘরে কাজ করতে বসতো, তখন অনিলার কাছ থেকে তাকে নিয়ে যেত। বলতো, দাও বউমা, ওকে আমার কাছে দাও। ও আমার কাছে থাকলে দুষ্টুমি করবে না। বড় লক্ষ্মীছেলে আমার সুমন্ত।

হেমন্ত বিশ্বাস নাতির অন্নপ্রাশনে খুব ঘটা করলে। এলাহি ব্যবস্থা হলো বাড়িতে। অনিলার বিয়েতে যেমন ঘটা হয়েছিল তার চেয়েও বেশি। লোকে আশীর্বাদ করে গেল প্রাণ ভরে। যার যা সাধ্য তাই দিয়ে আশীর্বাদ করলে। কেউ দিলে রুপোর টাকা, কেউ দিলে খেলনা, কেউ দিলে রেকাবিতে করে মিষ্টি। গ্রামের সাধারণ সব লোক, কারোরই তেমন আর্থিক সামর্থ্য নেই। কিন্তু মহাজন বলে কথা। মহাজনের কাছে সকলেরই টিকি বাঁধা। আশীর্বাদী না দিলে মহাজন অখুশী হবে। বলবে, কই ঘোষের পো, তুমি আমার নাতির অন্নপ্রাশনে কিছু উপুড়-হস্ত করোনি, এক পেট খেয়ে গিয়ে এখন কান্নাকাটি করে হাতে পায়ে ধরতে এসেছ?

লোকে বলতো, সোন্দর হবে না? বাপ-মা যেমন সোন্দর, ছেলেও তো তেমনি হবে গো।

মা দেখতে পায়নি তার নাতিকে। ওই একটি দুঃখ ছিল অনিলার। মা'র নিজের জীবনে কোনও সাধই পূর্ণ হয়নি। অনিলার ছেলে দেখবার বড় সাধ ছিল মার। কিন্তু কপালে যার সুখ লেখা নেই, তার সুখ কোথা থেকে হবে!

বাড়িতে রান্নাবান্নার জন্যে হেমন্ত বিশ্বাস গোড়া থেকেই লোক রেখেছিল। এবার নাতিকে দেখবার জন্যে আর একটা লোক রাখলো।

হেমন্ত বিশ্বাস যখন তার কাজ-কারবারে ব্যস্ত থাকতো, তখন বাড়ির ভেতর সুমন্তর কান্না শুনলেই সব কাজকর্ম ফেলে দৌড়ে আসতো। বলতো, সুমন্ত কাঁদে কেন বউমা? ওকে কাঁদাচ্ছে কেন ভোলার মা?

ভোলার মা ভাল লোক, সুমন্তকে থামাতে হিমসিম খেয়ে যেত।

সেখানে যারা বসে থাকতো তারা সুমন্তকে দেখে খোসামোদ করে বলতো, কর্তা, এই নাতি আপনার মুখ উজ্জ্বল করবে।

কথাগুলো শুনে খুব খুশী হতো হেমন্ত বিশ্বাস। এমনও হয়েছে যে, নাতিকে প্রশংসা করায় কয়েকটা পয়সা সুদ মকুব করে দিয়েছে।

কথায় বলে টাকার চেয়ে সুদ মিষ্টি, হেমন্ত বিশ্বাসেরও তাই হয়েছিল।—ছেলের চেয়ে নাতি মিষ্টি। সেই নাতিকে নিয়েই দিন কাটতো তার। শুধু রাতটা ছাড়া সব সময়েই দাদুর কাছে থাকতো সে। অত ব্যস্ত মানুষ, তার কাজের ক্ষতি হলেও নাতিকে সব জায়গায় সঙ্গে নিয়ে যাওয়া চাই। হাটে যাবে, সঙ্গে হাত ধরে নিয়ে যাবে নাতিকে। বলবে, দাদু, তুমি আমাকে বেশি ভালোবাসো, না তোমার বাবাকে?

নাতি বললে, তোমাকে।

হেমন্ত বিশ্বাস সকলকে শুনিয়ে-শুনিয়ে বলতো, এই শোন, নাতি কী বলছে শোন, ও ওর বাবার চাইতে নাকি আমাকে বেশি ভালোবাসে!
লোকে বলতো, দেখতেও ঠিক আপনার মত হয়েছে কর্তাবাবু।
অনেকে বলতো, ওকেও কলকাতায় পাঠিয়ে দেবেন কর্তাবাবু, কুসুমগঞ্জে থাকলে ও আমাদের মত গোমুখ্যু হবে।
হেমন্ত বিশ্বাস বলতো, পাগল হয়েছ তোমরা, আমার খুব শিক্ষে হয়ে গিয়েছে বাপু, ওকে আর কলকাতায় পাঠাবো না। পাঠালেই বাপের মতন লক্ষ্মীছাড়া হয়ে যাবে। ওকে আমি ছোটবেলা থেকে আমার গদীতে বসাবো। ও হিসেব শিখুক, টাকা-আনা-পাই হিসেব করতে শিখলেই আমার কাজ চলে যাবে!
কিন্তু একেবারে লেখাপড়া না শিখলে চলে না। তাই হেমন্ত বিশ্বাস নিজেই হাতে ধরে নিয়ে গিয়ে গৌর মাষ্টারের হাতে তুলে দিয়ে বললে, একে অংকটা ভালো করে শিখিয়ে দিও মাষ্টার, যাতে বড় হয়ে হিসেবটা ভালো কষতে পারে। তার বেশী আমার দরকার নেই।
বড় আদরের নাতি সুমন্ত দাদুর কাছে মানুষ হতে লাগলো। হেমন্ত বিশ্বাস তাকে পাশে নিয়ে কাজ-কর্ম করে। নাতি জিজ্ঞেস করে, এগুলো কী দাদু?
হেমন্ত বিশ্বাস বলে, ওগুলো টাকা।
সুমন্ত তবু বুঝতে পারে না। জিজ্ঞেস করে, এগুলো দিয়ে কী হয় দাদু?
হেমন্ত বিশ্বাস বলে—এগুলো দিয়ে সব হয়। এ দিয়ে সব কিছু কেনা যায়।
—কী কেনা যায়?
হেমন্ত বিশ্বাস বলে—চাল কেনা যায়, ডাল কেনা যায়, কাপড় কেনা যায়, সোনা-রুপো-গয়না-বাড়ি-ঘর সব কিছু করা যায়। পৃথিবীর সবচেয়ে দামী জিনিস হলো এই টাকা!
নাতি বায়না ধরে। বলে, আমাকে একটা টাকা দাও না দাদু!
হেমন্ত বিশ্বাস বলে—খবরদার, ওতে হাত দিতে নেই। হারিয়ে যাবে! তখন আর কিছু কিনতে পারা যাবে না।
তাড়াতাড়ি ছড়ানো টাকাগুলো সামলায় হেমন্ত বিশ্বাস। ছোট ছেলেকে বিশ্বাস নেই।
তবু নাতি বায়না ধরে বলে, আমাকে একটা টাকা দাও দাদু।
হেমন্ত বিশ্বাস বলে—তুমি টাকা নিয়ে কী করবে?
সুমন্ত বলে—আমি একটা পিস্তল কিনবো!
পিস্তল! কথাটা শুনে সবাই ছেলেমানুষের বুদ্ধি দেখে অবাক হয়ে যায়। এইটুকুন ছেলের এত বুদ্ধি! খেলনা কিনবে না, খাবার কিনবে না, নারকোল নাড়ু কিনবে না, কিনবে কিনা পিস্তল!
সবাই জিজ্ঞেস করে, ও পিস্তলের নাম জানলে কী করে কর্তা?
হেমন্ত বিশ্বাস নিজেও অবাক। বললে, হাঁরে সুমন্ত, তুই পিস্তলের কথা জানলি কী করে রে? পিস্তল দিয়ে তুই কী করবি?
সুমন্ত বললে—আমি গুণ্ডাদের খুন করবো। পিস্তল দিয়ে মানুষ খুন করা যায়।
হেমন্ত বিশ্বাস জিজ্ঞেস করে, কে বললে তোকে পিস্তল দিয়ে মানুষ খুন করা যায়?

হেমন্ত বিশ্বাস বললে—বাবা।
হেমন্ত বিশ্বাসের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো! বসন্ত! বসন্ত পিস্তলের কথা বলেছে? সেই বা এসব কথা ছেলেকে বললে কেন?
এর পরে আর এ প্রসঙ্গ উঠলো না। টাকাকড়ি, দলিল-পত্র সব সিন্দুকের মধ্যে রেখে নাতির হাত ধরে হেমন্ত বিশ্বাস বাড়ির ভেতরে এল। ডাকলে, বউমা?
অনিলা রান্নাঘরে তখন রান্নায় ব্যস্ত ছিল। শ্বশুরের ডাক শুনে বাইরে এল। বউমা কাছে আসতেই হেমন্ত বিশ্বাস জিজ্ঞেস করলে, বসন্ত কোথায় বউমা?
—তিনি তো বাড়ি নেই, তিনি কলকাতায় গেছেন!
—অত ঘন-ঘন সে কলকাতায় যায় কেন? সেখানে ওর অত কী কাজ থাকে তা তোমাকে বলে না?
অনিলা চুপ করে রইল। তারপর বললে, আমি জানি না।
হেমন্ত বিশ্বাস বললে—তুমি যদি নাই জানবে, তাহলে তোমাকে বউ করে এনেছি কেন এ বাড়িতে? তোমার রূপ দেখেই তো তোমাকে বসন্তর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলুম, যাতে ও সংসারী হয়। যাতে ও তোমার বশ হয়। আমি তো তোমাদের কাছ থেকে একটা পয়সাও নিইনি। আমি নিজেই আমার গাঁটের পয়সা খরচ করে ছেলের বিয়ে দিয়েছি। কেউ বলতে পারবে না, আমি সুদখোর বলে ছেলের বিয়েতে টাকা নিয়েছি!
এ-সব কথা হেমন্ত বিশ্বাসের এই প্রথম নয়। এ-সব কথা আগেও অনেক বার শুনতে হয়েছে অনিলাকে। সময়ে অসময়ে অনিলাকে শ্বশুরের কাছ থেকে এ-সব কথা শুনতে হয়েছে। কিন্তু সে কী করবে? বসন্ত যদি তার কথা না শোনে তো সে কী করতে পারে? কতবার তো সে-কথা সে বসন্তকে শুনিয়েছে। কিন্তু নিজের বাবা যাকে বশ করতে পারলে না, তাকে বশ করবে অনিলা?
হেমন্ত বিশ্বাস বললে, বসন্তর কাছে পিস্তল আছে?
অনিলা অবাক হয়ে গেল শ্বশুরের কথা শুনে! পিস্তল! পিস্তলের কথা জানলে কী করে শ্বশুর। কিন্তু বললে, তা আমি কী করে জানবো!
—আর তোমার ছেলেই বা পিস্তলের কথা জানলে কী করে?
অনিলা অবাক হয়ে বললে, সুমন্ত? সে পিস্তলের কথা বলেছে?
—হ্যাঁ, তাই-তো বললে। আমার কাছে বসে কেবল টাকা চায়। টাকার ওপর তার খুব লোভ। টাকা দেখলেই কেবল চাইবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, টাকা নিয়ে কী করবি? তা কী বলে জানো? বলে পিস্তল কিনবে! আমি তো শুনে অবাক। শুধু আমি নই, আমার গদীতে যত লোক ছিল তারা সবাই অবাক। তখন জিজ্ঞেস করলাম 'পিস্তল দিয়ে কী করবি?' জবাবে বললে, 'মানুষ খুন করবো।' শুনছো কথা? সেই জন্যেই তো জিজ্ঞেস করছি তোমাকে বসন্ত কোথায়? তাকে পেলে একবার জিজ্ঞেস করতুম, পিস্তলের কথা সে ছেলেকে বললে কেন? আর পিস্তলের কথাই বা ওঠে কেন?
ভাগ্য ভালো যে বসন্ত সেদিন বাড়িতে এল না। তার পরদিনও এল না। তার পরদিনও না।
তারপর হঠাৎ একদিন বসন্ত বাড়ি এসে হাজির।

মাথার চুল উসকো-খুশকো। চেহারা দেখেই বোঝা গেল ক'দিন ধরে খাওয়া হয়নি। এসেই বললে, কিছু খেতে দাও আগে।
অনিলা তাড়াতাড়ি ভাত বেড়ে দিলে। বসন্ত বললে, না খেয়ে আর কিছু কথা বলবো না।
গোগ্রাসে সব ভাত খেয়ে নিলে বসন্ত। তারপর যেন একটু স্থির হলো।
অনিলা জিজ্ঞেস করলে, এতদিন কোথায় ছিলে? এ-রকম চেহারা কেন তোমার? চাকরি-বাকরির চেষ্টা করছিলে?
বসন্ত বললে—খোকা কেমন আছে?
—ভালো। সে তো বাবার কাছেই থাকে সারাদিন। নাতিকে নিয়েই তিনি মশগুল। তোমার পকেটে সেদিন পিস্তল দেখেছিল সুমন্ত, সে-কথা সে বাবাকে বলে দিয়েছে।
বসন্ত চমকে উঠলো। বললে, পিস্তল? পিস্তলের কথা সুমন্ত জানলে কী করে?
অনিলা বললে, বা-রে, সেবার তুমি যখন বাড়ি এসেছিলে তখন সুমন্ত তোমার জামার পকেটে হাত দিয়ে পিস্তল বার করেছিলো না? মনে নেই তোমার?
বসন্ত বললে, এই বয়েসেই বড় দুষ্টু হয়েছে আদর পেয়ে-পেয়ে। সব জিনিসে হাত দেয় কেন সে?
অনিলা বললে, তা তুমিই বা পকেটে পিস্তল রাখো কেন? পিস্তল দিয়ে তুমি কী কারো?
অনিলা বললে—আমি যাই-ই করি না কেন, তাতে তোমারই বা কী আর সুমন্তরই বা কী?
অনিলা বললে—সব কথায় তুমি অমন রেগে যাও কেন? আমি কিছু অন্যায় কথা বলেছি?
বসন্ত বললে—অন্যায় তো বলেছোই। আমি তো তোমাদের কোনও কথায় মাথা ঘামাই না। তুমি কী করছো, না করছো তা-তো আমি কখখনো জিজ্ঞেস করতে যাই না।
অনিলা বললে—তুমি আজকাল অত খিটখিটে হয়ে গেলে কেন, আগে তো এমন ছিলে না! তোমার শরীর খারাপ নাকি?
এতক্ষণ কী করে খবরটা হেমন্ত বিশ্বাসের কানে গেছে যে, বসন্ত বাড়ী এসেছে। সঙ্গে-সঙ্গে বাড়ীর ভেতরে চলে এসেছে সে। বললে এই যে, কখন এলে?
বসন্ত বললে, এই একটু আগে।
—কই, আমি তো সদর-ঘরেই বসেছিলুম, তোমাকে তো দেখতে পেলুম না।
বসন্ত বললে—আমি খিড়কী-পুকুরের দিক দিয়ে এসেছি, পাকা রাস্তা দিয়ে আসিনি।
সুমন্ত বাবাকে দেখতে পেয়ে খুব খুশী। এসেই একেবারে বাবাকে জড়িয়ে ধরেছে। বললে, বাবা তুমি কোথায় ছিলে এতদিন?
বসন্ত বললে, চুপ করো, আমি তোমার দাদুর সঙ্গে কথা বলছি।
সুমন্ত বললে, জানো বাবা, দাদুর অনেক টাকা আছে, সব টাকা সিন্দুকে লুকিয়ে রাখে!

বসন্ত বললে, বলছি, তুমি চুপ করো এখন।
কিন্তু সুমন্ত থামলো না। বলতে লাগলো, জানো বাবা টাকা দিয়ে সব কিছু কেনা যায়। দাদু বলেছে চাল কেনা যায়, ডাল কেনা যায়, কাপড় কেনা যায়, সোনা-রুপো-গয়না, বাড়ি-ঘর সব কিছু কেনা যায়। পৃথিবীর সব চেয়ে দামী জিনিস নাকি এই টাকা। হ্যাঁ বাবা, এই টাকা দিয়ে পিস্তল কেনা যায়?
যেন বোমা পড়লো সকলের মাথার ওপর।
হেমন্ত বিশ্বাস প্রথমেই নিস্তব্ধতা ভাঙলো, বললে, তোমার নাকি পিস্তল আছে? তোমার পকেটে নাকি পিস্তল থাকে?
বসন্ত বললে—তোমাকে কে বললে?
হেমন্ত বিশ্বাস বললে—যে-ই বলুক, আমি যে-কথা জিজ্ঞেস করছি, তার জবাব দাও। তোমার কাছে পিস্তল থাকে কিনা, তাই বলো।
বসন্ত বললে—শুধু পিস্তল কেন, দরকার হলে বন্দুকও রাখতে হয় কাছে। তাতে কী হয়েছে?
হেমন্ত বিশ্বাস বললে, কলকাতায় গিয়ে কলেজে পড়ে তোমার কি এই সব শিক্ষা হয়েছে?
বসন্ত বললে—কলেজে গিয়ে লেখাপড়া করে বি-এ পাশ করেছি আমি।
হেমন্ত বিশ্বাস বললে, তা তো জানি, কিন্তু কলেজের বাইরে? সেখানে তো শুনেছি আজকাল অনেক পার্টি-ফার্টি আছে, তুমি কি সব পার্টিতে মেশো নাকি?
বসন্ত বললে—কলকাতায় লক্ষ-লক্ষ লোক আছে, কারোর না কারুর সঙ্গে তো মিশতেই হবে। চুপ-চাপ হোটেলে তো আর বসে থাকা যায় না।
হেমন্ত বিশ্বাস বললে, কিন্তু পিস্তল-পার্টি ছাড়া কি আর কোনও মেশবার লোক নেই? রামকৃষ্ণ-মিশন কি গৌড়ীয় মঠও তো আছে কলকাতায়। থিয়েটারের ক্লাবও তো আছে কলকাতায়। তাছাড়া আরো কত কী আছে সেখানে তাদের সঙ্গে মিশতে পারো না?
বসন্ত বললে—যারা লেখাপড়া জানে, শিক্ষিত ভদ্র ছেলে তাদের সঙ্গেই আমার বরাবর মেলামেশা ছিল।
—যারা পিস্তলবাজি করে তারা কি শিক্ষিত-ভদ্র ছেলে? আর কোনও শিক্ষিত-ভদ্র ছেলেদের খুঁজে পেলে না?
বসন্ত বললে, যারা দেশের মানুষের কথা ভাবে, তাদের সঙ্গেই আমি মিশেছি।
—এখন কি তাদের সঙ্গে মিশতেই কলকাতায় যাও?
বসন্ত একটু চুপ করে থেকে তারপর বললে, এই কুসুমগঞ্জে কি মেশবার মত কোন লোক আছে? কার সঙ্গে এখানে মিশবো বলো?
হেমন্ত বিশ্বাস বললে, কেন, আমার ব্যবসায় তো আমাকে একটু সাহায্যও করতে পারো।
বসন্ত বললে—তোমার ব্যবসা আমার পছন্দ হয় না।
—কেন?
বসন্ত বললে—সে তো আমি অনেকবার বলেছি। অন্য লোকের দুরাবস্থার সুযোগ নিয়ে নিজের পেট ভরানোটা তো ভালো কাজ নয়।

হেমন্ত বিশ্বাস বললে—কিন্তু আমি না থাকলে কে তাদের বিপদের দিনে দেখতো
বসন্ত বললে—যে-দেশে তুমি নেই, সে-দেশের লোকেরা কি বেঁচে নেই ?
হেমন্ত বিশ্বাস বললে—আমি কি একলাই মহাজনী কারবার করি ? পৃথিবীর অন দেশে কি আর কোনও মহাজন নেই ?
বসন্ত বললে, এই সব তর্ক আমি তোমার সঙ্গে এখন করতে চাই না।
হেমন্ত বিশ্বাস বললে, মানে তুমি মনে করো মহাজনী কারবার করা পাপ ?
বসন্ত বললে—হ্যাঁ পাপই তো। ব্যাঙ্কও মহাজনী কারবার করে, তারাও সুদ নিয়ে টাকা খাটায়, কিন্তু তোমার মত গরীবদের রক্ত চুষে খায় না। এমন করে চাষীদের সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে তাদের পথে বসায় না। তোমার মত তাদের গলাও তারা কাটে না।
হেমন্ত বিশ্বাস বললে—কলকাতায় গিয়ে তুমি এই সব কথা শিখে এসেছ ? এই সব শেখবার জন্যে আমি তোমাকে কলকাতায় পাঠিয়েছিলুম ?
বসন্ত বলেছিল, কলকাতায় না গিয়েও এসব কথা শেখা যায়। এ শিখতে গেলে কলকাতায় যেতে হয় না কাউকে। আমি ছোটবেলা থেকে তোমার কাছে থেকে নিজের চোখে দেখেছি। তোমার কাছে এসে টাকা ধার নিয়ে কত লোক শেষকালে ধার শোধ করতে না পেরে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে, তা-ও আমার নিজের চোখে দেখা। বরং কলকাতায় না গিয়ে এখানে থাকলে আরো বেশি দেখতে পেতুম।
হেমন্ত বিশ্বাস বলেছিল, তা আমি আমার হক্‌কের সুদ ফেরত চাইব না ? তুমি কি বলতে চাও আমি আমার দেনাদারদের সব সুদ মকুব করে দেব ? টাকা উপায় করতে বুঝি আমাকে কষ্ট করতে হয়নি, আমার মাথায় ঘাম পায়ে ফেলতে হয়নি ? আমার কি টাকার গাছ আছে ?
এ-কথার হয়তো শেষ হত না, কিংবা এ-তর্ক হয়ত আরো অনেকক্ষণ ধরে চলতো, কিন্তু ওদিকে আবার আর একজন কে বাইরে থেকে ডাকলে—বিশ্বাসমশাই বাড়ি আছেন ?
হেমন্ত বিশ্বাস আর দাঁড়ালো না। হয়তো কোনও দেনদার সুদ দিতে এসেছে। কিংবা হয়ত টাকা ধার নিতে এসেছে।
অনিলা বললে, এ কি, তুমি না খেয়েই উঠে পড়লে যে ?
বসন্ত বললে, আমার আর ক্ষিধে নেই।
বলে উঠে দাঁড়াতেই অনিলা বললে, এই রকম না খেয়ে-খেয়েই তোমার শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে।
ততক্ষণে কুয়োর কাছে গিয়ে বসন্ত এঁটো হাত ধুয়ে ফেলেছে।
অনিলা জিজ্ঞেস করলে, কলকাতায় কিছু কাজের বন্দোবস্ত করতে পারলে ?
বসন্ত বললে, চেষ্টা তো করে যাচ্ছি, কিন্তু এখনও কিছু বন্দোবস্ত করতে পারিনি। করতে পারলেই আমি তোমাকে সেখানে নিয়ে যাবো।
অনিলা বললে—কেন, এখানে এই কুসুমগঞ্জে তো আমার কোনও কষ্ট হয় না। আর শুনেছি তো কলকাতায় অনেক কষ্ট।
—কীসের কষ্ট ?
—সেখানে বাড়ি ভাড়াই তোমার অনেক পড়ে যাবে। এখানে বাবা আছেন, তাই

কিছু বুঝতে পারছি না। তাছাড়া সেখানে ভোলার মা'র মত লোক কোথায় পাবে?
বসন্ত বললে, জীবনে একটু কষ্ট করা ভালো। পৃথিবীতে কত মানুষ কত কষ্ট করে সংসার চালায়, তা যদি তুমি জানতে! অনেকে দু'বেলা পেট ভরে খেতে পায় না। তা শুধু কলকাতাই বা কেন, এখানে এই কুসুমগঞ্জে গরীব লোক নেই ভেবেছ? তুমি বাড়ির মধ্যে থাকো তাই বুঝতে পারো না। একটু মুচিপাড়া কি গোয়ালা-পাড়ার দিকে গেলেই টের পাওয়া যায়। থালা-বাসন বিক্রি করে তারা চাল কিনে খাচ্ছে এখন।
অনিলা বললে, সে তো দেখতে পাই রোজ। বাবার কাছে এসে বাড়ির বাসন-কোসন বিক্রি করে যায় রোজ। কিন্তু তার জন্যে কি বাবা দায়ী?
বসন্ত বললে, বাবা দায়ী নয় তো কে দায়ী? তুমি কি মনে কর তারা কখনও আর ওই সব বাসন-কোসন বাবার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিতে পারবে! ওই যে আমাদের বাগানটা। যে-বাগানের আম-কাঁঠাল আমি-তুমি খাই, ওটা আগে কাদের ছিল জানো? গয়লাপাড়ার ঘোষেদের। ওদের অবস্থা যখন খারাপ হলো তখন বাবার কাছে বাগানটা বন্ধক রেখেছিল! কিন্তু তারপর কি আর ও-বাগান ছাড়িয়ে নিতে পেরেছে? বাবা ওই গাছ বেচে বছরে কত টাকা পায় তা জানো?
—না। কত টাকা?
—সাত হাজার টাকা! বাবা কোন পরিশ্রম না করে ওই একটা বাগান থেকে বছরে সাত হাজার টাকা আয় করে। এই রকম পাঁচটা বাগান আছে বাবার। এক-একটা বাগান কিনেছিল গড়ে পঞ্চাশ টাকা দামে।
অনিলা কথাগুলো শুনছিল। বসন্ত থামতেই বললে, তা ও-সব তো বাবা আমাদের জন্যেই করে যাচ্ছেন। একদিন তো আমরাই ও-সব কিছুর মালিক হবো। ও-সব তা আর বাবার সঙ্গে যাবে না।
বসন্ত বললে, তুমি ও-সব বুঝবে না। পাপের পয়সা যে পায় তারও পাপ হয়!
অনিলা বললে—পাপ বলছো কেন? ও ব্যবসা তো অনেকেই করে।
বসন্ত বললে—যারা অন্যায় করে, তার জন্যে তাদের শাস্তি পাওয়া উচিত!
অনিলা বললে—সে শাস্তি যদি পেতেই হয় তো, ভগবান নিজেই তাকে সে-শাস্তি দেবেন। কত লোকই তো আছে, যারা পাপ করেও জীবনটা সুখে-শান্তিতে কাটিয়ে দেয়।
বসন্ত বললে, ভগবান নিজের হাতে তো শাস্তি দেন না। ভগবান শাস্তি দেবার জন্যে কিছু লোক পাঠিয়ে দেন পৃথিবীতে! তারাই পাপীকে শাস্তি দেয়।
তারপর একটু থেমে বললে, আর পাপ করেও জীবনটা সুখে কাটিয়ে দেবার কথা বলছো? সুখ কাকে বলে তার মানেটা আগে বলে দাও। খাওয়া-পরার সুখটাই কি সুখ? তাহ'লে বাবা রোজ রাত্তিরে আর বিকেলে আফিম খায় কেন?
অনিলা সত্যিই শ্বশুরকে নিজের হাতে রোজ আফিমের গুলি দিয়ে আসতো। আফিমের সঙ্গে দুধও গরম করে দিত। আফিমের গুলিটা মুখে দিয়েই হেমন্ত বিশ্বাস গরম দুধটা চুমুক দিয়ে খেত।
বসন্ত বললে, পাপ শুধু বাবার একলার নয় অনিলা, তুমি জানো না বাবার ওই টাকায় আমি লেখাপড়া শিখেছি, বি-এ পাশ করেছি তুমি নিজেও সেই পাপের

টাকায় এ-বাড়ির বউ হয়ে সুখ ভোগ করছো, এতে তোমারও পাপ হচ্ছে, আমারও পাপ হচ্ছে। তখন অনিলা এ-সব কথা ভালো করে বুঝতো না। অথচ বসন্ত বার-বার করে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করতো।
অনিলা বলতো, তুমি যদি এতই বোঝো তাহ'লে কেন আমাকে বিয়ে করলে?
বসন্ত বললে, বিয়ে করেছি তো কী হয়েছে, আমরা তো এ-বাড়িতে বেশিদিন থাকবো না। বেশিদিন পাপের ছোঁয়াচ তোমার গায়ে লাগতে দেব না। যতদিন নিজের একটা স্বাধীন উপার্জন না হয়, ততদিন তুমি একটু সহ্য করো।
সত্যিই, বসন্ত নিজে কিছু করবার জন্যে যে আপ্রাণ চেষ্টা করতো, তা বুঝতে পারতো অনিলা। তাই কেবল ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতো—ঠাকুর, ও'র একটা কিছু করে দাও তুমি তাহলে ও-ও বাঁচে, আমিও বাঁচি।

সুশীলা যখন বললে তার খালাস হবার হুকুম হয়েছে, তখন প্রথমে তার বিশ্বাস করতেই ইচ্ছে হয়নি। চোদ্দ বছর তাকে একটানা জেল খাটতে হবে এইটেই তার ধারণা ছিল। চোদ্দটা বছর কি কম? চোদ্দ বছর মানেই তো সারা জীবন!
প্রথম দিকে খুবই কষ্ট হতো সুমন্তর জন্যে! হেমন্ত বিশ্বাসের ছেলে বসন্ত বিশ্বাস, আর বসন্ত বিশ্বাসের ছেলে সুমন্ত বিশ্বাস। নাতির নামটা হেমন্ত বিশ্বাসই রেখেছিল। হেমন্ত বিশ্বাস বলেছিল, জানো বউমা, অনেক টাকা খরচ করেছিলাম বসন্তকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করবার জন্যে! বসন্তটা মানুষ হলো না, এখন দেখি সুমন্ত যদি মানুষ হয়।
একদিন অনেক রাত্রে বসন্ত হঠাৎ বাড়িতে এসে হাজির। কোথা দিয়ে কেমন ভাবে সে বাড়িতে ঢুকলো তা অনিলা বুঝতে পারলে না।
জিজ্ঞেস করলে, তুমি?
বসন্ত বললে—কেন, আসতে নেই?
অনিলা বললে—না, তা বলছি না। কিন্তু এই অসময়ে তো তুমি আসো না এত রাত্তিরে কী করে তুমি বাড়ি ঢুকলে? কে দরজা খুলে দিলে?
বসন্ত বললে—কেউ দরজা খুলে দেয়নি, আমি উঠোনের পাঁচিল টপকে ঢুকেছি। কেউ জানতে পারেনি। আমার ভীষণ দরকার তোমার সঙ্গে। কিছু টাকা চাই। আমাকে কিছু টাকা দিতে পারো?
—টাকা?
বসন্ত বললে, হ্যাঁ টাকা, শ'দুয়েক টাকা হলেই এখনকার মত চলে যাবে আমার।
ততক্ষণে অনিলা ঘরের আলোটা জেলে দিয়েছে। সুমন্তর তখন বয়েস কম। সে তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছিল অনিলার পাশে। কিন্তু আলো জ্বলে উঠতেও তার ঘুম ভাঙলো না।
বসন্ত বললে—আলোটা নিবিয়ে দাও, খোকা জেগে উঠবে।
অনিলা আলোটা নিভিয়ে জিজ্ঞেস করলে, তুমি কি টাকা চাইতেই এসেছো?
বসন্ত বললে—হ্যাঁ, টাকাটা নিয়েই আবার চলে যাবো।

—কোথায় যাবে ?

—সে কথা জেনে তোমার কী লাভ ?

অনিলা বললে, তুমি জানো না যে আমার কাছে টাকা থাকে না ? টাকা কি বাবা আমার হাতে কখনও দেন ? বিয়ের সময় যে-সব গয়না পরতে দিয়েছিলেন সেগুলো পর্যন্ত তিনি কেড়ে নিয়ে নিজের কাছে রেখেছেন। সে সব কথা তুমি তো জানো।

বসন্ত বললে—তাহলে আর কী হবে ! আমি তাহ'লে যাই।

—তুমি চলে যাবে ?

—হ্যাঁ।

অনিলা বললে, তুমি যদি বাড়িতেই না থাকবে তাহলে বিয়ে করেছিলে কেন আমাকে ? এমন বিয়ে কি না করলে চলতো না ?

বসন্ত বললে, আমি কী করবো বলো ? সব কিছুর জন্যেই তো আমার বাবা দায়ী।

অনিলা বললে—তোমার বাবার দোষের জন্য আমি ভুগবো কেন সেটা বলতে পারো ? আমি তোমার কাছে কী এমন দোষ করেছি যে, সারা জীবন আমাকে এমনি করে জ্বলে পুড়ে মরতে হবে। •

বসন্ত বললে—তোমার তো খাওয়া-পরার কোনও কষ্ট নেই এখানে !

অনিলা বললে, খাওয়া-পরার কষ্টের জন্যেই কি লোকে বিয়ে করে ?

বসন্ত বললে—তোমার বাপের বাড়িতে তো তোমার খাওয়া-পরার কষ্টও ছিল ! সে কষ্টটাই কি কিছু কম ?

অনিলা রেগে উঠলো। বললে, দেখ বাজে বাজে কথা বোল না। আমার রূপ দেখে তোমার বাবা আমাকে এ-বাড়িতে বউ করে এনেছেন. তুমি যাতে সংসারী হও সেইটেই তাঁর ইচ্ছে ছিল। কেন তুমি এই রকম পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবে, কেন তুমি সংসারী হবে না ? কেবল বাইরে-বাইরে পড়ে থাকো কেন ? কী তোমার কাজ এত বাইরে ?

বসন্ত বললে, সে-সব কথার কৈফিয়ৎ কি তোমাকে দিতে হবে নাকি এখন ?

অনিলা বললে, হ্যাঁ, দিতে হবে। আমি অনেক সহ্য করেছি এতদিন, অনেকদিন সব মুখ বুজে সহ্য করেছি, কিন্তু এখন আর সহ্য করবো না। এখন তোমাকে বলতেই হবে তুমি কী নিয়ে এত ব্যস্ত থাকো, কলকাতায় তোমার কী এত কাজ ?

বসন্ত বললে—অত চেঁচিও না, অত চেঁচালে আমি কিন্তু এখানে যাও আসতুম তাও আর আসবো না।

অনিলা বললে, তুমি কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ ?

বসন্ত বললে—শুধু তোমাকে নয়, বাবাকেও ভয় দেখিয়েছি এতদিন। আমাকে তোমরা কেউ-ই এতদিন চিনতে পারলে না। আমার পকেটে রিভলবার আছে তা জানো তো ?

অনিলা বললে, কেন, আমাকে তুমি খুন করবে নাকি ? ভেবেছো আমি ছোট্ট খুকি যে, রিভলবারের কথা শুনে আমি ভয় পাবো ?

বসন্ত আর দাঁড়াতে চাইলে না। যেদিক দিয়ে এসেছিল সেই দিকেই চলে যাচ্ছিল। অনিলা সামনে গিয়ে তার পথ আটকে দাঁড়ালো।

বললে, কোথায় যাচ্ছো ?

বসন্ত বললে—যেখানেই যাই না, তোমার কী ?
অনিলা বললে, আমি তাহলে চেঁচাবো। তাতে বাবার ঘুম ভেঙে যাবে। তিনি সব জানতে পারবেন।
বসন্ত বললে—ছাড়ো, পথ ছাড়ো আগে, তারপর যত পারো চেঁচিও—আমি বারণ করতে আসবো না।
অনিলা বললে, না, আমি কিছুতেই তোমাকে চলে যেতে দেব না। দেখি তুমি কী করে চলে যাও।
বসন্ত বললে, কিন্তু আমাকে যেতেই হবে। আমার জন্যে সবাই অপেক্ষা করছে :
—কে তারা ? কারা তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে ?
বসন্ত বললে—তারা আমাদের দলের লোক।
—কীসের দল ?
বসন্ত বললে—সে তুমি বুঝবে না।
অনিলা বললে, আমি যদি কিছুই না বুঝি তাহলে তোমার বউ হয়েছিলুম কেন : আমাকে বুঝিয়ে দিলেই আমি বুঝবো।
—তুমি একটু আস্তে আস্তে কথা বলো। বাবার ঘুম ভেঙে গেলে তখন খুব মুশকিল হবে।
অনিলা বললে, বাবা আফিম খেয়ে শুয়েছেন। অত সহজে তাঁর ঘুম ভাঙবে না তুমি বলো, আমি শুনি। কোথায় যাও তুমি, কী করো, আজকে সব আমাকে বলতে হবে। কেন তোমার পকেটে রিভলবার থাকে ? তোমার কীসের দল দলের কী কাজ ? আর এত টাকারই বা কীসের দরকার তোমার ? আর এত টাকারই যদি তোমার দরকার তো বাবার কাছে তা চাইলেই পারো। বাবার তো টাকার অভাব নেই।
বসন্ত বললে, বাবার টাকা আমি নেব না বলেই তো তোমার কাছে টাকা চাইছি।
অনিলা বললে, আমার টাকাও তো বাবারই টাকা। আমার কি আলাদা কোন আ আছে ?
বসন্ত বললে—তোমার সংসার-খরচের টাকা থেকেও যদি কিছু দিতে।
অনিলা বললে, সংসার-খরচের জন্যে কি বাবা আমাকে কিছু টাকা আলাদা দেন তুমি কি জানো না যে বাবার কাছে টাকাই হচ্ছে সর্বস্ব। কিছু কেনবার দরকা হলে বাবা সেটা কিনে দেন। তেল নুন থেকে আরম্ভ করে আমার শাড়ি খোকা জামা সবই বাবা নিজের হাতে কিনে দেন। টাকা কি কখনও বাবা কাউকে দেন ?
বসন্ত বললে, তা তোমার নিজের গয়না-টয়না কিছু নেই ?
অনিলা অন্ধকারের মধ্যেই একটা করুণ হাসি হাসলো। বললে, তুমি সব জেনে না-জানার ভান করছো ? এই দেখ—বলে ঘরের আলোটা আবার জ্বালালো বললে, এই দেখ, আমার গলা দেখ, আমার দু'টো হাত দেখ, কিছু গয়না দেখা পাচ্ছো ? কোনও গয়না আমার নিজের বলে আছে ? লোকে জানে মস্ত বড় ঘরে বউ আমি। কিন্তু তোমাকেও কী বলে দিতে হবে, কেন সধবা মানুষ হয়েও আম গলায়, আমার হাতে কোন গয়না নেই। এই এয়োতীর চিহ্ন একজোড়া শাঁখা ছা হাত দু'টোও আমার খালি। কেন খালি তুমি জানো না ? ইচ্ছে হলেও সমস্ত

আমি একটা খেলনাও কিনে দিতে পারি না কেন, তা তুমি জানো না? কিংবা হয়ত সব কিছু জেনেও আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছো?

বসন্ত বললে, আমি অনেক আশা করে এসেছিলুম। যখন টাকা পেলুম না তখন আর এখানে থেকে মিছিমিছি কী করবো, আমি চলি—

—না যেও না, দাঁড়াও!

বসন্ত ফিরে দাঁড়ালো। অনিলা কী বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ কী যে একটা দেখে থমকে দাঁড়ালো। বললে, একি, তোমার জামার পেছনে রক্তের দাগ কেন?

বলে বসন্তর জামায় হাত দিতেই তার নিজের হাতের আঙুলগুলো লাল হয়ে গেল। বললে, এ কি, এত রক্ত কোথা থেকে এল? তুমি কী কোথাও পড়ে গিয়েছিলে?

বসন্ত তাড়াতাড়ি জামাটা টেনে ধরেছে। টেনে ধরতেই এক থাবড়া রক্ত অনিলার গায়ে এসে লাগলো। সেই রক্তের ছিটে লেগে তার শাড়িটাও দাগী হয়ে গেল। রক্ত দেখে তার হাতটাও শিথিল হয়ে এল। আর সেই ফাঁকে বসন্তও এক লাফে যেখান দিয়ে যেমন করে এসেছিল. তেমনি করে পালিয়ে গেল। পালিয়ে যেতে গিয়ে গরুর গোয়ালের টিনের চালের ওপর একটা ভারী জিনিস পড়ার শব্দের মত শব্দ হলো। তাতে রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙে চুরে খান্ খান্ হয়ে গেল।

—কে?—কে?—কে?

ওদিক থেকে হেমন্ত বিশ্বাসের গলার আওয়াজ এসে পড়লো।

—বউমা, বউমা, ওটা কীসের শব্দ হলো যেন?

অনিলা পাথরের মতন চুপ করে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল সেখানে।

হেমন্ত বিশ্বাসের সন্দেহ-শক্তি বড় প্রবল। অনেক সোনা-দানা-রুপো-টাকা-আনা-পাই গচ্ছিত আছে তার বাড়িতে। আফিম খেলেও একটু শব্দতেই তার ঘুম ভেঙে যায়। ঘুমের ঘোরেই শব্দটা কানে গিয়েছিল তার। বাড়ির সব ঘরগুলো হাতড়াতে-হাতড়াতে একেবারে অনিলার ঘরের সামনে এসে হাজির হলো।

—বউমা, ঝপাং করে কীসের একটা শব্দ হলো না?

অনিলা কোনও জবাব দিলে না সে-কথার।

হেমন্ত বিশ্বাস আরো কাছে এগিয়ে এল।

—কী হলো বউমা, তুমি এ-রকম এখানে এত রাত্তিরে দাঁড়িয়ে আছো কেন? শব্দটা কীসের?

তারপর হঠাৎ বউমার শাড়িটার ওপর নজর পড়লো।

বললে, একি, তোমার শাড়িতে এত রক্ত লাগলো কীসের? কী হয়েছিল? পড়ে গিয়েছিলে?

অনিলা নিজেকে সামলে নিলে।

বললে, হ্যাঁ।

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, কী করে পড়ে গেলে? কুয়োতলায় যেতে গিয়ে পা পিছলে গিয়েছিলো বুঝি?

অনিলা আবার বললে, হ্যাঁ।

—তাহ'লে মলম লাগাচ্ছো না কেন?

অনিলা কিছু জবাব দিলে না।

হেমন্ত বিশ্বাস আবার জিজ্ঞেস করলে, সে হারামজাদা কোথায় ? সেই বসন্ত হারামজাদা ? সে বাড়ি নেই বুঝি ?
অনিলা বললে, না।
হেমন্ত বিশ্বাস বললে, কোথায় যায় বলতো সে হারামজাদা ? ভেবেছিলুম, বিয়ের পর একটু সেয়ানা হবে। তোমাকেও তো বলেছিলুম তাকে একটু সংসারী করে তুলতে। তাও তুমি পারলে না ?
তারপর একটু হেসে হেমন্ত বিশ্বাস আবার বলতে লাগলো—সবই আমার কপাল, জানো বউমা, আমারই কপাল! একটা মাত্তোর ছেলে, সেটাও মানুষ হলো না। এবার যখন বাড়িতে আসবে, আমাকে খবর দিও তো! আমি হারামজাদাকে কড়কে দেব। বিয়ে করেছে, ছেলে হয়েছে। এখনও মতি-গতি বদলানো না, এ তো ভালো কথা নয়। এত ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম, কী বলবো তোমাকে। আমার তো মনে হলো বাড়িতে ডাকাত পড়লো বুঝি!
তারপর যখন বুঝলো যে ডাকাত পড়েনি, তখন যেন একটু নিশ্চিন্ত হলো হেমন্ত বিশ্বাস। বললে, খুব সাবধানে থাকবে বউমা, বুঝলে, দিনকাল বড় খারাপ! খুব সাবধানে থাকবে। লোকে বলছিল কলকাতায় নাকি নকশালরা খুব খুন-খারাপি শুরু হয়েছে। এত বয়েস হলো কখনও এমন কথা তো শুনিনি—ওরা কী করছে জানো? ধরে-ধরে সব বড়লোকদের নাকি খুন করছে! বুঝলে বউমা, বড়লোকরা কী এমন দোষ করেছে? টাকা উপায় করে বলেই কী তাদের খুন করতে হবে? টাকা উপায় করা কি দোষের? তুমিই বলো বউমা?
অনিলা কোনও কথা বললে না।
হেমন্ত বিশ্বাস আবার বলতে লাগলো—তুমি যে কিছু বলছো না বউমা?
অনিলার মুখ দিয়ে এতক্ষণে কথা বেরোল। বললে—আমি কি বলবো?
হেমন্ত বিশ্বাস বললে, না-না, তা বলছি না! সত্যিই তো, তুমি মেয়েমানুষ, তুমি বাড়ির মধ্যে থাকো, তুমি কী করে খবর রাখবে? কিন্তু আমাকে তো বাইরের লোকের সঙ্গে মিশতে হয়। শুনলাম নকশালরা নাকি কলকাতায় তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে তুলেছে। তারা বড়লোক দেখলেই নাকি তাকে খুন করছে, জানো? কেন রে বাবা বড়লোকরা তোদের কী দোষ করলো? মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দু'টো বেশি টাকা উপায় করেছে বলে? তা ক্ষমতা থাকে তো তোরাও টাকা উপায় কর না! কে তোদের মানা করছে?
হেমন্ত বিশ্বাস মনে-মনে খুব দুঃখ পেত! একটা মাত্র ছেলে ওই ছেলের জন্ম দিয়েই গৃহিণী চলে গেছেন, ভালোই হয়েছে। নইলে ছেলের ব্যবহার দেখে তিনিও মনে কষ্ট পেতেন। ভগবান যা করেন তা বোধহয় মঙ্গলের জন্যেই।

কিন্তু হঠাৎ একদিন এই সময়ে একটা দুর্ঘটনা ঘটলো। বড় মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। সেদিনও যথারীতি হেমন্ত বিশ্বাস ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে নদীতে গিয়ে স্নান সেরে বাড়ি এসেছে। যতক্ষণ স্নান করেছে ততক্ষণ গঙ্গাস্তোত্র আবৃত্তি করেছে। তারপর একটা পাথর বাটিতে করে দু'টি মুড়ি খেয়ে জলযোগ করেছে। তারপর যথারীতি চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে দৈনন্দিন কাজ-কর্ম মানে তার নিজস্ব বন্ধকী কারবার করেছে। তারপর বেলা একটা নাগাদ ভেতর বাড়িতে এসে ডেকেছে—বউমা।

বউমা মানে অনিলা! অনিলা ওই সময় শ্বশুরের ডাক শুনলেই বুঝতে পারতো যে শ্বশুরের ভাত বেড়ে দিতে হবে। বুঝতে পারতো শ্বশুরের খাওয়ার সময় হয়েছে। হেমন্ত বিশ্বাসকে ভাত বেড়ে দিত অনিলা।

খাওয়ার সময় শ্বশুরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, কখন কী চাই তাও বুঝে নিতে হবে। বার-বার জিজ্ঞেস করতে হবে আর দু'টি ভাত চাই কিনা। শুধু ভাত নয়, ডাল, ভাজা, কী আর কিছুরও দরকার হতে পারে। সবই তদারক করতে হবে বউমাকে।

তারপর খেয়ে উঠে হেমন্ত বিশ্বাস কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেবে যে-ঘরটায় তার সিন্দুক থাকে। সেই সিন্দুকটাই তার প্রাণের প্রাণ! তার ভেতরেই হেমন্ত বিশ্বাসের প্রাণ-পাখীটা রাখা আছে। আর সেই সিন্দুকের চাবিটা তার ট্যাঁকের ঘুনসীতে লটকানো থাকে।

সেদিনও তাই করেছে হেমন্ত বিশ্বাস। ঘুম থেকে উঠে সেদিনও ডেকেছে—বউমা। বউমা জানে ও-ডাকটা আফিমের ডাক। ওই সময়ে আফিম খাবার দরকার হয় হেমন্ত বিশ্বাসের নিজস্ব আফিমের কৌটো আছে একটা। তাতে আফিমের গুলি পাকিয়ে রাখা আছে ঠিক মাপের মত করে। একটু ঊনিশ-বিশ হবার উপায় নেই। তারপর আফিমের ড্যালাটা অনিলা হেমন্ত বিশ্বাসের হাতে দেবে। আফিমের ড্যালাটা মুখে দেবার সঙ্গে-সঙ্গে দুধ চাই। ক্ষীর করা দুধ। গাঢ় দুধে ভর্তি বাটিটা নেবার জন্যে হাত বাড়াবে হেমন্ত বিশ্বাস। আফিম খাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই দুধ চাই—এইটেই নিয়ম।

তা অনিলা সেদিনও তার অন্য হাতে মজুত রেখে দিয়েছিল অন্য দিনের মত। দুধটা খেয়ে হেমন্ত বিশ্বাস বিকেল বেলা আবার চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে বসবে। তখন আসবে দেনাদারেরা তখন, আসবে পাওনাদারেরা! তখন সকলের সঙ্গে লেন-দেন, হিসেব-নিকেশ হবে।

তারপর যখন রাত গভীর হবে, অর্থাৎ রাত সাড়ে ন'টা কি দশটা বাজবে, তখন ভেতর-বাড়িতে এসে ডাকবে—বউমা!

অর্থাৎ তখন খাবার দিতে হবে শ্বশুরকে। অনিলা তৈরীই থাকে। সেই সময়ে আবার সেই একই রকম। সেই একই রকম ভাবে অনিলা শ্বশুরের খাওয়ার সময় দাঁড়িয়ে থাকবে। আর তারপর খাবার খেয়ে যখন নিজের ঘরে বিছানায় গিয়ে বসবে, তখন অনিলা আফিমের ড্যালাটা নিয়ে তার হাতে তুলে দেবে। আর এক

হাতে থাকবে গরম দুধের বাটি।
সেদিনও তার কোনও ব্যতিক্রম হয়নি।
আফিম আর দুধ খেয়ে হেমন্ত বিশ্বাস বিছানায় শুয়ে পড়েছিল। শোবার আগে ঘরের দরজা-জানালা সব বন্ধ করে দিয়েছিল! কিন্তু যখন শেষ রাত, তখন হঠাৎ বাইরে থেকে কে যেন ধাক্কা দিচ্ছিল।
—কে? কে?
হেমন্ত বিশ্বাসের মনে হয়েছিল বোধহয় বাড়িতে ডাকাত পড়েছে।
আবার জিজ্ঞেস করলে, কে? কে? কারা দরজা ঠেলছে?
কিন্তু অত-ভাববার সময় নেই তখন হেমন্ত বিশ্বাসের। তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলতেই চোখে পড়লো সামনেই দু'চারজন পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। হেমন্ত জিজ্ঞেস করলে, কী ব্যাপার দারোগাবাবু?
দারোগাবাবু গম্ভীর গলায় বললে, আপনার ছেলের নাম বসন্ত বিশ্বাস?
হেমন্ত বিশ্বাস বললে, হ্যাঁ, কিন্তু কেন?
দারোগাবাবু বললে, আপনার ছেলে মারা গেছে।
—মারা গেছে?
অনিলার মাথায় যেন হঠাৎ বিনামেঘে বজ্রপাত হলো।
হেমন্ত বিশ্বাস আবার জিজ্ঞেস করলে, কী করে বসন্ত মারা গেল?
—পুলিশের গুলিতে!
হেমন্ত বিশ্বাস জিজ্ঞেস করলে পুলিশের গুলিতে? কেন, কী করেছিল সে?
মানুষের জীবনে কখন যে কেমন করে হঠাৎ একদিন বিপদ ঘনিয়ে আসে, আর এসে একেবারে বিপর্যয় ঘটিয়ে দেয়, তা কেউ বলতে পারে না। যে-ছেলের ওপর হেমন্ত বিশ্বাসের এত ভরসা ছিল সেই ছেলেই যে একদিন অপঘাতে মারা যাবে তা, কে কল্পনা করতে পেরেছিল?
সতিাই, তারপর জানা গেল কলকাতায় যাবার পর থেকেই বসন্ত এমন একটা দলে পড়ে গিয়েছিল যাদের পুলিশি ভাষায় বলা হতো নকশাল। শেষবারের মত আর তাকে দেখেনি অনিলা। যা কিছু করবার শ্বশুর হেমন্ত বিশ্বাসই করেছিল ঝাড়গ্রামে গিয়ে। কোন এক জঙ্গলের মধ্যে তাদের দলের সঙ্গে পুলিশের দলের গুলি চালাচালি হয়েছিল। আর তাতেই একটা আচমকা গুলি খেয়ে বসন্ত প্রাণ দিয়েছিল।

আট বছর! এই আট বছরে অনেক কিছুই ঘটে গিয়েছিল অনিলার জীবনে। বসন্তর মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে যদি এ-কাহিনী শেষ হয়ে যেত. তো তাহ'লে অনিলার শেষ জীবনটা এমন করে জেলখানায় কাটতো না।
বোধহয় আগের জন্মে অনেক পাপ করেছিল অনিলা। নইলে সে বিধবাই বা হবে কেন, আর তার ছেলেই বা অমন হবে কেন? আর শ্বশুর হেমন্ত বিশ্বাসই বা শেষ জীবনে অমন কাণ্ড করবে কেন?

হেমন্তর যত বয়েস বাড়তে লাগলো ততই যেন সে কেমন বদলে যেতে লাগলো। মায়ের সঙ্গে কথায় কথায় ঝগড়া করতো। অনিলা জিজ্ঞেস করতো—কোথায় থাকিস তুই সারাদিন ?
সুমন্ত বলতো, সব কাজের জবাবদিহি করতে হবে তোমার কাছে ?
অনিলা বলতো, তা সারাদিন আমি ভাত নিয়ে বসে রইলুম, তুই খেলি না, আমার ভাবনা হয় না ?
সুমন্ত বলতো, আমার কী নিজের কাজ থাকতে নেই তা বলে ? তুমি নিজে খেয়ে নিলেই পারতে !
অনিলা বলতো, তুই যদি মা হতিস, তাহ'লে বুঝতিস ছেলের জন্যে মায়ের ভাবনা হয় কি না !
কথা কাটাকাটির আওয়াজ কানে যেতেই হেমন্ত বিশ্বাস চন্ডীমন্ডপ ছেড়ে ভেতর বাড়িতে আসতো। বলতো, কী হয়েছে বউমা ? এত চেঁচামেচি কিসের ?
অনিলা বলতো, এই দেখুন না বাবা, আপনার নাতির কান্ড। সারাদিন কোথায় কী রাজকার্য নিয়ে আছে, আমি জিজ্ঞেস করেছি, তাই ছেলে একেবারে রেগে চীৎকার করছে। এদিকে আমার যে সারাদিন খাওয়া হলো না, তা একবার ভাবছে না।
হেমন্ত বিশ্বাস নাতির দিকে ফিরে বললে, কোথায় গিয়েছিলি রে ?
সুমন্ত বললে, আমার নিজের কাজে।
হেমন্ত বিশ্বাস বললে, নিজের কাজ মানে ? তোর আবার নিজের কাজ কি ? লেখা-পড়া তো সিকেয় উঠেছে। তিনবার ফেল করে ক্লাশেও উঠতে পারলি না। তা লেখা-পড়া না হলো না হলো ! তোর বাবা তো লেখা-পড়া শিখে আমার মাথা একেবারে কিনে নিয়েছিল। তা লেখা-পড়া সকলের হয় না, কিন্তু ভাতটা সময় করে খেয়ে নিয়ে গেলে তো গেরস্থের উপকার হয়। সেটাও কী তোর দ্বারা হবে না ?
সুমন্ত বললে, আমার খাওয়া হোক আর না হোক, মা খেয়ে নিতে পারে না ?
হেমন্ত বিশ্বাস বললে, তুই দেখছি তোর বাবার ধাঁচ পেয়েছিস ! ওরে হারামজাদা, এই যে তুই জামা-কাপড় পরে আছিস, এই যে-বাড়িতে তুই আছিস, এসব কোত্থেকে হলো তার খবর রাখিস তুই ? আমি যদি মুখের রক্ত উঠিয়ে টাকা উপায় না করতুম তো তুই এইরকম করে দিনরাত আড্ডা দিয়ে বেড়াতে পারতিস ?
সুমন্ত এ-কথার কোনও জবাব না দিয়ে চুপ করে রইল।
হেমন্ত বিশ্বাস কিন্তু ছাড়বার পাত্র নয়। বললে, কিরে আমার জবাব দিচ্ছিস নে যে ? এমনি আড্ডা দিয়ে বেড়াতে পারতিস ?
এবার আর সুমন্ত সেখানে দাঁড়ালো না। হেমন্ত বিশ্বাসের কথার জবাব না দিয়ে সোজা নিজের ঘরের দিকে চলে যাচ্ছিল।
কিন্তু হেমন্ত বিশ্বাস টপ করে সুমন্তর একখানা হাত ধরে ফেললে।
বললে, যাচ্ছিস কোথায় ? কথার জবাব না দিয়ে যাচ্ছিস কোথায় ? আমার কথাগুলো কি কানে যাচ্ছে না তোর ?
সুমন্ত বললে, আমি কি বলবো ?

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, কেন, আমি বুড়োমানুষ বলে কী আমার কথার কোনও দাম নেই? তা আমি কী একটা মানুষ নই?

সুমন্ত বললে, তুমি আমার হাত ছাড়ো!

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, না, হাত ছাড়বো না। তুই কি করতে পারিস? আমার জবাব না দিয়ে তুই কোথাও যেতে পারবি না। আমি অনেক সহ্য করেছি। এখন থেকে আর সহ্য করবো না।

অনিলা শ্বশুরের সামনে এসে বললে বাবা, আপনি যান, আপনি নিজের কাজে যান, মিছিমিছি রাগ করলে আপনার শরীর খারাপ হয়ে যাবে!

হেমন্ত বিশ্বাস বললে—মিছিমিছি মানে? আমি বসন্তর বেলায় কিছু বলিনি। ভেবেছি বিয়ে হলে একদিন আপনি-আপনিই শুনবে। তার ফল তো দেখেছি। এখন সুমন্তর বেলায় আর তা হতে দিতে চাই না।

অনিলা বললে, কিন্তু আপনার শরীর খারাপ হবে যে!

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, শরীর আমার এমনিতেই ভেবে-ভেবে খারাপ হয়ে আছে। এরপর আবার কী খারাপ হবে?

তারপর সুমন্তর দিকে চেয়ে বললে, কিরে জবাব দিবি না আমার কথার?

সুমন্ত বললে, না।

—আবার মুখের ওপর 'না' বলা? বলেই হেমন্ত বিশ্বাস নাতির গালের ওপর ঠাস করে একটা চড় মারলে।

বললে, আমার মুখের ওপর 'না' বলছে। এ তো বড় বেয়াড়া ছেলে হয়েছে তোমার বউমা! যা দেখতে পারিনা, তাই-ই হয়েছে। সবই আমার কপাল বউমা, সবই আমার কপাল!

সুমন্ত তখন হেমন্ত বিশ্বাসের চড় খেয়ে কাঁদছে! দু'হাতে চোখ-মুখ ঢেকে কাঁদছে! হেমন্ত বিশ্বাস বলে উঠলো, থাম-থাম বলছি। নিজে অন্যায় করে আবার কাঁদছে! কাঁদতে লজ্জা করে না? এত বড় ধাড়ি ছেলে হলো, ঠাকুর্দার মুখের ওপর কথা! মুখ তোল্ তুই—দেখি।

সুমন্তর হাত দু'টো টেনে মুখটা দেখলে হেমন্ত বিশ্বাস।

বললে, আর কখনও মুখের ওপর কথা বলবি?

সুমন্ত চোখ দু'টো বুঁজিয়ে রইল।

—কিরে, কথা বলছিস নে যে! এ ঠিক বাপের ধারা পেয়েছে, ওর বাপও ঠিক এমনি ছিল। একগুঁয়ের একশেষ!

এতক্ষণে ছেলের কান্না দেখে অনিলা এসে আবার সামনে দাঁড়ালো।

বললে, বাবা, ওকে ছেড়ে দিন, ও আর করবে না। আপনার কাজের ক্ষতি হচ্ছে। কত লোক বসে আছে চণ্ডীমণ্ডপে।

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, থাকুক বসে। নিজের ছেলেও আমার কথা শোনেনি। তা সে বেটা জাহান্নামে গেছে, আমার হাড় জুড়িয়েছে। একটা মাত্তোর নাতি, সেও কিনা বাপের মতন বখে গেল। তাহ'লে কার জন্যে এত সম্পত্তি করছি! নাতিটাও কী মনের মত হতে নেই! আমি ভগবানের কাছে কত পাপ করেছিলুম, যে আমাকে আজকে এই শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে।

তারপর বললে, যাক্ গে, যা আছে কপালে তাই-ই হবে—

বলতে-বলতে হেমন্ত বিশ্বাস চণ্ডীমণ্ডপের দিকে চলে গেল।
সুমন্ত তখন দাঁড়িয়ে। অনিলা ছেলের কাছে গিয়ে বললে—কেন অমন করিস বল তো? দাদুর সঙ্গে কী ওই রকম করে কথা বলতে আছে? তোর জন্যেই তো ওই বুড়ো মানুষটা খেটে-খেটে এত সম্পত্তি করেছেন। উনি তো আর টাকা-কড়ি সঙ্গে নিয়ে যাবেন না। একদিন তো সব তোরই হবে! তুই নিজের ভালোটা একবার বুঝতে শিখলি না? এই বাড়ি, এই জমি-জমা, ক্ষেত-খামার তো সব একদিন তোরই হবে, ওঁনাকে চটাতে আছে?
সুমন্ত বললে, আমি এ-সম্পত্তি চাই না।
অনিলা অবাক হয়ে গেল ছেলের কথা শুনে। ছেলে বলে কী? নিজের ভালোটাও নিজে বোঝে না!
অনিলা বললে, সম্পত্তি চাস না মানে?
সুমন্ত বললে, ওসব দাদুর পাপের টাকা।
অনিলা চমকে উঠলো ছেলের কথা শুনে। ঠিক এই ধরনের কথা নিজের স্বামীর মুখেও বারবার শুনে এসেছিল সে। এসব কথা সুমন্তকে কে শেখালে? তার মনের ভেতরে একটা পরিচিত আতঙ্ক আবার সাপের মত ফণা তুললো।
বললে, এসব কথা তোকে কে শেখালে!
সুমন্ত বললে, আমাকে শেখাতে হবে কেন? একথা তো সবাই জানে, সবাই বলাবলি করে একথা আমাকে পাড়ার সবাই বলে সুদখোরের নাতি।
অনিলা বললে, লোকের কথায় তুই কান দিস নে বাবা। আমার কথা যদি একটু ভাবিস। মাথার ওপরে তোর বাবাও নেই, তুমি যদি আবার তোর বাবার মত করিস তাহ'লে আমি কী করবো বল? আমি কোথায় দাঁড়াবো? কে আমায় দেখবে? আমি কার ভরসায় বেঁচে থাকবো? তুই ছাড়া আমার আর কে আছে পৃথিবীতে বল্? নিজের বাপের বাড়ি বলতে লোকের একটা যাবার জায়গা থাকে, আমার তা-ও নেই। তুই-ই আমার বল্-ভরসা বলতে যা কিছু। এখন তুই-ই যদি আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করিস, তাহ'লে আমি কার মুখ চেয়ে বাঁচবো বলতে পারিস? তোর কথা ভেবে-ভেবে আমি সারাদিন কিছু মুখে দিতে পারিনি, আমার সারাদিন উপোস করে কাটছে, তা জানিস?
সুমন্ত বললে, তা তুমি যখন দেখলে আমার বাড়ি ফিরতে দেরি হচ্ছে, তখন তুমি নিজে খেয়ে নিলেই পারতে!
অনিলা বললে, তুই পেটের ছেলে হয়ে আজ আমাকে এই কথা বললি? তুই খাসনি, আর আমি তোর মা হয়ে খাবো?
বলে ছেলের সামনেই ঝর-ঝর করে কাঁদতে লাগলো।
সুমন্ত আর দাঁড়ালো না। নিজের ঘরের দিকে চলতে চলতে-বলল, যা দু'চক্ষে দেখতে পারি না, তাই-ই হয়েছে। তুমি কী ভেবেছ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তোমার ওই মড়া-কান্না দেখলেই আমার চলবে? আমার অন্য আর কোনও কাজ-কর্ম নেই?
—ওরে খোকা, শোন্, খোকা শোন্—
সুমন্তও বোধহয় ঠিক তার বাপের ধারা পেয়েছিল। সে মায়ের ডাকে সাড়া না দিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে দরজাটা দড়াম্ করে শব্দ করে ভেতর থেকে খিল দিয়ে দিল।

এই-ই ছিল অনিলার সাংসারিক জীবন। বড়লোক শ্বশুর-বাড়িতে বউ হয়ে যখন সে গিয়েছিল, তখন পাড়ার লোক, গাঁয়ের লোক তাকে কত হিংসে করেছিল। সবাই বলেছিল—অনিলা আগের জন্মে অনেক পুণ্য করেছিল, তাই এমন রাজরাণী হতে পারলো!

রাজরাণী! হ্যাঁ, রাজরাণীই বটে! রাজরাণী হয়েছিল বলেই আজ তাকে এমন করে জেল খাটতে হচ্ছে।

সুশীলা সেদিন একটা মাছভাজা নিয়ে লুকিয়ে এনে দিলে।

বললে, আপনি এই মাছভাজাটা খান দিদি!

অনিলা অবাক হয়ে গেল! বললে, তুমি আবার আমার জন্যে মাছভাজা আনতে গেলে কেন সুশীলা! আমি কী মাছভাজা খাই?

সুশীলা বললে, অনেক বলে-কয়ে তবে ওটা এনেছি আপনার জন্যে আপনি আর ক'টা দিন পরেই তো চলে যাচ্ছেন, তখন বাড়িতে গিয়ে অনেক ভালো-ভালো খাবার খাবেন।

অনিলা বললে, কিন্তু আমি যে বিধবা সুশীলা, আমায় কী মাছ খেতে আছে?

সুশীলা প্রথমটায় একটু লজ্জায় পড়লো। তারপর বললে, তাহ'লে কালকে আমি আপনার জন্যে রসগোল্লা এনে দেব!

অনিলা বললে, রসগোল্লায় আমার দরকার নেই, কিন্তু তোমাদের এখানে জেলের ভেতরে রসগোল্লাও পাওয়া যায় নাকি?

সুশীলা বললে, সব পাওয়া যায়, শুধু মুখ ফুটে বলুন না কী চাই আপনার? এখানে যাদের মদের নেশা, তাদের জন্যে মদও আসে।

—পয়সা কে দেয়?

—পয়সা বাড়ির লোক, যারা কয়েদীর সঙ্গে দেখা করতে আসে তারাই লুকিয়ে দিয়ে যায় আপনার বাড়িতে কে আছে বলুন, আমি এখুনি সেই বাড়ির লোকদের কাছ থেকে টাকা-পয়সা আনিয়ে নেবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। বলুন না, বাড়িতে কে-কে আছে?

অনিলা কী করে জানবে এখন বাড়িতে কে আছে। সুমন্তর যখন ষোল বছর বয়েস তখন সে বাড়ি থেকে চলে এসেছে। আর সেই যে এসেছে, তারপর থেকে আর কেউই কখনও তার সঙ্গে জেলখানায় দেখা করতে আসেনি। এই আট বছরের মধ্যে সুমন্ত একবার খবর নিতেও আসেনি যে মা কেমন আছে, কিংবা বেঁচে আছে কিনা?

অথচ সুমন্তর জন্যে অনিলা কি-ই-না করেছে। ছেলের জন্য সমস্ত মায়েরাই এমন করে। কিন্তু সব মায়েরা কী অনিলার মত জেল খাটে?

মনে আছে, যেদিন বসন্ত বিশ্বাসের মৃতদেহটা বাড়িতে আনা হয়েছিল, তখন বাড়ির

সামনে গ্রামসুদ্ধ লোকের ভিড় হয়েছিল। তখন ওই সুমন্ত ছোট। বাইরে তখন মানুষের ভিড়ে পা রাখবার জায়গা ছিল না। আর অনিলা তখন নিজের ঘরের বিছানার ওপর সুমন্তকে বুকের মধ্যে গুঁজে কান্না চাপবার চেষ্টা করছে।
ভোলার মা এসে ডাকছিল—বউদি, কর্তাবাবু তোমাকে একবার ডেকেছে—
তবু কোন উত্তর দেয়নি অনিলা। শেষকালে হেমন্ত বিশ্বাস একেবারে নিজে এসে ডেকেছিল—বউমা, এসো-এসো, একবার শেষ দেখা দেখে সেরে যাও—তখন যেমন আমার কথা কানে নেয়নি, এখন যা হবার তাই-ই হয়েছে।
অনেক ডাকাডাকির পর অনিলা সুমন্তকে বুকে জড়িয়ে ধরে এসে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল। সে তো শেষ দেখা নয়, যেন শেষ দর্শন। কিন্তু মনে আছে যেন কিছুই দেখতে পায়নি সে। চোখের জলে সবাই ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল। শুধু যেন একটা রক্তপিণ্ড দাউ-দাউ করে জ্বলছিল তার চোখের সামনে আর তারপর জ্ঞান হারিয়ে সেখানেই সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিল।
হঠাৎ আর একদিন এমনি হলো।
সে-দুর্ঘটনার পর তখন অনেক দিন কেটে গেছে। বোধহয় হেমন্ত বিশ্বাসও নিজের সম্পত্তির গরমে পুরোনো কথা সব কিছু ভুলে গিয়েছিল। আবার একদিন সদর খটখট শব্দ।
—কে? কে কড়া নাড়ছে?
বাইরে থেকে শব্দ হলো, আমরা সদর থানা থেকে আসছি।
সদর থানা থেকে লোক আসা মানে যে-কী, তা হেমন্ত বিশ্বাস ভালো করেই জানতো। তাই ধড়মড়িয়ে উঠে সদর-দরজা খুলে দিয়েছে।
দ্যাখে সামনেই পুলিশ আর পুলিশের দারোগা দাঁড়িয়ে। তাদের হাতে টর্চ ছিল বলে তাদের আসল চেহারা দেখা গেল। তাদের দেখেই বুকটা ধড়াস করে একবার কেঁপে উঠলো হেমন্ত বিশ্বাসের।
তবু সঙ্কোচে বললে, কী চাই?
—আপনার নাম কি হেমন্ত বিশ্বাস?
হেমন্ত বিশ্বাস বললে, হ্যাঁ হুজুর।
—আপনি এ-গ্রামের মহাজন?
হেমন্ত বিশ্বাস আবার বললে, আজ্ঞে, হ্যাঁ হুজুর।
—সুমন্ত বিশ্বাস আপনার কে হয়?
—আমার নাতি।
দারোগাবাবু বললে, আমরা আপনার বাড়ি সার্চ করবো।
হেমন্ত বিশ্বাস ঠিক ব্যাপারটা বুঝতে পারলে না।
আরো স্পষ্ট করে বোঝাবার জন্যে সদর থানার দারোগাবাবু বললে, আপনার নাতিকে ডাকাতি করবার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে। সে এখন আমাদের হাজতে আছে। আপনার ছেলে বসন্ত বিশ্বাস কি নকশাল ছিল?
হেমন্ত বিশ্বাস বললে, হ্যাঁ।
দারোগাবাবু আবার জিজ্ঞেস করলে, সেই বসন্ত বিশ্বাস কী পুলিশের সঙ্গে গুলি চালাচালিতে মারা যায়।

—হ্যাঁ।
—সুমন্ত বিশ্বাস কি তারই ছেলে ?
হেমন্ত বিশ্বাস বললে, হ্যাঁ।
দারোগাবাবু বললে, তাহ'লে আপনার বাড়ি তল্লাসী করবো।
হেমন্ত বিশ্বাস বললে, করুন, তল্লাসী করুন।
মনে আছে, পুলিশ এসে সমস্ত বাড়ি একেবারে তল্লাসী করে তছনছ করে গিয়েছিল সেদিন ? অনিলারও সেদিন বুকটা ভয়ে দুর-দুর করে কেঁপে উঠেছিল। ঠিক এই রকম কাণ্ডই ঘটেছিল কয়েক বছর আগে যখন তার স্বামীর মৃত্যু-সংবাদ বয়ে নিয়ে এসেছিল পুলিস। পুলিস তো কোনোদিন সুসংবাদ নিয়ে আসে না।
হেমন্ত বিশ্বাস পুলিসকে জিজ্ঞেস করেছিল, সুমন্ত বেঁচে আছে তো ?
পুলিশ বলেছিল, হ্যাঁ বেঁচে আছে, তবে ডাকাতির অপরাধে সে এখন আমাদের হেফাজতে আছে।
হেমন্ত বিশ্বাস বিশ্বাসই করতে চায়নি যে সুমন্ত কোনও দিন ডাকাতি করতে পারে। বললে, কিন্তু সে আমার নাতি, আমার তো টাকার অভাব নেই সে কেন ডাকাতি করতে যাবে ? কোথায় ডাকাতি করেছিল সে ?
দারোগা বললে, আমরা তা জানি না। আমাদের ওপর হুকুম এসেছে ওপর থেকে। বোধহয় নকশালপন্থীদের দলে ছিল আপনার নাতি। তারপর বসন্ত বিশ্বাসও তো পুলিসের সঙ্গে গুলির লড়াইতে মারা যায় ?
হেমন্ত বিশ্বাস বললে, কিন্তু সে তো বারো বছর আগের ঘটনা।
অনিলা সেদিন হঠাৎ এই বিপর্যয়ে যেন নির্বাক হয়ে গিয়েছিল। সে তখন দাঁড়িয়ে সব দেখছিল। তার বিছানা, আলমারি, তোরঙ্গ, তার সবকিছু ওলোট-পালট করে ফেলেছিল। আর শুধু শোবার ঘরই নয়, সমস্ত বাড়িটা তোলপাড় করে দিয়েছিল পুলিস।
শেষকালে হেমন্ত বিশ্বাসের ঘর। যে-ঘরে শ্বশুরের সিন্দুক থাকে।
পুলিস বললে, সিন্দুকের তালাটা খুলুন।
হেমন্ত বিশ্বাস সিন্দুকের তালা খুলতেই দেখা গেল অনেক গয়না, অনেক টাকা অনেক তমসুক, অনেক খাতা-পত্র। গয়নার পাহাড় দেখে পুলিসের চোখগুলো চক-চক করে উঠলো।
পুলিস জিজ্ঞেস করল, এ-সব এত গয়না কীসের ?
হেমন্ত বিশ্বাস বললে, এসব একটাও আমার নয়, সমস্ত গাঁয়ের লোকদের। আমি বন্ধকী কারবার করি, তারা এগুলো আমার কাছে বন্ধক রেখে গেছে। তার বদলে তাদের টাকা দিয়েছি। গরীব লোকদের টাকা দিয়ে আমি তাদের উপকার করেছি। টাকা ফেরত দিলেই আমি আবার এ গয়নাগুলো ফেরত দিয়ে দেব।
দারোগা বললে, তাহ'লে আপনি তো একজন মহাজন, সুদখোর এই জন্যেই আপনার ছেলে-নাতি এইরকম হয়েছে।
হেমন্ত বিশ্বাসের কানে কথাটা বড় খারাপ লাগলো। বললে, তা মহাজন হওয়াটা কি খারাপ ? আমি মহাজনি করি বলেই তবু এখানকার গরীব-গুর্বো লোকেরা খেয়ে-দেয়ে একটু বেঁচে আছে।

পুলিস এরপর আর কিছু বললে না। কিছু না পেয়ে খালি হাতেই চলে গেল। কিন্তু অনিলার মনের ভাবনা তবু ঘুচলো না। কোথায় রইল সুমন্ত! কেন সে ডাকাতির দলের সঙ্গে মিশলো! কেমন আছে, কেমন আছে সে? কবে তাকে পুলিশ ছেড়ে দেবে।

সবাই চলে যাবার পর হেমন্ত বিশ্বাস কাছে এল।

বললে, বউমা আমি তোমাকে বলিনি যে ছেলেকে এত আদর দেওয়া ভালো নয়! এখন হলো তো? তোমার আদর পেয়ে-পেয়েই সুমন্ত এমনি হলো। বড্ড আদর দিয়ে দিয়েই তুমি ছেলের এই সর্বনাশ করলে! এখন ঠ্যালা বোঝ! আমার আর কী? আমি চলে গেলে তখন একলা তোমাকেই এই সব সহ্য করতে হবে। আমার এই জমি-জমা-ক্ষেত-খামার আমার এই টাকা-কড়ি গয়না-গাঁটি সব খোয়াবে, তখন তোমাকেই পথে পথে ভিক্ষে করে বেড়াতে হবে। তখন বুঝবে আমি যা বলতুম সব ঠিক বলতুম।

যা হোক শেষকালে একদিন সুমন্ত এল। আসতেই হেমন্ত বিশ্বাস দৌড়ে নাতির কাছে এসেছে। বললে, কী রে, কী হয়েছিল?

সুমন্ত বললে, কিছুই হয়নি।

—কিছুই হয়নি মানে? তাহ'লে পুলিস এসে কী মিছে কথা বলে গেল ভেবেছিস? তারা যে বললে, ডাকাতের দলে ছিলি তুই?

সুমন্ত বললে, সব বাজে কথা!

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, বাজে কথা হলে পুলিস তোর মাকে আর আমাকে সেদিন বাড়ি এসে অপমান করলে কেন?

সুমন্ত বললে, পুলিস কী করে গেল তা আমি কি জানি? আমি কেন ডাকাতি করতে যাবো?

—তুই যদি ডাকাতি না করতে যাবি, তাহ'লে কোথায় গিয়েছিলি তাই বল্!

সুমন্ত বললে, আমি কোথায় গিয়েছিলুম তার জবাবদিহি আমি তোমাকে দিতে যাবো কেন?

বলে আর দাঁড়ালো না, সোজা ঘরের দিকে মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল!

অনিলাও এতক্ষণ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সব শুনছিল। এবার তার নিজের কাজে মন দেবার জন্যে চলে যাচ্ছিল।

কিন্তু হেমন্ত বিশ্বাস তাকে যেতে দিলে না।

বললে, শোন বউমা, যেও না—

অনিলা থমকে দাঁড়ালো।

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, দেখ বউমা, তোমার আদর পেয়ে পেয়েই সুমন্ত এত আসকারা পেয়েছে। তুমি বসন্তকেও শাসন করতে পারোনি বলে তার ওই দুর্দশা হয়েছিল, এখন সুমন্তও তোমার কাছ থেকে লাই পেয়ে-পেয়ে বাপের পথ ধরেছে। গুরুজনদের যারা শ্রদ্ধা-ভক্তি করতে জানে না, তাদের এই দুর্দশাই হয়! যা হোক, আমি এখন আবার তোমাকে বলে রাখছি। আমি তোমাকে এখন থেকে সাবধান করে রাখছি। আমাকে এত অগ্রাহ্যি করার শাস্তি তোমাদের আমি দেবোই—বলে রাগে গর্-গর্ করতে করতে হেমন্ত বিশ্বাস নিজের কাজে চলে গেল।

সেদিন হঠাৎ জেলার সাহেব অনিলাকে তার অফিসে ডেকে পাঠালো।

সুশীলা খুব খুশী। বললে, আমি বলেছিলাম দিদি যে এবার আপনাকে ছেড়ে দেবার হুকুম হবে!

তারপরে একটু থেমে আবার বললে, জেলখানা থেকে চলে গিয়ে আমাদের ভুলে যাবেন না যেন দিদি।

তারপরে একটু থেমে আবার বললে, জেলখানা থেকে চলে গিয়ে আমাদের ভুলে যাবেন না যেন দিদি।

অনিলা বললে, জানিনা বাড়িতে গিয়ে কি দেখবো। কতদিন পরে নিজের বাড়ি যাচ্ছি। তুমি বুঝতে পারবে না সুশীলা, আমার ছেলের জন্যে কেমন করছে! তোমার যদি ছেলে থাকতো, তাহলে তুমিও বুঝতে পারতে!

সুশীলা বললে, কিন্তু আপনার ছেলে তো একবারও আপনাকে এখানে দেখতে এল না দিদি—

অনিলা বললে, তাই তো ভাবছি, অসুখ-বিসুখও তো হতে পারে! আমার মনে এখন কেবল ছেলের চিন্তাই হচ্ছে। সে কি করে দিন কাটাচ্ছে, কী খাচ্ছে! কেউ তো এখন আর তাকে দেখবার নেই!

জেলারের সামনে সুশীলাই নিয়ে গেল অনিলাকে।

জেলার সাহেব লোক ভালো। সামনের চেয়ারে বসতে বললে।

বললে—দেখ, ওপর থেকে হুকুম হয়েছে তোমাকে ছেড়ে দেবার জন্যে। তোমার যাবজ্জীবন জেল হয়েছিল, কিন্তু তোমার রেকর্ড ভালো বলে তোমাকে আট বছরের মধ্যেই ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। তুমি খুশী তো?

অনিলা মুখে কিছু বললে না, শুধু একটু ম্লান হাসি হেসে তার সম্মতি জানালো।

জেলার সাহেব তার দিকে কয়েকটা নোট এগিয়ে দিয়ে বললে, এই টাকা নাও, তোমার গাড়িভাড়ার জন্যে। আর এইখানটায় তোমার নামটা সই করে দাও। তুমি নাম-সই করতে পারো তো?

অনিলা বললে, হ্যাঁ—

জেলার সাহেব নিজের কলমটা এগিয়ে দিলে। অনিলা সেটা দিয়ে নিজের নামটা যথাস্থানে সই করে দিলে।

তারপরেই ছুটি। নিজের আগেকার পরা থান ধুতিটা পরে জেলের পোষাক বদলে ফেললে। সুশীলা কোথা থেকে একটা সাবান আর একটু সরষের তেল এনে দিলে।

বললে, এ চেহারা নিয়ে বাড়ি যাবেন না দিদি, মাথায় তেল দিয়ে সাবান মেখে চান করে নিন, তারপরে যান—

অনিলা তাই-ই করলে। তারপর সুশীলা তার পা ছুঁয়ে প্রণাম করলে। অনিলা তখন নিজের ভাবনাতেই অস্থির। তবু বললে, আমি আর মুখে কী বলবো সুশীলা, তুমি এই ক' বছর আমার জন্যে অনেক করেছ, যা করেছ সমস্ত আমার মনে

থাকবে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করো বাড়ি গিয়ে যেন সব ভাল আছে দেখতে পাই—
সুশীলা বললে, ভালোই দেখতে পাবেন দিদি। আপনি যেমন ভালো, আপনার কপালও তেমনি ভালো। আপনার কোনও খারাপ হতে পারে না!
হাওড়া স্টেশনে এসে ট্রেনে উঠে বসেছিল অনিলা। সেকেণ্ড ক্লাশ কামরার ভেতরে আরো অনেক লোক। ভীড় খুব। তারা কেউ জানতেও পারছে না যে তাদের মধ্যে একজন খুনী আসামীও চলেছে। গায়ে সাবান দিয়েছে। আসামীর কোন চিহ্ন তার গায়ে লেখা নেই।
ঝক্-ঝক্ শব্দ করতে করতে ট্রেনটা চলেছে। শব্দের তালে-তালে অনিলার পুরোনো কথাগুলো মনে পড়তে লাগলো।

হেমন্ত বিশ্বাস সাবধান করে দিয়েছিল যে সে বউমা আর নাতিকে একদিন শিক্ষা দেবে! তাই-ই দিলে হেমন্ত বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত।
কথাটা হঠাৎ একদিন অনিলার কানে গেল। কথাটা ভোলার মা কোথা থেকে শুনে এসেছিল কে জানে! সে এসে হঠাৎ একদিন চুপি-চুপি বললে, শুনেছ মা, কর্তাবাবু নাকি আবার বিয়ে করবে?
কথাটা শুনে অনিলা যেন আকাশ থেকে পড়লো।
বললে, কোথা থেকে শুনলে তুমি?
ভোলার মা বললে, কোথা থেকে আবার শুনবো, গাঁয়ের সবাই বলাবলি করছে। দিনক্ষণও নাকি ঠিক হয়ে গেছে—
অনিলা বললে, কই, আমি তো শুনিনি কিছু—
সত্যিই প্রথম দিকে অনিলা এ-ব্যাপারে কোনও মাথা ঘামায়নি। কিন্তু যত দিন যেতে লাগলো, ততই আরো অনেক লোক তাকে এসে ঘটনাটা বলে গেল। বিশেষ করে পাড়ার কিছু মেয়েছেলে।
একজন বুড়ী এসে জিজ্ঞেস করলে, হ্যাঁ বউমা, তোমার শ্বশুর নাকি আবার বিয়ে করছে?
অনিলা বললে, কই, আমি তো কিছু শুনিনি দিদিমা—
কথাটা না শুনলেও সেটা যে সত্যিই তা কিছুদিন পরেই টের পাওয়া গেল।
হেমন্ত বিশ্বাসকে যেমন রোজ আফিমের ড্যালা আর দুধ দিতে যেতে হয়, তেমনি সেদিনও গিয়েছিল অনিলা।
হেমন্ত বিশ্বাস রোজকার মত আফিমের ড্যালাটা অনিলার হাত থেকে নিয়ে মুখে পুরে দিলে। তারপর গরম দুটের বাটিটাতে চুমুক দিয়ে খালি বাটিটা অনিলার হাতে দিতেই অনিলা সেখান থেকে রোজকার মত চলে আসছিল। কিন্তু তার আগেই হেমন্ত বিশ্বাস বলে উঠলো—বউমা, যেও না, শোন—
অনিলা দাঁড়িয়ে পড়লো। বললে, আমাকে কিছু বলবেন বাবা?
হেমন্ত বিশ্বাস বললে, হ্যাঁ, বউমা, তোমাকে একটা কথা বলবো, মন দিয়ে শোন—

অনিলা দাঁড়িয়ে রইল। হেমন্ত বিশ্বাস বললে, আসছে বুধবার দিন তোমার একজন নতুন শাশুড়ী আনছি বাড়িতে। তুমি কিছু শুনেছ?

অনিলা স্পষ্ট মিথ্যে কথাই বললে—না।

—কেউ কিছু বলেনি তোমাকে! গাঁয়ের সবাই জানে, আর তোমার কানে কিনা কেউই তুললে না? আশ্চর্য তো? হ্যাঁ, আমি আবার একবার বিয়ে করছি। ভয় পেও না। খুব ভালো মানুষ, স্বভাব-চরিত্র-বংশ সমস্ত কিছুর খবরই আমি নিয়েছি। কোথাও কোন খুঁত নেই। বাপের পয়সা-কড়ি তেমন নেই। তা না থাক, আমার তো পয়সা-কড়ি আছে। শ্বশুরবাড়ির টাকা নিয়ে কী আমি ধুয়ে খাবো? আমার যা টাকা-কড়ি আছে তাই-ই কে খায় তার ঠিক নেই, পরের যৌতুকের টাকায় আমার দরকার কি?

অনিলা শ্বশুরের কথার ওপর কোনও মন্তব্য করলে না।

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, কই তুমি কিছু বলছো না যে বউমা!

অনিলা বললে, আমি আর কী বলবো বাবা?

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, তবু তুমি তো কিছু বলবে!

অনিলা বললে, আমার আর কী বলবার থাকতে পারে! আপনি নিজে যা ভালো বুঝবেন তাই করবেন।

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, না, তোমাকে বলছি এই জন্যে শেষকালে তুমি আবার না বলতে পারো যে, তোমাকে না বলেই বিয়ে করেছি!

অনিলা এ-কথারও কোনও জবাব দিলে না। অনিলা ভেবেছিল শ্বশুরের যা বলবার তা বুঝি বলা শেষ হয়ে গেছে, তাই সে চলে আসছিল। কিন্তু হেমন্ত বিশ্বাস আবার তাকে ডাকলে।

বললে, যেও না বউমা, আরো কথা আছে, শোন—

অনিলা দাঁড়িয়ে রইল। হেমন্ত বিশ্বাস বললে, কই, তুমি তো জিজ্ঞেস করলে না যে, এই বয়েসে আমি আবার নতুন করে বিয়ে করছি কেন?

অনিলা সেই একই উত্তর দিলে, আমি আর কী বলবো? আপনি যা ভালো বুঝেছেন তাই-ই করছেন!

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, না, তা নয়, তুমিই বলো না আমি কী বিয়ে করে কিছু অন্যায় করছি? আমার এই কারবার, আমার এত টাকা-কড়ি, আমার এই এত বিরাট সম্পত্তি, এসব কার হাতে দিয়ে যাবো, তুমিই বলো? আমি কার জন্যে এত খেটে মরছি? আমার কী ছেলে আছে একটা? যে ছেলেটা ছিল তাকে সংসারী করবার জন্যেই তো তোমাকে বউ করে ঘরে এনেছিলুম, তা তুমি তো তা করতে পারলে না। তারপর একটা যে নাতি ছিল, ভেবেছিলুম তার হাতে সবকিছু তুলে দিয়ে আমি একটু বিশ্রাম নেব, আমি একটু নিশ্চিন্ত হবো, কিন্তু তা তো হলো না। নাতিটাও একটা অপোগণ্ড হয়ে জন্মালো। এখন তাহ'লে আমার নতুন করে বিয়ে করা ছাড়া আর গতি কী?

হেমন্ত বিশ্বাস অনেকগুলো কথা একসঙ্গে বলে হাঁপাতে লাগলো।

অনিলা যখন দেখলে শ্বশুর আর কিছু বললে না তখন আস্তে-আস্তে দুধের খালি বাটিটা নিয়ে বাইরে চলে এল।

বুধবার। অনিলা গুণে দেখলে বুধবার আসতে আর মাত্র পাঁচটা দিন বাকি! পাঁচদিনের মধ্যেই হেমন্ত বিশ্বাস বিয়ে করতে যাবে! বাড়িতে তখন বরযাত্রীদের ভিড় লেগে যাবে!

সত্যিই তাই হলো। হেমন্ত বিশ্বাস বিয়ে করতে যাবে বুধবার, বৃহস্পতিবার নতুন বউ নিয়ে এ-বাড়িতে আসবে। তারপর শুক্রবার হবে বউভাত। সেইদিন থেকেই অনিলা দেখলে বাড়িতে লোকজনের আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে। বেশ ঘটা করে বিয়ে হবে। গ্রামের মিঠু মোদক দই-মিষ্টির অর্ডার নিয়ে গেল। হেমন্ত বিশ্বাস তাকে আগাম দু'শো টাকা দিয়ে দিলে। বাড়ির সামনের উঠোনে সামিয়ানা খাটানো হবে। সেখানে নিমন্ত্রিত অভ্যাগতরা খেতে বসবে।

সবই অনিলার কানে গেল।

গ্রামের ছোট-বড় সব সমাজের লোকের বাড়িতে নিমন্ত্রণপত্র পাঠানো হলো। কোনও কিছু আয়োজনের ত্রুটি নেই। গাদা-গাদা বাঁশ এসে জড়ো হলো উঠোনের ওপর। মাছের বরাত গেল জেলে পাড়ায়। পাকা রুই মাছ দিতে হবে। যেন গ্রামের লোক খেয়ে বাহবা দিতে পারে হেমন্ত বিশ্বাসকে। বসন্ত বিশ্বাসের বিয়েতে যে-রকম মাছ দিয়েছিল, সে-রকম নয়। মোট তিন মণ মাছ হলেই চলে যাবে।

তারপর আছে মাংস। পাঠার মাংস। তাছাড়া দই, রসগোল্লা, পানতুয়াও করতে হবে। মিঠু মোদকের পুরনো খদ্দের হেমন্ত বিশ্বাস। বসন্তর বিয়েতে সে-ই মিষ্টি বানিয়েছিল। লোকে সে-সময় সে-মিষ্টির খুব তারিফ করেছিল। মিঠু বললে, সন্দেশ করবেন না কর্তামশাই?

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, বলছো কী তুমি মিঠু? সন্দেশ না হলে বিয়ে হয়? ভালো কাঁচাগোল্লা করতে হবে তোমাকে মিঠু। এমন কাঁচাগোল্লা করবে যেন লোক চেয়ে-চেয়ে খায়। বসন্তর বিয়ের সময় তোমার কাঁচাগোল্লা ভালো হয়নি। এবার কিন্তু ভাল কাঁচাগোল্লা করে দিতে হবে তোমাকে।

মিঠু বললে, আজ্ঞে কর্তামশাই, ছানার দাম কিন্তু আগের চেয়ে চড়া!

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, তা চড়া দামই হোক আর যা-ই হোক, কাঁচাগোল্লা না হলে তো বউভাত হয় না। লোকে বলবে কী? আমার কী টাকার অভাব বলতে চাও?

মিঠু আর কিছু বললে না। আগাম দু'শো টাকার বায়না নিয়ে সে চলে গেল। হেমন্ত বিশ্বাস বললে, শুক্রবার সব দই-মিষ্টি আমার বাড়িতে সকালবেলা হাজির করে দেবে, তখন সব টাকা নগদ হাতে হাতে পেয়ে যাবে। বুঝলে? তুমি তো জানো আমার কাছে ধারের কোনো কারবার নেই।

হেমন্ত বিশ্বাস সোমবার থেকে পাড়ায়-পাড়ায় নিজে গিয়ে নেমতন্ন সেরে এল। বললে, যাওয়া চাই কিন্তু মল্লিকমশাই, কোনও ওজর-আপত্তি শুনবো না।

বামুন পাড়ার মহেন্দ্র চক্রবর্তীমশাই শুধু বললেন, বেশ তো ছিলে হেমন্ত, আবার কেন বিয়েতে জড়িয়ে পড়ছো, এ বিয়েটা কী না করলেই চলছিল না?

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, আপনি তো সবই জানেন চক্কোত্তিমশাই, আমার যদি একটা উপযুক্ত ছেলে থাকতো তো তাহ'লে কী আর এই ঝঞ্ঝাট করতাম?

—কেন, তোমার নাতি? সুমন্ত? বরং তার বিয়েটা দিয়ে দাও না!

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, তার কথা আর বলবেন না চক্কোত্তিমশাই, সে একটা

অপোগণ্ডের একশেষ, সে রাত্তিরে রোজ বাড়িতেই আসে না।
—তা তারই না হয় একটা বিয়ে দিয়ে দিতে। বিয়ে দিয়ে দিলেই ছেলেরা জব্দ!
হেমন্ত বিশ্বাস বললে, তাহ'লে কী আর ভাবনা ছিল চক্কোত্তিমাশাই? আমি তো বসন্তর বিয়ে দিয়েছিলাম সেইজন্যে, ভেবেছিলাম বিয়ে দিলে ছেলে ঘরমুখো হবে। কিন্তু তারপর যা হলো, তা তো আপনারা সবই জানেন। সেই জন্যেই তো আবার এই ঝামেলা করছি। নইলে কি বিয়ে করতে আমার এত সাধ?
সোমবারটা কাটলো। মঙ্গলবার সারা দিনই নিজের বিয়ের ব্যাপারে মেতে রইল হেমন্ত বিশ্বাস। বিকেলবেলার দিকে হেমন্ত বিশ্বাস যখন বাড়ি ফিরে এল তখন আফিম খাবার সময় পার হয়ে গেছে। আফিম এমনই এক বস্তু যা বরাবর সময় মেনে চলে। একটু এদিক-ওদিক হবার উপায় নেই। সময়ের একটু উনিশ-বিশ হলেই মানুষের মেজাজ বিগড়ে দেয়। মঙ্গলবার হেমন্ত বিশ্বাসেরও তাই হয়েছিল।
বাড়িতে এসেই দরজা থেকে ডাকলে, বউমা—
বউমা আফিম নিয়ে তৈরিই ছিল। আর সংগে গরুর দুধ।
অনিলা শ্বশুরের কাছে আফিমের কৌটোটা নিয়ে গেল। হেমন্ত বিশ্বাস তা থেকে একটি ড্যালা বার করে মুখে পুরে দুধের জন্যে হাত বাড়ালো!
অনিলা দুধের বাটিটা হেমন্ত বিশ্বাসের দিকে এগিয়ে দিলে। এক চুমুকে দুধটা খেয়ে ফেলে অনিলার দিকে বাটিটা বাড়িয়ে ধরলে।
এ নিয়মটা বরাবরের। হেমন্ত বিশ্বাস এই বিকেলবেলা একবার আফিম খাবে, আর একবার রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর শোবার আগে।
দুধটা খাওয়ার পর বললে, বউমা, যেও না শোন, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে—
অনিলা বললে, বলুন কী কাজ?
হেমন্ত বিশ্বাস বললে, গায়ে হলুদের তত্ত্বের ব্যাপারে তোমাকে একটু খাটতে হবে, তুমি ছাড়া আমার তো আর কেউ নেই। জিনিসপত্র সব আমার কেনা-কাটা হয়ে গেছে। যারা গায়ে-হলুদের তত্ত্ব নিয়ে যাবে তারা কাল সকাল দশটার মধ্যেই এসে যাবে, তাদের জন্যে জল-খাবারের ব্যবস্থাটা তোমাকেই করতে হবে। আমার তো আর কেউ নেই। কুড়ি জন লোক খাবে। মিঠু মোদক কাল ভোরবেলা আমার বাড়িতে কচুরী-সিঙাড়া-রসগোল্লা পাঠিয়ে দেবে। তোমাকে একটু আগে থেকে বলে রাখলাম, যাতে তোমার কোনো কষ্ট না হয়—বুঝলে?
অনিলা বললে, হ্যাঁ—
হেমন্ত বিশ্বাস যেন একটু কৈফিয়তের সুরেই বললে, তোমাকে একটু কষ্ট দিচ্ছি বউমা, কিন্তু কী করবো বলো, তুমি ছাড়া আমার আর কেউ যে নেই। তোমার কষ্ট একটু কমবে। তখন আর তোমাকে একলা এত খাটুনি খাটতে হবে না। আচ্ছা, তুমি এখন যাও—
তারপর আর সেখানে দাঁড়ায়নি অনিলা। সোজা নিজের ঘরে চলে এসেছিল। কাল শ্বশুরের বিয়ে। খানিকক্ষণ নিজের বিছানাটায় বসে নিজের মনেই একটু ভাবলো। কাল বুধবার। পরশু বৃহস্পতিবারের সন্ধ্যের মধ্যেই তার নতুন শাশুড়ী বাড়িতে এসে যাবে। গ্রামের লোকজন, মেয়ে-পুরুষ নতুন শাশুড়ীকে দেখতে আসবে! তারপর দিন শুক্রবার। শুক্রবার নতুন শাশুড়ীর বউভাত।

লোকে লোকারণ্য হয়ে যাবে বাড়িটা সেদিন। ভাবতে-ভাবতে অনিলার চোখ দু'টো কান্নায় ঝাপসা হয়ে এল। এ-বাড়ির বউ সে, তার মাথার ওপর আর একজন আসবে। তার ওপর কর্তৃত্ব করবে। শ্বশুরের যত জমি-জমা-ক্ষেত-খামার, টাকা-পয়সা গয়না-গাঁটি সমস্ত কিছুর মালিক হয়ে যাবে সেই শাশুড়ী। তারপর হয়ত একদিন নতুন শাশুড়ীর সন্তানও হবে। তারা একদিন এই সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে। তখন সুমন্তকে হয়ত বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে। তখন ?

তখন যে তার কী অবস্থা হবে তা ভাবতেই অনিলা শিউরে উঠলো। সে আর অপেক্ষা করলে না। তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠলো। তারপর একেবারে সোজা চলে গেল ভাঁড়ার ঘরে। সেই ভাঁড়ার ঘরেই হেমন্ত বিশ্বাসের ক্ষেত-খামারের ছোট-খাটো জিনিসপত্র থাকে। ধানের বীজ, পাটের বীজ। পোকা মারবার বিষ, ফলিডল। কোদাল, ঝুড়ি, গাঁইতি, ফেলে-দেওয়া বিদেকাঠি, আর তারই পাশে পাটের গোছা। চাষীরা যে-সব ধান-পাট-সরষে-কলাই-মুগ-ছোলা হেমন্ত বিশ্বাসের কাছে বন্ধক রেখে যেত, সেই সব জমানো থাকতো তারই পাশে। ভাঁড়ার ঘরের ভেতরে ইঁদুর-আরশোলার বাসা। সে-সব অনিলাকেই পরিষ্কার করতে হতো মাঝে। সেই ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়েই অনিলা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলো—ঠাকুর, তুমি আমার অপরাধ নিও না, আমি বড় আতুর, আমায় তুমি ক্ষমা করো—

মঙ্গলবার। মঙ্গলবার রাত্রিতেই ঘটনাটা ঘটলো।

চারদিকের গ্রামের কেউই টের পায়নি আগে। হঠাৎ কান্নার শব্দে আশেপাশের সব বাড়ি থেকে লোকজন দৌড়ে এসেছে বিশ্বাসবাড়িতে। কী হয়েছে ? কী হয়েছে ওদের বাড়িতে ?

সবাই এসে দেখলে হেমন্ত বিশ্বাসমশাই নিজের বিছানার ওপর শুয়ে ছটফট করছে। সবাই জিজ্ঞেস করতে লাগলো—কী হলো বউমা ? তোমার শ্বশুর এমন ছটফট করছেন কেন ?

অনিলা বললে, কী জানি, আমি তো ওঁকে দুধ খাইয়ে নিজের ঘরে শুতে গিয়েছি, হঠাৎ ওঁর চীৎকারে ঘুম ভেঙে গিয়ে এসে দেখি এই অবস্থা—

কেউ বলতে পারলে না কী করে এমন সর্বনাশ হঠাৎ হলো। ডাক্তার এল, কবিরাজ এল, কিন্তু কেউই কিছু করতে পারলে না। কোনও ওষুধ দেবার আগেই বিয়ের আগের দিনই অত টাকার সম্পত্তি, অত ক্ষেত, অত খামার, অত টাকা-পয়সা-গয়না-গাঁটি সব ফেলে রেখে হেমন্ত বিশ্বাস সজ্ঞানে অত সখের অত সাধের সংসার ছেড়ে চলে গেল।

ট্রেন থেকে নেমে স্টীমারে করে নদী পার হতে হয়। চারিদিকে কত লোকজনের ভিড়, কত লোকের কত চীৎকার গোলমাল। অনিলা স্টীমারের রেলিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে বাইরের সূর্যাস্তের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলো।

স্টীমার থেকে তিন ক্রোশ হেঁটে তবে গ্রামে পৌঁছতে হয়। কিন্তু একটা সাইকেল

রিক্‌শা ভাড়া করে অনিলা আবার সেই আট বছর আগেকার ফেলে-আসা কুসুমগঞ্জে গিয়ে পৌঁছল।
রিকশা ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে অনিলা ঠিক বাড়িটার সামনে এসে বাইরের দরজায় কড়া নাড়তে লাগলো।
'—ওরে খোকা, খোকা, ওরে—'
প্রথমে কেউ সাড়া দিলে না।
অনিলা আবার ডাকলে—'খোকা ওরে খোকা—'
এতক্ষণে ভেতর থেকে মেয়েলি গলায় কে যেন জবাব দিলে—কে ?
অনিলা বললে, সুমন্ত আছে ? আমি তার মা, আমি তার মা এসেছি, দরজাটা খুলে দাও—
দরজাটা খুলতেই অনিলা দেখলে একজন বউ, তার মাথায় সিঁদুর।
এ মেয়েটি আবার কে তার বাড়িতে ?
অনিলা বললে, তুমি কে ?
বউটিও বললে, আপনি কে ?
অনিলা বললে, আমি সুমন্তর মা। এত বছর পরে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছি। জেল থেকেই সোজা এসেছি এখানে। সুমন্ত কোথায়।
মেয়েটি যেন একটু বিরক্তিকর সুরে বললে, বাড়িতে নেই, কলকাতায় গেছেন।
অনিলা জিজ্ঞেস করলে, তা হলে তুমি ? তুমি তার কে হও ?
মেয়েটি বললে, আমি তার স্ত্রী।
অনিলা বললে, ও, তুমি আমার খোকার বউ ? খোকা বুঝি বিয়ে করেছে ? তাহ'লে তুমি তো আমার বউমা। আমি জেলখানায় ছিলুম বলে কিছুই খবর পাইনি বউমা। আমি তোমার শাশুড়ী হই বউমা ! ভালোই হলো, আমি বড্ড ক্লান্ত হয়েছি। আমার বড় জল তেষ্টা পেয়েছে। অনেক দূর থেকে এসেছি। সেই সকাল ন'টার সময় বেরিয়েছি, এখনও পর্যন্ত মুখে এক ফোঁটা জলও দিইনি। দাঁড়াও, আগে বাড়ির ভেতরে ঢুকি, তারপর একটু জল খাবো—
বলে বাড়ির ভেতরে পা বাড়াতে যাচ্ছিল।
কিন্তু মেয়েটি রাস্তা আটকে দাঁড়ালো। বললে, ভেতরে ঢুকবেন না, যা বলবার ওইখানে দাঁড়িয়েই বলুন—
অনিলা থমকে দাঁড়ালো। বললে, বলছো-কী বউমা, আমি যে তোমার শাশুড়ী হই। আমাকে তুমি চিনতে না পারো, কিন্তু তোমার স্বামীকে যে আমি কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে। আমার ছেলে ফিরলে দেখবে ছেলে আমাকে কত ভালোবাসে—
মেয়েটি বললে, তা জানি না, তিনি এখন বাড়ি নেই, আমি যাকে-তাকে অচেনা মানুষকে বাড়ি ঢুকতে দিতে পারি না—তিনি বললে তখন আপনি বাড়ি ঢুকবেন, তার আগে আমি আপনাকে ভেতরে ঢুকতে দিতে পারবো না।
অনিলা বললে, তুমি বলছো কী বউমা, আমি উটকো লোক কেউ নই, আমি এ বাড়ির বউ, তোমার স্বামী আমার পেটের ছেলে—
মেয়েটি বললে, ওসব শুনে আমার কোনও লাভ নেই—
অনিলা বললে, কিন্তু তুমি না শুনলে চলবে কেন বউমা ? তোমাকে যে শুনতেই

হবে আমার কথা। তুমি তাড়িয়ে দিলেও আমি তো তা বলে চলে যেতে পারিনা—তুমি আমাকে অপমান করলেও আমি আমার ছেলেকে ছেড়ে দিতে পারবো না—তুমি তো পরের বাড়ি থেকে এসেছ, তাই হয়ত তুমি সব জানো না—

মেয়েটি বললে, না, আমি সব শুনেছি। আপনি আমার দাদা-শ্বশুরকে বিষ খাইয়ে খুন করেছিলেন, তাই আপনার যাবজ্জীবন কারাবাস হয়েছিল। অনিলার মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়লো।

বললে, তুমি আজ আমাকে এই কথা বললে বউমা? তোমাদের সুখের কথা ভেবেই তো করেছিলুম। সেদিন যদি তাঁকে খুন না করতুম তা হলে কী আজ তুমি এই সংসার করতে পারতে? এত সম্পত্তির মালিক হতে পারতে? এত আরামে এই বাড়িতে বাস করতে পারতে?

মেয়েটি বললে, সে-সব কথা আমাকে শুনিয়ে লাভ নেই, আমি খুনীকে বাড়িতে ঢুকতে দিতে পারি না—বলে অনিলার মুখের সামনেই মেয়েটি দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে দিলে।

অনিলা আর্তনাদ করে উঠলো—বউমা শোনো, শোনো, একবারটি দরজাটা খোলো—কিন্তু ততক্ষণে পাড়ার আরো কিছু লোক শব্দ শুনে জড়ো হয়েছে দৃশ্যটা দেখতে। অনিলা তখন সেখানে সেই দরজার সামনে অজ্ঞান অচৈতন্য হয়ে মূর্ছা গেছে। তার তখন আর হুঁশ নেই।

যে ভদ্রলোক আমাকে গল্পটা বলছিলেন, তিনি এবার থামলেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—তারপর?

ভদ্রলোক বললেন, আপনি যদি কখনও কাশীতে মা-আনন্দময়ীর আশ্রমে যান তো দেখতে পাবেন সেই অনিলা দেবী এখনও বেঁচে আছেন। অনেক কষ্ট পেয়েছেন তিনি জীবনে, ভেবেছিলেন শ্বশুরের মৃত্যুর পর জেল থেকে বেরিয়ে যে-কটা দিন বাঁচেন, তাতে শান্তিতে পুত্র-পুত্রবধূ নিয়ে সংসার করবেন। কিন্তু তা বোধহয় বিধাতার বাসনা নয়।

জিজ্ঞেস করলাম—কিন্তু অনিলা দেবী শ্বশুরকে খুন করলেন কী করে?

ভদ্রলোক বললেন, সেটা আদালতেই প্রমাণ হয়ে গিয়েছিল যখন আদালতে মোকদ্দমাটা উঠেছিল। বুধবার ছিল হেমন্ত বিশ্বাসের বিয়ের তারিখ। আর অনিলা মঙ্গলবার রাত্রেই আফিম খাবার পর শ্বশুরকে যে দুধ খেতে দিয়েছিল, সেই দুধের সঙ্গে 'ফলিডল' মিশিয়ে দিয়েছিল।

ছন্দপতন

—মৈত্রেয়ী দেবী

সাহিত্য সভায় যোগ দিতে বহরমপুরে গিয়েছিলাম। প্রচণ্ড গরম গ্রীষ্মের ধুলো সব জড়িয়ে খুব একটা মনোরম পরিস্থিতি নয়। তবু গ্রীষ্মকালেই তো যত সভাসমিতি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তো বেছে বেছে বৈশাখ মাসেই জন্মালেন। বৈশাখ মাসটা কবিতা লেখার পক্ষে উপযুক্ত হয়েছিল বটে। সুন্দর মিল,—"চির নতুনেরে দিল ডাক পঁচিশে বৈশাখ"—কিন্তু মিটিঙ করার পক্ষে বেশ কণ্টকর। তবে কলকাতা শহরের বাইরে মফঃস্বলের আয়োজনের বেশ আন্তরিকতা থাকে। তাই শারীরিক কষ্ট একটু হলেও মনের দিকে স্ফূর্তি পাওয়া যায়। একটা মসজিদের সংলগ্ন মাঠে আমাদের শেষ দিনের সভাটি বসেছিল। খোলা বাতাস একটু একটু অজানা ফুলের গন্ধ নিয়ে আসছিল। আমি সেদিন সভাপতি। যদিও বক্তৃতার চেয়ে কবিতা লিখতেই আমার ভাল লাগে। আমার মুশকিল হয়েছে কবিতা লিখতে বসলেই আমার কলমের ডগায় মিল এসে পড়ে। কিছুতেই রুখতে পারি না। তাই আমি আর আধুনিক কবিদের আসরে পাত্তা পাই না কবিতাকে মাঝে মাঝেই বাক্সবন্দী করে সাহিত্য সভায় বক্তৃতা দিই। তাতে আমার কবিসত্তা কষ্ট পায়। যাই হোক আজকে ঠিক করেছি বক্তৃতা শেষ করে একটি ছন্দবন্ধ দীর্ঘ কবিতা পড়ব। এটা প্রায় পাড়াগ্রাম বললেও চলে, অন্ততঃ কলকাতার কফিহাউস তো নয়। নিশ্চয়ই কেউ মুচকি হাসবে না। সভার দিকে তাকিয়ে দেখলাম হিন্দু মুসলমানের মিশ্রিত জনতা। নারী পুরুষের মিশ্রিত নয়, এককোনে কয়েকটি মেয়ে বসে আছে বটে। সকলেই উদগ্রীব শ্রোতা। বহরমপুরে মুসলমানের আধিক্য। তাই আমার শ্রোতাদের মধ্যে বেশ কিছু সাদা টুপি দেখতে পাচ্ছিলাম, মনে হচ্ছিল আমার নিজের কবিতা না পড়ে নজরুলের কবিতা পড়লেই বেশি ভাল হত। কিন্তু নিজের কবিতা পড়ার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। বক্তৃতা শেষ করে আবেগের সঙ্গে কবিতাটি পাঠ করে মুখ তুলতেই সামনে দুটি তরুন বয়সী ছেলের দিকে চোখ পড়ল। তাদের মুখে একটা অদ্ভুত আগ্রহ ও প্রশংসা দেখে আমি বিস্মিত হয়ে গেলাম গ্রামে গঞ্জেই এটা দেখা যায় কলকাতার যুবক যুবতীরা বড়ই পরিপক্ক ও সমালোচনায় উন্মুখ পরিচালক নৃপেনবাবু এসে বললেন চলুন ডাকবাংলোয় গিয়ে কিছু মুখে দিন তারপর স্টেশনে যাবেন। ভীড় ঠেলে নৃপেনবাবু ও দুএকজন উদ্যোক্তার সঙ্গে সঙ্গে সকলেই বলছেন, মহীতোষবাবু অনেকদিন পরে এলেন। আপনার কবিতা শুনে বড় ভাল লাগল। বেশ প্রাণ ভরা কবিতা। আজকাল যেসব কবিতা লেখা হয় সেগুলিতে কবিতার পদ না বলে ঠ্যাং বললেই হয়। যেন মাঝে মাঝে মুচড়ে ভেঙে

পড়ে। সবাই হেসে উঠলেন। আমি বুঝলাম না এটা সত্যি ওদের মত, না আমাকে খোসামোদ।

যাইহোক মুখে হাতে জল দিয়ে খাওয়া দাওয়া সেরে নিলাম। কিছুক্ষণ বাদেই নৃপেনবাবু আবার সদলবলে এলেন। আমরা স্টেশনের দিকে এগোলাম। গাড়ীর কাছে এসে কামরা খোঁজাখুঁজি হচ্ছে, একটু অন্ধকার হয়ে এসেছে চারিদিকে, সবই দেখা যাচ্ছে অথচ সবই একটু অস্পষ্ট, নৃপেনবাবু বললেন, মহীতোষবাবু এই ছেলে-দুটি এক সপ্তাহ থেকে আপনার সঙ্গে আলাপ করবার জন্য আবদার ধরেছে আর আজ তো সারাদিন আমার পিছু ছাড়ছে না। আপনি এই ট্রেনে উঠুন, আর তো সময় নেই। এরাও ওই গাড়ীতে উঠে পড়ুক, দুচারটি যা জিজ্ঞাস্য আছে জিজ্ঞাসা করে নিক তারপরে পরের স্টেশনে নেমে যাবে। কিছু মনে করবেন না। এই বলে তিনি আমাদের তিনজনকে গাড়ীতে ঢুকিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন।
নৃপেনবাবুকে হাত নাড়তে নাড়তে যেটুকু সময় গেল দাঁড়িয়েই ছিলুম, ফিরে দেখি ছেলেদুটি আমার বসার জায়গা একটা গামছা মতন কাপড় দিয়ে ঝেড়েমুছে পরিস্কার করে দিয়েছে। ওদের দিকে তাকিয়ে দেখলাম ওরা সেই ছেলেদুটি যাদের সভায় দেখেছিলাম। আমি বললাম, বোস বোস। তোমরা তো সভায় ছিলে তাই না? তোমাদের সঙ্গে তো একরকম আলাপ হয়েই গেছে। ছেলেদুটি মিষ্টি মিষ্টি হাসতে লাগল। একজন বললে আমার নাম শতনীক গৌতম। অন্য ছেলেটি বললে আমার নাম আব্দুল সামাদ। আমি একটু অবাক হয়ে গেলাম, দুটি ভিন্ন ধর্মের ছেলের মধ্যে এত সমভাব আমার ভাল লাগল। আমি বললাম, শতনীক গৌতম তোমার নামটি তো বেশ নতুন ধরনের। শতনীক হাসল। আমার বাবা পৌরানিক নাম পছন্দ করেন। আর গৌতম আমাদের গোত্র। আব্দুল সামাদ আর তোমরা কি কাছাকাছি থাক? আমরা একসঙ্গে পড়ি। কিন্তু গ্রামতো আলাদা। বুঝতেই পারছেন হিন্দুমুসলমান সমাজ পাশে থেকেও দূরে। আমরা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কিছু করতে চাই। আমি জিজ্ঞাসা করলাম তোমাদের গ্রাম শহর থেকে কতদূর? তা চল্লিশ মাইলটাক হবে, ভীষণ পুরোনো এবং কুসংস্কারী মনোভাব। আব্দুল সামাদ বললে, আপনি বিশ্বাস করবেন, স্যার আমাদের গ্রামের মুসলমানরা কেউ বিশ্বাস করে না যে রাশিয়া চাঁদে স্পুটনিক পাঠিয়েছে। আমি হেসে উঠলাম। আমার হাসি দেখে সামাদ বিষন্নসুরে বলল, আপনাকে কী বলব, আমার এইসব অশিক্ষিত আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে থাকতে বড় কষ্ট হয়। কেউ কিছু বোঝে না, বুঝবে না। শতনীক বললে সেইজন্যই আপনাদের মত মানুষের কাছাকাছি আসতে ইচ্ছা করে। কদিন আগে থেকে এসে বসে আছি আপনার সঙ্গে দু একটা কথা বলব সেই আশায়। আমরা দুজনেই সাহিত্য খুব ভালবাসি। একটা হাতে লেখা সাহিত্য পত্রিকাও বের করি; আপনার একটা লেখা দেবেন স্যার। ছেলেটি কাঁচুমাচু মুখে তাঁর প্রার্থনা জানাল। আমি হেসে বললুম, শতনীক তুমি কী কবিতা লেখ বল? শতনীক লজ্জা পেল। চোখ নীচু করে বললে, সে এমন কিছু নয় তবে যদি বলেন আমি দু একটা শোনাতে পারি। সামাদ বললে, না না স্যার ও খুব ভাল লেখে আপনি একটু শুনুন। আমি বললাম হ্যাঁ শুনব বৈকি? শতনীক

লজ্জিতস্মিত মুখে পকেট থেকে নোট বই বের করে দুতিনটি কবিতা পড়ে শোনাল। কবিতাগুলি বেশ একটু কাঁচা হলেও মিলে ছন্দে বাঁধুনি আছে। আর কি যেন একটা কথা বলি বলি করে ফুটে উঠতে চাইছে আমার মনে হোল ওর বলবার কথা আছে। যেদিন সেটা বলা হবে সেদিন বাংলাদেশ একজন বড় কবিকে আবার পাবে। তারপরে আমাদের তিন অসমবয়সী সাহিত্যিকের মধ্যে কাব্য আলোচনা হতে লাগল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম তোমাদের কার কবিতা সবচেয়ে ভাল লাগে? তারপর একটু থেমে বললাম রবীন্দ্রনাথের কথা বাদ দাও···ওরা বললে হ্যাঁ হ্যাঁ তাঁর কথা সকলের মধ্যে আনা যায় না।. আমি মনে মনে ভাবছি ওরা বলবে আমার কবিতা সবচেয়ে ভাল লাগে। তা বললে কি চাটুবাক্য বলা হবে? লাগতেও তো পারে। এই সব মনে মনে ভাবছি কিন্তু এরা সেদিক দিয়েও গেল না। শতনীক বললে, যার কবিতা সবচেয়ে ভাল লাগে তিনি তো বাঁচলেনই না। তাহলে আমরা খুব বড় একজন কবিকে পেতাম—কিন্তু আমি বললাম সুকান্তকে তোমাকে খুব ভাল লাগে? ওরা বললে আর কেই বা আছে এঁর কাছাকাছি। কেন জীবনানন্দ।

হ্যাঁ ওর কবিতা কেবল প্রকৃতির বর্ণনা। উনি বাংলাদেশের প্রকৃতি ভালবাসেন। বাংলাদেশের রূপ উনি দেখেছেন তাই আর কিছু ওর দেখবার দরকার নেই। ও আমাদের ভাল লাগে না। কি বলিস সামাদ? সামাদ বললে, আর ও আছে। উনি তো মানুষের কথা কিছু বললেন না মানুষের কত সমস্যা আছে। কত বেদনা আছে কবির কাছেই তো আমরা তাঁর অর্থ বুঝতে চাই। কবি যদি খালি প্রকৃতির বর্ণনা করেন আমি তো তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারি না। ধানশিড়ী নদী যতই সুন্দর হোক আমার ইচ্ছা করে আমাদের গ্রামের সেই তালাক পাওয়া ছোট্ট মেয়েটা রেশমী। তাদের কথাও কবি কিছু বলুন, শতনীক বলল সামাদ, আমার দাদার কাছ থেকে জেনে নিই কেন আমাদের সুকান্তর কবিতা এত ভাল লাগে? ভাল লাগে তা তো বুঝতে পারি দাদা, কিন্তু কেন লাগে তা বুঝি না। আমিও মনে মনে ভাবছিলাম কোন কাব্য ভাল লাগার পিছনে কি কোন যুক্তি আছে? কারণ আছে? কারণ ছাড়া কার্য হয় না। কিন্তু কারণটা কি যুক্তি দিয়ে বলতে গেলে কাব্য আর কাব্য থাকে না মাষ্টারমশায়ের বকুনি হয়ে দাঁড়ায়।
ইতিমধ্যে শতনীক উঠে দাঁড়িয়ে সুকান্তর একটি কবিতা আবৃত্তি করতে লাগল। আমি বললাম সুকান্তর কবিতার মধ্যে ছন্দ ও মিল দুই আছে যা কবিতা স্থাপত্যকে নিখুঁত করে গড়ে। আর সুকান্তর কবিতার মধ্যে কি আছে জানো—একটা বিরাট আকাঙ্খা আছে তার সে আকাঙ্খা শুধু নিজের ছোটখাটো ভোগ সুখ আনন্দবেদনা নয়—তা সমস্ত মানবজাতির জন্য—

সামাদ বললে দাদা এই কথাই আমি বলছিলাম—শতনীক বললে, সুকান্তর মধ্যে যে গভীর ছন্দবোধ ছিল কখনও তার থেকে বিচ্যুতি হয় নি। জীবনে তাঁর ছন্দপতন হয় নি এইটাই ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ বর। তিন অসমবয়সী সাহিত্যিকের মধ্যে আলোচনা চলল ট্রেন পরের স্টেশনে পৌঁছে গেল। ছেলে দুটি প্রণাম করে বল্লে, আমাদের এই সন্ধ্যা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। শতনীক বল্ল, দাদা মাঝে মাঝে চিঠি

লিখব।
সাহিত্যসভার এই উপসংহারটা আমার কাছেও খুবই মনোরম হয়েছিল।
মাঝে মাঝে শতনীকের চিঠি পেতাম ২/১টা কবিতাও পাঠাত ভালো লাগত আমি বুঝতাম ওর ভিতরে সৃষ্টিকর্তার একটি সুন্দর সৃষ্টি প্রকাশের অপেক্ষায় আছে।
একবার সে জানাল দাদা, আপনাকে জানাতে লজ্জা নেই আমি প্রেমে পড়েছি। এবার ওর প্রণয়িনীর একটা বর্ণনা ও পেলুম কবিতায়—সে পুকুরে পদ্ম ফুলের মধ্যে সাঁতার কাটছে তার নাম কমলিনী। কমলে কমলে একাকার। কবিতাটি পড়ে শৈবালিনীর সাঁতার কাটা মনে পড়ল। আমি লিখলাম শতনীক পুরাতন বা নূতন কারুর অনুসরণ কোরো না। তুমি তোমার নিজের ভবিষ্যতকে প্রকাশ কর।
আমিও লিট্‌ল ম্যাগাজিন লিখি—নামী দামী কাগজে কোনো দিন পাত্তা পাই নি তাই শতনীকের লেখাও প্রায়ই লিট্‌ল ম্যাগাজিনে চোখে পড়ত—আর আমি ভাবতাম কোনো তেমন সাহিত্যিকের চোখে যদি পড়ে, যে এঁর মধ্যে প্রতিভার লক্ষণ বুঝতে পারে ও একটু সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়—তাহলে আজকের শতনীক খ্যাতিমান সাহিত্যিক হয়ে উঠতে পারে।
দেবী সরস্বতী তো আমার কাছে পিঠেই ঘোরাঘুরি করেন যদিও আমার মাথায় তাঁর শ্রীচরণ রাখেন না। তবে সেদিন তিনি আমার প্রার্থনা শুনতে পেয়েছিলেন। কয়েকদিন বাদেই একটি নামী পত্রিকায় শ্রীমান শতনীকের একটি কবিতা দেখলাম। ক্রমেই তার কবিতার সংখ্যা বাড়তেই লাগল এবং একটি বিশিষ্ট পত্রিকার নিয়মিত তার লেখা দেখতুম।
শতনীক আর আমায় চিঠি লেখেনা—তখন তো সে আমার পাখা বা ফ্যান নয় তখন তারই কত পাখা—
শতনীকের লেখার চার ক্রমেই বদলাতে লাগল। লক্ষ্য করলাম ক্রমেই দুর্বোধ্য জটিল কখনও কখনও অশ্লীল হয়ে উঠার প্রবণতা—তবে মানতেই হবে তা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে আলোর ঝলক দেখা যেত।
শতনীক তার নির্দিষ্ট পথ থেকে সরে যাচ্ছে তবে তাকেও তো রোজগার করতে হবে, নৈলে সেই এঁদো গ্রামে বাপের মুদীর দোকানে বসে কি বড় কবি হতে পারবে? লিখেই যদি অর্থোপার্জন করতে হয় তবে কিছুটা বশংবদ হতে হবে আত্মসত্তা বিসর্জন দিতে হবে নৈলে আমার মত বুড়ো আঙুল চুষতে হবে। শতনীক ধাপে ধাপে উঠছে—কবিতা থেকে ছোট গল্প, ছোট গল্প থেকে উপন্যাস—পুজো সংখ্যার "ঢাউস" উপন্যাস তাতে বিচিত্র চরিত্র প্রচুর দেহ বর্ণনা। পড়ে হাসি পেল সেই ছোট ছেলেটা এত জেনে ফেলেছে। সেইদিন বালক শতনীক বলেছিল সুকান্তর ছন্দ মিল তার কবিস্বভাবের দ্যোতক ঠিকই দাদা, কিন্তু ছন্দতো শুধু বাইরের জিনিষ নয়—ওর অন্তরে যে ছন্দ ছিল ভাবের ছন্দ সেই কী ওর কবিতার তাল রক্ষা করত। নৈলে ছন্দপতন হয়ে যেত দুঃখে কষ্টে।
আবার গ্রীষ্মকাল এসেছে রবীন্দ্রজয়ন্তীর পালা শেষ হয়েছে নজরুলের জন্মদিন আগত। চুরুলিয়া গ্রাম যাব নজরুলের জন্মোৎসব করতে। বর্দ্ধমান পর্যন্ত ট্রেনে যাব সেখানে আমার নিমন্ত্রকরা গাড়ী নিয়ে আসবে। ট্রেন হাওড়া থেকে

বেরিয়ে যাবে এমন সময় সেই প্রায় চলন্ত ট্রেনে চার পাঁচটি তরুন তরুণী লাফিয়ে উঠে পড়ল দুটি তন্বী তরুনীও ছিল—ওদের এই হঠকারিতা দেখে অবাক হলাম। আমি একটা বই পড়ছিলাম। এটা ফার্স্ট ক্লাস আর বেশী কেউ ছিল না। ওরা অন্যধারে বসল। একটা পরিচিত গলা শুনে চমকে উঠলাম। শতনীক নাকি? কিন্তু সে আমার দিকে পিছন ফিরেছিল তাই তার মুখ দেখতে পেলুম না। শতনীকের গলার একটু মৃদু বৈশিষ্ট্য ছিল—মৃদু এবং মেয়েলী তাই এতদিন পরেও মনে হচ্ছে চিনতে পারলাম। ওদের হৈ হৈ খুব বেড়ে উঠল—বুঝলাম কোথাও পিকনিক করতে যাচ্ছে।

আমি বইখানা মুখের সামনে ধরে ওদের আড়াল করে রইলাম। কানে আসছে ওদের কথাবার্তা খাওয়া দাওয়া হুল্লোড়—মেয়ে দুটোকেই যেন বেশী হুল্লোড়ে বলে মনে হল। হঠাৎ একজন বল্লে শতনীক তুই নুতন বোতল ধরেছিস আজ একটা পরীক্ষা দিতে হবে—হুস্ করে একটা শব্দ এল আর মদের গন্ধে ভরে গেল ঘরটা—নে শতনীক এক চুমুকে কতটা টানতে পারিস দেখি—একটি ঝন্‌ঝন্ করে শব্দ হোল বোধহয় শতনীকের হাত থেকে বোতল কিম্বা গ্লাস ঝনঝন, শব্দে পড়ে গেল—আর তখন ট্রেন একটা স্টেশনে ঢুকল। একটা ছোট স্টেশন। আমি ভাবলুম নেমে পাশের ঘরে গিয়ে থার্ড ক্লাসে বসি—এ ইণ্টলেকচুয়াল আবহাওয়া সহ্য হবে না। শতনীকের কথা সারা পথ মনের মধ্যে টন্‌টন্ করতে লাগল। সে বলেছিল সুকান্তর ছন্দপতন হয়নি। মানুষকে কম্প্রমাইজ করতেই হবে, কিন্তু কোনখানে তার সীমারেখা টানবে তা' না জানলে জীবনের ছন্দপতন হয়ে যাবেই। সেদিন রাত ঘুমের মধ্যে বার বার একটা স্বপ্ন জেগে রইল। দেখছিলাম যেন একটা বিরাট মাকরসার জাল দেশটাকে ঘিরে রয়েছে। আর কয়েকটা ছোট্ট ছোট্ট রঙীন প্রজাপতি উড়ে উড়ে সেই জালের কাছে আসছে। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম যারে যা, সরে যা—কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরুল না। একটা যন্ত্রণা নিয়ে ঘুম ভেঙ্গে গেল।

অঙ্কুর

—ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

রাত তখন কত তা বলতে পারব না। কেননা আমি ঘড়ির দিকে তাকাইনি। হঠাৎ কলিংবেল টা বেজে উঠতেই ঘুম ভেঙে গেল। জিরো পাওয়ারের আলোটা জ্বলছিল তাই সুখ শয্যা ছেড়ে টিউব লাইটের সুইচটা অন করলাম।

আলো জ্বলে উঠতেই কলিংবেল থেমে গেল।

দরজা খোলার আগে সাড়া দিলাম—কে?

বাইরে টক টক শব্দ।

আবার বললাম—কে?

—একবার দরজাটা খুলুন না?

নারীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। এই প্রচণ্ড শীতের রাতে কেরে বাবা! বললাম—কাকে চাই?

—আমি ডাক্তার সেনকে চাইছি। বিশেষ দরকার।

নিশ্চয়ই কোন ডেলিভারি কেস। গাইনি হওয়ার বড় জ্বালা। অথচ উপায় নেই। প্রসূতি এবং নবজাতকের জীবন মরণ সমস্যা হলে যেতেই হবে। এই মফঃস্বল শহরে আমি আসবার পর থেকে ঠাকুরের কৃপায় একবারও ব্যর্থ হইনি। আমার হাতে যেসব শিশু জন্মগ্রহণ করেছে তারা সবাই সুস্থ। কাজেই এই অঞ্চলে ডাক্তার হিসেবে আমার যথেষ্ট সুনাম হয়েছে।

আমি চোর ডাকাত বা দুষ্ট লোকের ভয় করি না। তার কারণ এখানকার মানুষজন খুব ভালো। এরা আর যাই করুক না কেন আমার কোন ক্ষতি করবে না। করলে এরাই বিপদে পড়বে। আমি গভীর রাতে এলাকা থেকে বহুদূরে ভাঙা বাড়ির এক কোণে পড়ে থাকা যন্ত্রণাকাতর ভিখারিনীকেও বিনা পারিশ্রমিকে সন্তান প্রসব করিয়ে এসেছি। আবার অনেক প্রাসাদোপম অট্টালিকার ভেতরেও বৃষ্টি বাদল মাথায় নিয়ে হাজির হয়েছি মধ্যরাতে।

আবার টক টক শব্দ—দরজাটা খুলুন।

আমি নির্ভয়ে দরজা খুললাম।

দরজার সামনে বোরখা ঢাকা এক মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। এই প্রচণ্ড শীতে শির শির ক'রে কাঁপছেন তিনি।

—বলুন।

—আপনিই কি ডাঃ সেন? আমি একটা ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

—ভেতরে আসুন।

মহিলা ভেতরে এলে দরজা বন্ধ করলাম। যদিও এটা আমার নীতিবিরুদ্ধ তবুও করলাম রাত গভীর এবং শীতের দাপট বেশি বলে। সারা গায়ে শালটা মুড়ি দিয়ে আরাম কেদারায় বসে মহিলাকে বসতে বললাম।
মহিলা বসতে বসতে বললেন—এমন অসময়ে আপনাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে সত্যিই খুব অন্যায় করেছি। অথচ বিশ্বাস করুন এ ছাড়া কোন উপায় ছিল না।
আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না ব্যাপারটা কি। কে এই রহস্যময়ী? এত রাতে আমাকেই বা তাঁর কিসের প্রয়োজন? তবে এই মুহূর্তে আমাকে যে শীতের কামড় খেয়ে বাইরে বেরতে হবে না তা বেশ বুঝতে পারলাম।
শুধু বুঝতে পারলাম না এই বোরখার আড়ালে যিনি লুকিয়ে আছেন তিনি কি রকম। কুমারী না সধবা? যুবতী না বিগতযৌবনা? তবে তাঁর শ্বেত-শুভ্র দুটি হাত ও পায়ের পাতা দেখে বুঝলাম যে বোরখার আড়ালে এক বিদ্যুৎবর্ণা লুকিয়ে আছেন।
তিনি কিছু বলছেন না দেখে আমিই বললাম—বলুন, এত রাতে আপনি আমার কাছে কেন এসেছেন?
মহিলা কি যেন বলতে চাইলেন অথচ বলতে পারলেন না। তাঁর গলাটা একবার একটু কেঁপে উঠল শুধু।
আমি বললাম—এই প্রচণ্ড শীতে এত রাতে এসেছেন, আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে নিশ্চয়ই? একটু কফি খাবেন?
সুরেলা গলায় মহিলা বললেন—পেলে ভালো হয়।
আমি উঠে গিয়ে হিটারে জল গরম করতে দিলাম।
—আপনি একা থাকেন বুঝি?
—হ্যাঁ। তবে আমার একজন লোক আছে। বেচারি বুড়ো মানুষ। পাশের বাড়িতে থাকে। একটু কফির জন্য তাকে আর ডাকলাম না।
—এ ব্যাপারে আমি কি আপনাকে একটু সাহায্য করতে পারি? অবশ্য যদি আপনার সংস্কারে না বাধে।
—না না, ওসব কিছু নয়। আমার কোন সংস্কার নেই। তবে আপনি আমার অতিথি। আর এই কাজে আমি অভ্যস্থ। তাই—।
—আপনার বউ নেই?
—আমি এখনো বিয়ে করিনি।
কথা বলতে বলতেই কফি তৈরী করলাম। এক কাপ নিজে নিয়ে এক কাপ এগিয়ে দিলাম তাঁর দিকে। রহস্যময়ী নারী কফির পেয়ালাটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর আমার দিক থেকে একটু সরে গিয়ে আমার দিকে পিছন হয়ে ঘরের চারিদিক দেখতে দেখতে কফি খেলেন।
এই সময় আমার খুব ভয় হল। কে ইনি? এমন স্পর্ধা কি করে হল? রাত দুপুরে ঘরে ঢুকে ঘরের চারিদিক এইভাবে দেখার মানে কি?
আমি একটু গম্ভীর হয়ে বললাম—শুনুন, আপনি কি বলতে চান তা চটপট বলে ফেলুন। এখন অনেক রাত। আমার চোখে ঘুম আছে। তার ওপর এই শীতে আমি আপনাকে বেশিক্ষণ সময় দিতে পারব না।

মহিলা মৃদু হেসে আমার সামনে টি-পটে কফির শূন্য পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে বললেন—খুব ভয় পেয়ে গেছেন, না? ভাবছেন নিশ্চয়ই কোন জিন কবরখানা থেকে উঠে এসেছে। অথবা বোরখার আড়ালে লুকিয়ে আছে কোন ফুলন দেবী। আমার মনের ভাব ঠিক বুঝতে পেরেছেন তো? আশ্চর্য। অসাধারণ বুদ্ধিমতী মহিলা। বললাম—না, মানে সারাদিন রোগিনীদের সংস্পর্শে থাকার ফলে আমি খুব ক্লান্ত। আবার সকাল থেকেই শুরু হবে পরিশ্রম। তাছাড়া এখুনি এই মুহূর্তেই হয়তো কোন মরণাপন্ন প্রসূতির জীবন রক্ষার জন্য ছুটতে হবে, কিংবা কোন নবজাতককে দেখাতে হবে পৃথিবীর আলো। কাজেই আমারও তো বিশ্রামের প্রয়োজন।

রহস্যময়ী এবার আমার মুখোমুখি বসলেন। তারপর বললেন—আমি অত্যন্ত বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি। আপনি যদি আমার একটু উপকার করেন তাহলে চির-কৃতজ্ঞ থাকব। নাহলে হয়তো আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে।

—সেকি!

—হ্যাঁ। সে ভারি লজ্জার কথা।

আমি বললাম—শুনুন। রাত দুপুরে আমি কোন অচেনা মহিলার লজ্জার কথা শুনতে রাজি নই। সবে ডাক্তারি পাশ করে মফঃস্বল শহরের এই হাসপাতালে চাকরিটা জুটিয়েছি। এটাকে আমি খোয়াতে চাই না। আপনি কে, কেন এবং কোথা থেকে এসেছেন কিছুই বুঝতে পারছি না। এই অবস্থায় কোন জরুরি কল নিয়ে হঠাৎ কেউ এসে পড়লে আমার ঘরে আপনাকে দেখবে। তাতে আমার বদনাম হবে।

—আয়্যাম স্যরি ডক্টর। আমার বক্তব্য আমি এখুনি পেশ করছি।

—তার আগে আপনার মুখের ঢাকাটা সরাতে হবে। আপনার মুখ না দেখলে আমি কথা বলব না।

বাঃ! বেশ বললেন তো! রাতদুপুরে আপনি পরস্ত্রীর মুখ দেখবেন? ছিঃ ছিঃ। আপনার মতো লোকের এ মানায় না।

—আপনি তাহলে যেতে পারেন।

বলার সঙ্গে সঙ্গেই নেকাবটা সয়ে গেল। আর এক পরমাসুন্দরীর মুখ প্রকাশিত হল সেই কালো নেকাবের আড়ালে। ঈশ্বর তাঁর তুলির টানে এমন একটি মুখ এঁকেছেন যে সে মুখের তুলনা নেই। শুধু নেকাব নয়, বোরখার আড়াল থেকেও সেই মুহূর্তে রাজহংসীর মতো যে শরীরটা বেরিয়ে এলো তা দেখে অস্থির না হয়ে থাকতে পারে না কেউ। আমি চোখের পাতা ফেলতেও ভুলে গেলাম। বেশ কিছুদিন আগে এই এলাকায় একবার এই বিদ্যুৎবর্ণাকে দূর থেকে দেখেছিলাম। তখন বোরখা ছিল না। দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। মনে আছে চোখে চোখ পড়তেই চোখের ভাষায় মৃদু ধমক দিয়ে বিদ্যুতের মতো সরে গিয়েছিলেন উনি। আর আজ এই গভীর রাতে যৌবনের পসরায় রূপের প্রদীপ জেলে সেই তিনি যে এমনভাবে আমার ঘরে এসে হাজির হবেন তা কি ভাবতে পেরেছিলাম?

এবার আমারই গলা কাঁপার পালা—আ-আ-আপনি!

—হ্যাঁ আমি। মিসেস হেনা আলম।

—আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।
—কি করে বুঝবেন? আমার এই রূপ যে বিধ্বংসী অগ্নিশিখা। তাই তো একে বোরখা দিয়ে ঢেকেছিলাম। দেখতে চাইলেন বলেই দেখালাম। যাক, যে কথা বলতে এসেছিলাম। আপনাকে আমার একটা উপকার করতে হবে।
—আই মাস্ট ডু ফর ইউ।
—আমি সাত মাসের প্রেগন্যাণ্ট। আমার এটাকে অ্যাবরশান করাতে হবে।
আমি শিউরে উঠলাম—মিসেস আলম! একি বলছেন আপনি?
—যা বলছি ঠিকই বলছি ডাক্তার।
—আমি জানি আপনি অত্যন্ত অভিজাত পরিবারের বউ। আপনার স্বামী বর্তমান। এ ক্ষেত্রে এই ব্যাপারে তাঁরই আসা উচিত ছিল। তার বদলে এই গভীর রাতে আপনি—।
—আসতে বাধ্য হয়েছি। কেননা অ্যাবরশানের ব্যাপারটা অত্যন্ত গোপনীয়। আমার স্বামীর অজান্তেই এটা আমি করাতে চাই।
—কিন্তু…।
—এর মধ্যে কোন কিন্তু নেই ডাক্তার।
—আপনি অন্যত্র যেতে পারেন। কারণ আমি এসব কাজ করি না। যদিও আমি গাইনি তবুও শিক্ষার ঐ দিকটা আমি বেছে নিইনি। তার কারণ আমার ধর্ম মানুষকে পৃথিবীর আলো দেখানোর সুযোগ করে দেওয়া। তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া নয়। বিশেষ করে প্রথম অবস্থায় হলেও একটু ভেবে দেখতাম। কিন্তু এখন বাচ্চাটার পুরো বডি ফর্ম করে গেছে। এই অবস্থায় ও কাজ আমার পক্ষে অসম্ভব।
হেনা আলম দু'হাতে আমার হাত দুটি জড়িয়ে ধরলেন। ওঁর পরশে আমি দুর্বল হয়ে পড়লাম। সেটা বুঝতে পেরে আমার দুটি হাত ওঁর বুকের মধ্যে টেনে নিলেন উনি। সে কি দারুন উন্মাদনা। যেন নরম তুলোর ওপর হাত রেখেছি। আমি কাঁপা কাঁপা গলায় বললাম—কিন্তু কেন আপনি এ কাজ করতে চলেছেন?
—এই সন্তান আমার বাঞ্ছিত নয়।
—তাহলে আগে আসেননি কেন?
—তখন বুঝতে পারিনি সে আমাকে এইভাবে ঠকাবে বলে।
—কে সে?
—আপনি আচ্ছা লোক তো। কোন নারী কি পারে তার গোপন প্রেমিকের কথা পর পুরুষকে বলতে?
এই শীতেও আমার তখন ঘাম দেখা দিল।
হেনা আলম আমার আরো কাছে এগিয়ে এলেন। উঃ সে কি মদির উষ্ণতা। আমাকে যেন পাগল করে হেনা আলমের রূপের জ্যোছনা যেন, চাঁদের শোভাকেও ম্লান করে দিল। সুললিত করুণ কণ্ঠস্বর আবার শুনতে পেলাম—ডাক্তার!
—বলুন।
—আমার উপকার করবেন না?
—না। এ কাজ আমি করি না।
—আপনাকে আমি অনেক টাকা দেবো। আমার গায়ের সমস্ত গয়না দেবো।

বিনিময়ে আপনি আমার এই উপকারটুকু করুন।
—মিসেস আলম, আপনি এ টু কষ্ট করে অন্য কোথাও চলে যান।
—উপায় থাকলে যেতাম। উপায় নেই বলেই এত রাতে লুকিয়ে এইভাবে এসেছি। স্যুইসাইড করলে এক্ষুনি আমার সমস্ত প্রবলেম সলভ্ হয়ে যায়; কিন্তু আমি বাঁচতে চাই ডাক্তার।
—আমি আপনাকে বাঁচাতে পারলাম না।
হেনা আলম উঠে দাঁড়ালেন। তারপর করুণ চোখে একবার আমার দিকে তাকিয়ে আবার নিজেকে বোরখায় ঢেকে নিঃশব্দে চলে গেলেন।
উনি চলে যাবার অনেক পরেও আমি দরজায় খিল দিতে ভুলে গেলাম।

পরদিন সোনা ঝরা সুন্দর সকালে গত রাতের ঘটনাটা ঘুমের ঘোরে একটা দুঃস্বপ্নের মতোই মনে হল আমার কাছে। আমাদের হসপিটালে এক রোগীনি কদিন ধরেই পেন খাচ্ছে। আজ একবার শেষ চেষ্টা করে দেখব স্যালাইন দিয়ে পেন আনাবার। নাহলে বাধ্য হয়েই সীজার করতে হবে।
আমার কাজের লোকটি এলে তাকে রান্নার ব্যবস্থা করতে বললাম। তারপর টুক করে সামান্য কিছু বাজারও করে আনলাম। আমার এই ঘোরা ফেরার মধ্যে বার বারই কিন্তু হেনা আলমের কথাটা মনে হতে লাগল। তাঁর প্রস্তাব আমার পক্ষে রক্ষা করা সম্ভব হ'ল না। তাই বলে সত্যিই কি তিনি আত্মহত্যা করবেন? যদি করেন, তাহলে কিন্তু দু'টি মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী হবো আমি। অ্যাবারশনে সমস্যাটা মিটেই যায়। অথচ আমি কি করে এই কাজটা করি? একটি শিশু, প্রকৃতির নিয়মে সে আপন বিবর্তনের মধ্য দিয়ে যখন পূর্ণ রূপ পেয়ে গেছে তার হাত পা চোখ মুখ সব কিছুই যখন যথাযথ নিয়মে তৈরী হয়েছে। তখন তাকে তার আত্মপ্রকাশের আগেই মাতৃগর্ভ থেকে জোর করে টেনে এনে গলা টিপে মেরে ফেলাটা ...। না না না এ কাজ করলে আমি পাগল হয়ে যাবো। অর্থের লালসায় এ কাজ যারা করে করুক। আমি করতে পারব না। আমার সারা শরীর যেন সেই দৃশ্য কল্পনা করে শিউরে উঠল। অসহায় শিশুর অন্তিম আর্তনাদ যেন ট্যাঁ ট্যাঁ করে আমার কানের কাছে বাজতে লাগল। এ কাজ আমাকে মেরে ফেললেও হবে না। আমি অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করলাম।
ঘরে ফিরে স্নান খাওয়া সেরে চলে গেলাম হসপিটালে। নতুন একজন পেসেন্ট ভর্তি হয়েছে এই মাত্র। বাড়িতে ডেলিভারি হতে গিয়ে বিপর্যয় ঘটিয়ে বসেছে। নার্স আয়া সবাইকে নিয়ে ঢুকে পড়লাম লেবার রুমে। ভুলে গেলাম হেনা আলমের কথা। অনেক পরিশ্রমের পর যথাযথ নিয়মে ভগবানের ইচ্ছায় ডেলিভারিটা করাতে পারলাম। প্রসূতির অবস্থা ভালো নয়। তবে বাচ্চাটা ভালো আছে। লাল রক্তের ড্যালা

যেন একটা। কি সুন্দর কচি মুখ। হাত পা নেড়ে চিঁউ চিঁউ করছে দুষ্টুটা। এই রকম একটি শিশুকে কখনো মাতৃগর্ভ থেকে বার করে এনে গলা টিপে মারা যায় ?

আবার মনে পড়ল হেনা আলমের কথা। সারাদিনে বার বার চেষ্টা করেও হেনা আলমকে ভুলতে পারলাম না। হেনা আলমের প্রেমিক কে তা জানি না। তবে এটুকু জানি এই শহরের উপকণ্ঠে পাহাড়ের গায়ে যে মার্বেল প্যালেসটা, সেটা হেনা আলমের। এখানকার দু'দুটো সিনেমা হলের মালিক হেনা আলম। এ ছাড়াও একটি বস্তি, ধান কল ও অয়েল মিলের মালিক হেনা আলমরা। হেনা আলম মমতাজ সুন্দরী। মুঘল হারেমের রূপসীদের কথা যেন মনে করিয়ে দেয় হেনা আলম। কিন্তু কেন তার এই পদস্খলন ? হেনা আলমের স্বামীকে আমি দেখিনি। হেনা আলমের মতো সুন্দরীকে যিনি রাজার ঐশ্বর্য দিতে পেরেছেন তিনি যেমন তেমন লোক নন। অথচ সেই মানুষকে ফাঁকি দিয়ে ঐ প্রাসাদের অভ্যন্তরে কি করে পর পুরুষের সন্তান গর্ভে ধারণ করেন উনি তা আমার বোধগম্য হল না। বিয়ে তো করিনি। তাই হয়তো বুঝিনা মেয়েদের মন।

সে রাতেও অনেকক্ষণ ধরে হেনা আলমের মুখ মনে করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

রাত তখন বারোটা। শীতের রাত। প্রচণ্ড শৈত্যপ্রবাহে সারা শহর, পাহাড়, পাহাড়তলি কন কন করছে। গাছ থেকে পশুপক্ষি মরে পড়ে যাচ্ছে। জঙ্গল থেকে বড় বড় গাছের শুকনো গুঁড়ি এনে গাছতলায় ধুনি জ্বালানো হয়েছে। যাতে অধিক সংখ্যক পশুপক্ষী মরে না যায়।

কলিংবেল বেজে উঠল।

আঃ। সেরেছে। এই রাতে আবার কোথায় যেতে হয় কে জানে ?

উঠে গিয়ে আলো জেবলেই সাড়া দিলাম—কে ?

—আমি।

পরিচিত কণ্ঠস্বর। বুকটা যেন কেঁপে উঠল। তবু জিজ্ঞেস করলাম—কে আপনি ?

—এরই মধ্যে ভুলে গেলেন ?

হেনা আলম। হেনা আলম ছাড়া আর কেউ নয়। অপ্রত্যাশিত কিন্তু প্রত্যাশিত। সেই একই আবদার করবেন হয়তো। করুন। তবু তো কিছুক্ষণের জন্যও দেখতে পাবো সেই চৌধবি কা চাঁদকে। দরজাটা খুলে দিলাম।

আজ আর কালো বোরখা নয়। কাশ্মিরী সিল্কের ওপর নানা রকম কাজ করা বোরখা। সেই সঙ্গে এক মধুর সৌরভে গোটা ঘর ভরে গেল। এ সৌরভ কাল ছিল না।

দরজাটা খোলা ছিল। হেনাই বন্ধ করলেন। আজ আর বলতে হ'ল না। মুখের ঢাকা নিজেই সরালেন। তারপর একটা কৌচের ওপর বসে যেন ওনার নিজেরই বাড়ি এমনভাবে বললেন—কি হ'ল বসুন।

আমি গত রাতের মতোই সারা গায়ে শাল জড়িয়ে ওনার মুখোমুখি বসলাম।

হেনা বললেন—আমি চলে যাবার পর কাল রাতে নিশ্চয়ই আপনি ভালো করে ঘুমোতে পারেন নি ?

—না পারিনি।

—আসলে আমার এই দেহতে এত রূপ কিভাবে যে তৈরী হয়েছিল তা নিজেই আমি ভাবতে পারি না। আয়নায় যখন নিজেকে দেখি তখন মনে মনে হিন্দুদের মতো পাঞ্চপ্রদীপ জেবলে নিজেকে আমি আরতি করি। তাই মরতে আমার ইচ্ছে করে না। ডাক্তার। এর পরে আবার যদি কখনো নরদেহ নিয়ে পৃথিবীতে আসি তখনো কি এই রূপ আমি পাবো ?

আমি মুগ্ধ দৃষ্টিতে চোখের পাতা না ফেলে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

হেনা আলম কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—কি ঠিক করলেন ঐ ব্যাপারে ?

আমি যেন কিছুই জানি না এমনভাবে বললাম—কোন ব্যাপারে ?

—সেকি! কাল যে ব্যাপারে কথা বললাম। মানে যে ভাবেই হোক অ্যাবরশানটা করাতেই হবে।

আমার রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠল। এই হেনা আলমের গর্ভে যে শিশু আছে সেটা ছেলে কি মেয়ে জানি না। মেয়ে হলে সে হয়তো হেনা আলমের চেয়েও সুন্দরী হবে। ছেলে হলে হবে নবাবজাদা। তার আবির্ভাবকে আমি কোন অধিকারে বাধা দেবো? হোক সে অবাঞ্ছিত। তবু সে শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ। তাকে আসতে দিতেই হবে। আমি বললাম—এ কাজ যে কখনো করিনি মিসেস আলম।

—জানি। কিন্তু আমার জন্য এটুকু আপনাকে করতেই হবে। যে ভুল আমি একবার করেছি জীবনে সে ভুল দ্বিতীয়বার করব না। আপনাকে আমি কথা দিলাম ডাক্তার।

—মিসেস আলম। আজ যাকে আপনি অবাঞ্ছিত মনে করছেন একদিন তো তাকেই আপনি চেয়েছিলেন একান্তভাবে? ওর পিতা আপনার ঘৃণ্য হতে পারেন কিন্তু ঐ শিশুটা আপনার কাছে কোন অপরাধটা করল শুনি? ও তো ওর পরম নির্ভরযোগ্য স্থান ভেবেই আপনার জঠরে নিশ্চিন্তে নিজের বৃদ্ধি ঘটাচ্ছে।

হেনা আলম দুহাতে আমার দুটি হাত আবার জড়িয়ে ধরলেন। আবার সেই উষ্ণ পরশ। এবার নিজেই আমার কোলের ওপর নুয়ে পড়ে বললেন—সেন্টিমেন্টাল হবেন না ডাক্তার, প্লিজ। আপনি যা বলছেন আমি সব বুঝতে পারছি। কিন্তু তবুও আমি এ কাজ করতে চাইছি কেন জানেন? এর পিতা অর্থাৎ যাকে ভালোবেসে আমার সর্বস্ব দিয়েছিলাম সে আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। সে আর কখনো আমার কাছে ফিরে আসবে না। আমার স্বামী মেহবুব আলম এই অঞ্চলের সবচেয়ে ধনী এবং মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। বছর দুই আগে এক সাংঘাতিক বিস্ফোরণে তাঁর দুটি চোখ নষ্ট হয়ে যায়। একটা পাও বাদ দিতে হয় কেটে। ক্রাচে ভর দিয়ে তিনি এক পায়ে চলেন। তাঁর বীভৎস মুখের দিকে তাকালে ভয়ে বুক শুকিয়ে যায়। এর ফলে স্বামীর সঙ্গে সহবাসে আমার রুচি হয় না। উনি বিচক্ষণ লোক। নিজেও সেটা বোঝেন। তাই আমাকে বিরক্ত করেন না। এই সময় আমাদের এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়র একটি ছেলেকে ভালো লাগে আমার। সে আমাকে কথা দেয় আমায় নিয়ে সে দূরে বহুদূরে চলে যাবে। যেখানে মেহবুব সাহেবও আমাদের নাগাল পাবেন না। আমি তাকে বিশ্বাস করি। এবং তার সঙ্গে গোপনে মিলিত হই। অবশ্যই সেটা সন্তান উৎপাদনের জন্য নয়। দেহ সুখের লালসায়। কিন্তু

আমার দুর্ভাগ্য যে সে আমাকে ছেড়ে গেছে। এখন এই সন্তানের আমি কি পরিচয় দেবো? কোথায় রাখব একে? একা যে কোথাও চলে যাবো এখান থেকে, যাবই বা কোথায়? এই রূপই যে আমার শত্রু হবে। তাছাড়া মেহবুব সাহেবের ঐ বিশাল ঐশ্বর্যও তো ভোগ করতে পারব না আর।
আমি আমার কোলের ওপর থেকে হেনা আলমের মাথাটা তুলে নিলাম। বললাম—ভারী মুশকিলে ফেললেন দেখছি।
—একটা উপায় বার করুন ডাক্তার।
—কোন রকমে আপনি কি একবার আমার সঙ্গে এই শহরের বাইরে যেতে পারবেন?
—ক্ষেপেছেন? সেখানে রাতের অন্ধকারে গোপনে আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসছি সেখানে কি করে আমি শহরের বাইরে যাবো? আমাকে এখানকার সবাই চেনে। আমি যখন ঘর থেকে বেরোই তখন বেয়ারা দরোয়ানরা আমাকে ঘিরে থাকে। এ কাজ এখানেই করতে হবে ডাক্তার। তার জন্য আপনি যা চান যত টাকা চান দেবো। আমার শরীর খারাপের আছিলায় আমার লোক দিয়ে আপনাকে ডাকিয়ে নিয়ে গিয়ে আমার বাড়িতেই এই কাজ করাব আমি।
—সেকি!
—এ ছাড়া উপায় নেই।
এতক্ষণ নেকাবের ঢাকা সরিয়ে রাখলেও সেই সুদৃশ্য বোরখার আড়ালে ছিলেন হেনা আলম। এবার বোরখা মুক্ত হয়ে গলার বহুমূল্য নেকলেসটি খুলে আমাকে দিলেন। বললেন—এর সবগুলিই হীরে। এটা অগ্রিম হিসেবে দিলাম। আর টাকা? কত টাকা চাই আপনার? যা চাইবেন তাই পাবেন।
আমি কোন কথাই বলতে পারলাম না।
হেনা আলম আমার খুব কাছে এগিয়ে এলেন। এসে ঠিক গত রাতের মতোই আমার হাত দুটি ওঁর বুকের ওপর নিয়ে বললেন—একবার শুধু আমাকে দেখুন। তাকান আমার মুখের দিকে। আপনি দয়া না করলে আমাকে অকালেই ঝরে যেতে হবে।
হেনা আলমের পরশে কি যাদু আছে? হয়তো। আমি যেন মোমবাতির মতো গলে যেতে লাগলাম। এই অনিন্দ্যসুন্দরীকে আমার বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরে এই মুহূর্তে ওর মুখ চুম্বন করতে ইচ্ছে হল। কি যে হয়ে গেল আমার তা জানি না। হঠাৎ ওর হাত দুটি আমি নিজের মুঠোয় ধরে নিয়ে বললাম—আমি রাজি।
সেই মুহূর্তে হেনা আলমের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল উনি যেন স্বর্গ জয় করে ফেলেছেন। আমার হাত দুটিতে আলতো করে প্রেমিকার মতো চুমু খেয়ে আমার কাছ থেকে সরে গিয়ে বললেন—আমি জানি ডাক্তার, রাজি আপনি হবেনই। সত্যি, কি বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ দেবো। তাহলে শুনুন। এই নেকলেসটির দাম কম করেও এক লাখ টাকা। এবার নগদ আপনি যা চাইবেন তাই পাবেন।
আমি কাঁপা কাঁপা গলায় বললাম—টাকা আমি চাই না মিসেস আলম। আর ঐ নেকলেসেও আমার প্রয়োজন নেই। ওটা আপনি নিয়ে যেতে পারেন।
—সেকি! হেনা আলম লঘু পায়ে আমার দিকে এগিয়ে এলেন। তারপর ঠিক সেই আগের মতোই আমার হাত দুটি ধরে বললেন—এত টাকার প্রলোভন আপনি কি জন্য ছেড়ে দেবেন?

—শুধু মাত্র আপনার জন্য।
—তার মানে ?
—আমি আপনাকে চাই। আপনার রূপে আমি এমনই মুগ্ধ যে আপনার যৌবনের উত্তাপ আমাকে পেতেই হবে। এই মুহূর্তে আপনার চেয়ে লোভনীয় আমার কাছে আর কিছুই নেই। যদি আপনি কোন রকম সংকোচ না করে আমার বিছানায় চলে আসতে পারেন তাহলে আমি আপনার প্রস্তাবে এক কথায় রাজি।
হেনা আলমের দু'চোখে যেন আগুন জ্বলে উঠল। বললেন—ডাক্তার! আপনি আগুন নিয়ে খেলা করতে চাইছেন। আমার দেহটা বাদ দিয়ে আপনি অন্য কিছু চান।
—দেখুন, যে কাজ আমি করতে চাই না সে কাজ যদি নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে করতে হয় তাহলে তা এমন কিছুর জন্য করব যা দুর্লভ।
—এই আপনার শেষ কথা ?
—হ্যাঁ।
হেনা আলম নেকলেসটা গলায় পরে বোরখা মুড়ি দিয়ে যেমন এসেছিলেন ঠিক তেমনি চলে গেলেন।
আমি দরজা বন্ধ করে আবার বিছানায় এসে শুয়ে পড়লাম। আমার সর্বাঙ্গ তখন কামনার আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলছে। এঃ! আমি কি বোকা। কেন যে ওকে যেতে দিলাম। এই নিঝুম রাতে জোর করে ওকে আমার বিছানায় শোয়ালে নিশ্চয়ই ও চেঁচামেচি করত না। সুন্দরী রমণীকে জোর করেই ভোগ করতে হয় এই চিরকালের নিয়মটা ভুলে গিয়েই ভুল হল। তাই সারারাত বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে লাগলাম।
পরদিন সকালেই সেই মর্মান্তিক সংবাদটা কানে এলো। মিসেস হেনা আলম আত্মহত্যা করেছেন। খবরটা শুনেই শিউরে উঠলাম আমি। উঃ কি ভয়ঙ্কর। হেনা আলম মৃত্যুকে বরণ করে নিয়ে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে। কিন্তু ওর গর্ভের সেই সন্তানটা! সেটাও যে দম বন্ধ হয়ে মরে গেল। হায় ভগবান! সেই অসহায় মহাপ্রাণ, যেটা মাতৃগর্ভ থেকে একটু একটু করে বেড়ে উঠছিল...।
এমন সময় হঠাৎ আমার সামনে যারা এসে দাঁড়াল তাদের দেখব বলে আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। ভয়ে আমার মুখ কাগজের মতো সাদা হয়ে গেল।
—ইউ আর আণ্ডার অ্যারেস্ট মিঃ সেন।
আমি মড়ার মতো ফ্যাকাসে মুখে কাঁপা কাঁপা গলায় বললাম—হোয়াই ?
—সেটা থানায় গেলেই জানতে পারবেন।
—কেন এখন পারি না ?
—আপনি কি শুনেছেন মিসেস আলম স্যুইসাইড করেছেন ?
—শুনেছি। কিন্তু তার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক!
—আছে বৈকি। মরবার আগে তিনি একটি চিঠি লিখে গেছেন। তাতে লিখেছেন তাঁর মৃত্যুর জন্য আপনি দায়ী। তাঁর সরলতার সুযোগ নিয়ে আপনি তাঁর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করে তাঁকে প্রতারণা করেছেন। এবং তাঁকে আত্মহত্যা করতে প্ররোচনা করেছেন।

আমি চিৎকার করে উঠলাম—না না না। সী ইজ এ লায়ার। এসব সত্যি নয়। এ মিথ্যা। আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ। আপনারা বিশ্বাস করুন।
—আমাদের বিশ্বাস অবিশ্বাসে কিছুই যায় আসে না মিঃ সেন। আপনার সততা প্রমাণ করার জন্য আদালত আছে। আপনি ভীমরুলের চাকে হাত দিয়েছেন। এখন ঠ্যালা সামলান। থানায় চলুন। মেহবুব সাহেব আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।
আমার গা মাথা যেন পাক খেয়ে ঘুরতে লাগল। এই আকাশে চন্দ্র সূর্য কি সত্যিই ওঠে? ওঃ মাই গড্। হেল্প মি।

আমার মান ইজ্জত চাকুরির নিরাপত্তা সব কিছুই এক লহমায় বিপন্ন হয়ে পড়ল এক কথায় জীবনটাই নষ্ট হয়ে গেল আমার। ঐ সুন্দরী কুহকিনী কেন যে এ ক করল? কেন যে এইভাবে প্রতিশোধ নিল আমার ওপর তা ভেবেই পেলাম ন এখন ভাবছি কাল রাতে ঐ রকম প্রস্তাব না করে তার কথায় রাজি হলেই ল্যাঠা চু যেত। যেহেতু আমার অসহযোগিতায় তাকে মরতে হল সেই রাগে আমারও সর্বন করে গেল সে। পুলিশ ঠিকই বলেছে আমি ভীমরুলের চাকেই হাত দিয়েছি আমার সাধ্য কি যে মেহবুব সাহেবের সঙ্গে লড়ি? সাধ্য থাকলেও হেনা আলে ঐ রকম স্বীকারোক্তির পর আমার বাঁচাও তো অসম্ভব। আইনের চোখে আদালতে বিচারে আমার কি শাস্তি হবে জানি না। তবে মেহবুব সাহেব যে আমাকে জ্য কবর দেবেন তা বুঝতেই পারছি।
থানার লকআপে প্রায় আধ ঘণ্টা রাখার পর পুলিশ প্রহরায় আমাকে নিয়ে যাও হল মেহবুব সাহেবের মার্বেল প্যালেসে। একটি বিলাসবহুল হল ঘরের মতো ঘরে আমাকে এনে যখন বসানো হল তখন মেহবুব সাহেবের চেহারার দিকে তাকি শিউরে উঠলাম। কী পৈশাচিক মুখ। এর চেয়ে একটা হায়না ভালো। এখানক পুলিশ প্রশাসন সবাই সন্ত্রস্ত মেহবুব সাহেবের প্রতিপত্তি এবং ব্যক্তিত্বের কাছে।
মেহবুব সাহেবের চোখ কালো চশমায় ঢাকা। ক্রাচ দুটি কৌচের গায়ে ঠেস দি রাখা। টেবিলের ওপর একটা দোনলা বন্দুক। বাঘ মারা। একটি ব্লাঙ্ক ক্যাসে লাগানো টেপ রেকর্ডার। সেটা চালিয়ে দিয়ে তিনি বললেন—আপনিই ডাক্ত সেন্?
—হ্যাঁ।
—বসুন।
ঘরে একটা ছুঁচ পড়লেও যেন শব্দ হবে।
মেহবুব সাহেব পুলিশ এবং তাঁর লোকেদের বললেন—আপনারা সকলেই বাই যান। আমি না ডাকা পর্যন্ত কেউ এ ঘরে ঢুকবেন না বা এর ধারে কাছে আসবেন না ভীত সন্ত্রস্ত সবাই চলে গেল।

মেহবুব সাহেব বললেন—বয়স কত? দেখে তো ছেলেমানুষ বলেই মনে হচ্ছে। বিয়ে থা করেছেন?
ভয়ে ভয়ে বললাম—না।
—আমার স্ত্রীর সঙ্গে আপনার অবৈধ সম্পর্ক কত দিনের?
আমি অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বললাম—মেহবুব সাহেব। আল্লা কসম। ঈশ্বরের দোহাই। আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ।
—আমার স্ত্রীর ঐ স্বীকারোক্তিটা তাহলে মিথ্যা। কি বলুন? মেহবুব সাহেব এবার বন্দুকটা হাতে নিলেন। তারপর সেটা নিয়ে খেলা করতে করতে বললেন—কাল রাত্রেই বোধ হয় আপনি শেষবারের মতন আমার স্ত্রীর দেহটা ভোগ করেছেন, তাই না?
আমি মাথা নত করে বললাম—না না না। আপনি বিশ্বাস করুন আমি তার কোন ক্ষতি করিনি।
মেহবুব সাহেবের পৈশাচিক মুখে হিংস্রতা যেন প্রকট হয়ে উঠল। বললেন—রাতের অন্ধকারে ঐ রকম একজন সুন্দরী যুবতী আপনার ঘরে গেল আর আপনি তাকে ভোগ না করেই ছেড়ে দিলেন? এটা আমাকে বিশ্বাস করতে হবে?
—আপনি তো সবই জানেন দেখছি।
—আমার স্ত্রীর ব্যাপারে আমি জানব না তো কি অন্য লোক জানবে? রাতের অন্ধকারে সে বেরিয়ে গেল, কোথায় গেল আমি জানব না? বলতে বলতেই বন্দুকে গুলি পুরে মেহবুব সাহেব বললেন—এটা কার জন্য তৈরী করলাম বলুন তো?
—জানি না।
—আপনার জন্য। রাতের অন্ধকারে যে যুবক এক অসামান্যা সুন্দরীকে নাগালের মধ্যে পেয়েও ভোগ করতে পারে না এটা তার জন্যই খরচা করা উচিত। আপনিই বলুন না তাকে গুলি করে মারাটা উচিত কি না?
—আপনার কথার আমি কোন মানে পাচ্ছি না মেহবুব সাহেব।
—পারবেন পারবেন। একজনকে ভোগ করার জন্য মেরেছি একজনকে না করার জন্য মারব।
—মারবেন। তবে তার আগে ওর পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা একবার দেখুন। আমার রক্ত পরীক্ষা করান। মনে কোন সন্দেহ রাখবেন না মেহবুব সাহেব। আমি ওকে ভোগও করিনি। ওর গর্ভে আমার সন্তানও নেই।
—আমি জানি ডাক্তার। সব জানি। ওর গর্ভে এ অবৈধ সন্তানের বীজ যে বপন করেছে আমি তাকে নিজে হাতে গুলি করে মেরেছি। ও কিন্তু সেটা বুঝতে পারে নি। মানে আমি বুঝতে দিই নি। ওর প্রেমিককে মারবার আগে তাকে ভয় দেখিয়ে এমন একটা চিঠি আমি লিখিয়ে নিয়েছি যাতে ওর ধারণা হয়েছে ওর প্রেমিক ওকে প্রত্যাখ্যান করেছে। ও তো আপনাকে অনেক কিছু দিতে চেয়েছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনিই ওর অ্যাবরশানটা করালেন না কেন?
—আমি কখনো ও কাজ করিনি সাহেব। টাকার লোভে ঐ পাপ আমার দ্বারা সম্ভব নয়।
—আপনি খুব ধর্ম ভীরু লোক দেখছি। ভ্রূণ হত্যা করেন না। সুন্দরী যুবতীকে

রাত্রিবেলা বেডরুমে একা পেয়েও তাকে জোর করে ভোগ করেন না। টাকার লোভ করেন না। আপনাকে দিয়ে এ জগতের কোন কাজটা হবে শুনি। একেবারে যা তা লোক মশাই আপনি। যাক। আমার তরফ থেকে একটা সামান্য উপহার আপনাকে দিচ্ছি। এই নিন। এটা বাড়ি নিয়ে খুলে দেখবেন।
—কি আছে এতে?
—একটা বিশাল অঙ্কের টাকার চেক। আমি জানি এই ঘটনার পর আপনি আর এখানকার হাসপাতালে চাকরি করবেন না। নিজেই ইস্তফা দিয়ে চলে যাবেন। তাই সাময়িকভাবে যাতে আপনার কোন অসুবিধা না হয় সেইজন্যে এটা আপনাকে আমি দিচ্ছি। বলে একটি বড় খাম এগিয়ে দিলেন মেহবুব সাহেব। তারপর কি ভেবে জানি সেটা আবার চেয়ে নিয়ে তার ওপর নিজের নাম সই করে আমার নামটা ঘন ঘন করে লিখে দিলেন।
আমি অবাক হয়ে বললাম—শুনেছিলাম আপনি অন্ধ। কিন্তু আশ্চর্য। যেভাবে আপনি লেখালিখি করছেন বা এত কিছুর ওপর নজরদারি করছেন তাতে তো আপনাকে অন্ধ বলে মনেই হচ্ছে না।
মেহবুব সাহেব হেসে বললেন—শুনেছেন ঠিকই। এক মারাত্মক বিস্ফোরণে আমার এই রকম দশা হয়েছিল। একটি পা গেছে। মুখটাও পুড়ে ঝলসে গেছে। দৃষ্টি-শক্তিও হারিয়েছিলাম। তবে বহু চেষ্টার পর এবং বহু চিকিৎসার পর দুটি চোখেই অল্প অল্প দেখতে পাই। কিন্তু এ কথা আমি কাউকে বলিনি। এমন কি আমার স্ত্রীকেও না।
আমি অভিভূত হয়ে বললাম—কেন?
—আসলে আমার স্ত্রীকে আমি খুব ভালবাসতাম, আপনিই বলুন না কেন ঐরকম একজন নারীকে ভালো না বেসে কি পারা যায়? তা যাক। যখন বুঝতে পারলাম আমার এই অবস্থার পর ও অন্যের অনুগামী তখন মনে মনে খুবই দুঃখ পেলাম। কিন্তু সব জেনেও ওকে আমি বাধা দিই নি। নিজেকে শামুকের মতো গুটিয়ে নিয়ে-ছিলাম। পরপুরুষের সঙ্গে ও উপগত হোত। এক বিছানায় শুতো। সবই দেখতাম। এমন কি আমাকে অন্ধ ভেবে আমার সামনেই পরপরকে আলিঙ্গন চুম্বন করত। সব সহ্য করেছিলাম। কিন্তু যখন টের পেলাম ওরা অবাধ স্বাধীনতা পাবার আশায় আমার প্রচুর ধন সম্পত্তি আত্মসাৎ করে বরাবরের জন্য এখান থেকে পালাবার চেষ্টা করছে তখন আর থাকতে পারলাম না। প্রতিহিংসা নেবার জন্য তৎপর হলাম এবং ওদের একজনকে হত্যা করে প্রতিশোধ নিলাম। তারপর আমার স্ত্রী যখন আপনার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করল তখনও আমি ওর পিছু নিয়ে সব কিছু দেখলাম। আপনার দরজায় কান খাড়া করে ভেতরের কথা-বার্তা শুনলাম। আপনার আদর্শ এবং ব্যক্তিত্বকে অভিনন্দন জানাই। তবে শেষ দিন অবশ্য আপনি ওর কাছে অন্য একটি প্রস্তাব রেখেছিলেন। কিন্তু জোর করেন নি। তাতে অবশ্য আমি অসন্তুষ্ট নই। কেননা এটা হওয়াই স্বাভাবিক। তবে অর্থ লোভে ঐ ঘৃণ্য কাজটি যে আপনি করেন নি তার জন্য সামান্য একটু পুরস্কার অন্তত আপনার পাওয়া উচিত। তাই বিভিন্ন ব্যাঙ্কের কয়েকটা চেক আপনাকে দিলাম এবার আপনি যেতে পারেন।

—আপনি ?

—ডাক্তার ! দেরি করবেন না। মনে রাখবেন আপনি এখনো আসামী এবং পুলিশ আপনার জন্যে দরজার বাইরে অপেক্ষা করছে। আমাকে আমার বাকি কাজটুকু করতে দিন।

আমি চলে এলাম।

তবে ঘরের দরজা পার হবার সঙ্গে সঙ্গেই বন্দুকের গুলির শব্দ শুনে ছুটে গেলাম তাঁর কাছে, থুতনির নীচে বন্দুকের নলটা ঠেকিয়ে ট্রিগার টিপেছেন মেহবুব আলম। টেপ রেকর্ডার যন্ত্রে সেই গুলির শব্দ ধরা পড়েছে। পুলিশের উদ্দেশ্যে লেখা একটা চিঠি ও পড়ে আছে টেবিলের ওপর।

ততক্ষণে বাড়ির অন্যান্য লোকজন এবং পুলিশ, সবাই ছুটে এসেছে।

টেপ রেকর্ডারে বলা কথা এবং তাঁর চিঠির বিবরণ অনুযায়ী পুলিশ আমার বিরুদ্ধে আনা সমস্ত অভিযোগ তুলে নিল এবং আমাকে সসম্মানে আমার বাসায় পৌঁছে দিয়ে গেল।

বলা বাহুল্য কয়েকদিনের মধ্যেই আমি নিজের চেষ্টায় অন্য জায়গায় বদলি হয়ে গেলাম। হেনা আলম আমার সুন্দর জীবনের এক সকরুণ স্মৃতি। এটা তো ঠিক, শুধুমাত্র আমারই গোঁড়ামিতে সেই প্রস্ফুটিত ফুলটিকে অকালে ঝরে যেতে হ'ল। তাই মেহবুব সাহেবের কাছ থেকে উপহার হিসেবে পাওয়া ঐ চেকগুলো গ্রহণ করতে বিবেকে বাধল আমার। আসার সময় আমি সেগুলো পুলিশকেই দিয়ে এলাম।
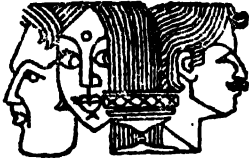
মানুষের মহিমা

—প্রফুল্ল রায়

পুরনো আমলের নরম গদিওলা বিশাল খাটটার ঠিক মাঝখানে শুয়ে আছেন রেবতী-মোহন। তাঁর দু'চোখ বোজা। গলার ভেতর থেকে কিছুক্ষণ পর পর আধফোটা কাতর আওয়াজ বেরিয়ে আসছে।

মাথার ওপর পঞ্চাশ বছর আগের চার ব্লেডের ফ্যানটা ফুল স্পীডে ঘুরে যাচ্ছে। তবু প্রচুর ঘামছেন বেরতীমোহন। পরনের পায়জামা এবং পাঞ্জাবি ভিজে সপসপে হয়ে যাচ্ছে।

ওল্ড বালিগঞ্জের নিরিবিলি অভিজাত পাড়ায় বিরাট কমপাউণ্ডওলা বাড়ির দোতলায় রেবতীমোহনের এই বেডরুম। গথিক স্টাইলের এই বাড়িটা তৈরি হয়েছিল বৃটিশ আমলে, এই সেঞ্চুরির গোড়ার দিকে।

রেবতীমোহনের পাশে বসে তোয়ালে দিয়ে মাঝে মাঝেই তাঁর গলা কপাল মুছে দিচ্ছে সুতপা। কিন্তু পরক্ষণেই আবার চামড়ার তলা থেকে দানা দানা ঘাম ফুটে বেরুচ্ছে। এ সব কিসের লক্ষণ বুঝতে অসুবিধা হয় না তার। ঠিক দু'বছর আগে একবার মারাত্মক হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে রেবতীমোহনের। হুবহু সেই সব চিহ্নই আজ আবার দেখা যাচ্ছে। উদ্বিগ্ন মুখে পলকহীন তাঁর দিকে তাকিয়ে কাঁপা গলায় সুতপা ডাকে, 'বাবা, বাবা—'

রেবতীমোহন উত্তর দেন না।

সাড়া যে পাওয়া যাবে না, সেটা ভাল করেই জানে সুতপা। রেবতীমোহন অজ্ঞান হয়ে আছেন। কোনো কিছু শোনা বা অনুভব করার শক্তি তাঁর লুপ্ত হয়ে গেছে। তবু যে সুতপা প্রায়ই ডাকছে তার কারণ একটাই। নিজের হলেও একটা জীবন্ত মানুষের কণ্ঠস্বর তো শোনা যাচ্ছে। সে ছাড়া ওল্ড বালিগঞ্জের এত বড় বাড়িতে সুস্থ সবল মানুষ আর একজনও নেই। দুটি কাজের লোক ছিল পরশু পর্যন্ত। তাদের একজনের মা মারা গেছে, আরেকজনের মেয়ের বিয়ে। দু'জনকেই ছুটি দিতে হয়েছে। দশ বারো দিনের আগে কেউ ফিরবে না।

বাইরে এই মুহূর্তে তুমুল বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে মেঘের একটানা গজরানি। আকাশটাকে আড়াআড়ি চিরে, থেকে থেকেই বিদ্যুৎ চমকে যায়।

শুরু হয়েছিল সেই বিকেলে। তারপর একনাগাড়ে ঝরেই চলেছে। সীসার ফলার মত লক্ষ কোটি বৃষ্টির ফোঁটা আকাশ থেকে অনবরত নেমে আসছে। এই বৃষ্টি আদৌ যে থামবে তার কোনো লক্ষণই নেই। কলকাতা যেন মহাবিশ্বের আদিম কোনো দুর্যোগের দিনে ফিরে গেছে।

সুতপা বুঝতে পারছিল, এখনই ডাক্তার দরকার। কিন্তু কাজের লোকেরা তো নেই-ই, তা ছাড়া টেলিফোনটাও সপ্তাহ দুয়েক ধরে অচল হয়ে আছে। বার বার খবর দিয়েও কিছুই হয়নি। জীবন্ত মানুষের পৃথিবী থেকেই এই রাত্তিরে তারা যেন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

চোখ তুলে একবার সামনের দিকে তাকায় সুতপা। এ বাড়ির অন্য সব কামরার আসবাবের মতোই রেবতীমোহনের এই বেডরুমের খাট আলমারি ডিভান ড্রেসিং টেবিল, সব কিছুতেই প্রাচীনত্বের ছাপ মারা। একধারে নিচু ডিভানে ঘুমোচ্ছে টুটুল। পাঁচ বছরের টুটুল সুতপার একমাত্র ছেলে। রেবতীমোহনের পাশের ঘরটাই সুতপা এবং টুটুলের। কিন্তু খানিকক্ষণ আগে রেবতীমোহনের স্ট্রোকের লক্ষণ দেখা দিতেই সুতপা ঘুমন্ত ছেলেকে তুলে এনে ঐ ডিভানটায় শুইয়ে দিয়েছে।

টুটুলের মাথার কাছে একটা গ্র্যান্ড ফাদার ক্লক। পিয়ানোর টুং টাং আওয়াজ তুলে সেটা দিনরাত বেজে যায়। সুতপা দেখল, এখন বারোটা বেজে চল্লিশ। এই দুর্যোগের রাতে কলকাতা যখন রসাতলে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, সেই সময় কীভাবে ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব, ভেবে পায় না সুতপা। আশি বছরের এক রোগাক্রান্ত বেহুঁশ বৃদ্ধ, ঘুমন্ত একটি শিশু ছাড়া এ বাড়িতে আর যে কেউ নেই। অরক্ষিত তাদের ফেলে বেরুনোও যায় না। বেরুলেও এই মধ্যরাতে ট্যাক্সি বা অটো কিছুই পাওয়া যাবে না। তার মতো তরুণীর পক্ষে একা একা প্রবল বৃষ্টি মাথায় নিয়ে দেড় কিলোমিটার হেঁটে হাউস ফিজিসিয়ানকে ডেকে আনা প্রায় অকল্পনীয় ব্যাপার। কিন্তু একটা কিছু না করলেই নয়।

অথচ রেবতীমোহনকে নিয়ে সুতপার এত যে উৎকণ্ঠা এবং দুর্ভাবনা, তার কোনো প্রয়োজনই ছিল না। দেড় বছর আগে অমলের সঙ্গে ডিভোর্স হবার পরই এ বাড়ির সঙ্গে তার সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবার কথা। কোর্ট রায় দিয়েছিল, যতদিন না টুটুল সাবালক হচ্ছে, সে তার কাছেই থাকবে।

অমল রেবতীমোহনের একমাত্র ছেলে। একটা বড় মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানির সে টপ একজিকিউটিভ। তার সঙ্গে সুতপার বিয়েটা কোনো দিক থেকেই সুখের হয়নি। টুটুলের জন্মের কিছুদিন পর থেকেই তাদের সম্পর্ক খারাপ হয়ে যেতে থাকে। তখন প্রতি সপ্তাহে দু-তিন দিন বাড়ি ফিরত না অমল। পরে মাসে এক-আধদিন হয়ত আসত। খবর পাওয়া গিয়েছিল লাউডন স্ট্রীটে একটা সিন্ধী মেয়েকে নিয়ে সে থাকে। যাকে 'লিভিং টুগেদার' বলে, তা-ই আর কি। তাকে ফেরাবার জন্য রেবতীমোহন এবং সুতপা প্রথম দিকে অনেক বুঝিয়েছে। অমল সে সব কানেও তোলেনি। পরে এই নিয়ে ঝগড়াঝাটি অশান্তি এবং তিক্ততা লেগেই থাকত। শেষ পর্যন্ত কোর্টে না গিয়ে উপায় ছিল না।

ডিভোর্স হয়ে যাবার পর টুটুলকে নিয়ে দিল্লিতে মা-বাবার কাছে চলেই যেত সুতপা। কিন্তু রেবতীমোহন যেতে দেন নি। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন সরকারি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। আইডিয়ালিস্ট এবং হৃদয়বান এই মানুষটির চরিত্র ইস্পাতের ফলার মতো ঝকঝকে। কোনোরকম অন্যায়ের সঙ্গে তিনি আপস করতে জানেন না।

ডিভোর্স হয়ে যাবার পর ছেলেকে তিনি আর এ বাড়িতে ঢুকতে দেন নি। তাঁর যাবতীয় প্রপার্টি, ব্যাঙ্কের টাকা এবং বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার—সব সুতপার

নামে লিখে দিয়েছিলেন। সুতপা প্রবল আপত্তি করেছে, রেবতীমোহনের আত্মীয়-স্বজনেরা এসে অনেক বুঝিয়েছে কিন্তু একরোখা জেদী মানুষটিকে টলানো যায় নি। তিনি সুতপা এবং টুটুলকে এ বাড়ি থেকে যেতেও দেননি। সুতপার জীবনে যে চরম ক্ষতি হয়ে গেছে, হয়ত এভাবেই তার কিছুটা পূরণ করতে চেয়েছেন রেবতীমোহন।
হঠাৎ গোঙানির মতো আওয়াজে চমকে রেবতীমোহনের দিকে তাকায় সুতপা। আর তাকিয়েই মনে হয়, তার শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে বরফের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। রেবতী মোহনের চোখ দুটো এখন খোলা, দৃষ্টি স্থির। ঠোঁটদুটো অনেকটা ফাঁক হয়ে আছে, জিভ গালের পাশ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। সবচেয়ে যেটা ভয়াবহ, তা হল মুখটা আস্তে আস্তে ডানদিকে বেঁকে যাচ্ছে। আর এখন প্রচণ্ড ঘামছেন রেবতীমোহন। শরীরের সব জলীয় পদার্থ গল গল করে বের হয়ে আসছে তাঁর।
রেবতীমোহনকে দেখতে দেখতে মারাত্মক ভয় পেয়ে যায় সুতপা। সে অস্থির ভাঙা গলায় সমানে ডাকতে থাকে, 'বাবা, কী কষ্ট হচ্ছে আপনার? বলুন—বলুন—'
আগের মতোই কোনো সাড়া নেই।
এই মুহূর্তে কিছু একটা করা খুব জরুরী, এবং তা করতেই হবে। কিন্তু কী যে করবে, ভেবে পায় না সুতপা। চিন্তা করার শক্তিটাই তার দ্রুত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মাথার ভেতরটা কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেছে। এখন যদি একটা সুস্থ সবল মানুষ তার পাশে থাকত, অনেকটা ভরসা পেত সুতপা।
প্রচণ্ড স্নায়বিক ভীতি এবং অস্থিরতার মধ্যেও সুতপা স্থির করে ফেলে, রেবতীমোহনকে বাঁচাতেই হবে। অন্তত শেষ একটা চেষ্টা না করলেই নয়। একটা মানুষকে এমন নিরুপায়ভাবে মরতে দেওয়া যায় না। মরিয়া হয়েই খাট থেকে নেমে পড়ে সে। একটা ছাতা আর টর্চ খুঁজে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়। যেভাবেই হোক, ডাক্তার নিয়ে আসতেই হবে।
ঘরের জানালা টানালা বন্ধ থাকায় বৃষ্টির আওয়াজ ততটা জোরালো মনে হচ্ছিল না। বাইরে আসতেই শব্দটা পঞ্চাশ গুণ হয়ে কানের পর্দায় ধাক্কা দিতে থাকে। ডাইনে-বাঁয়ে-সামনে-পেছনে, আকাশটা গলে গলে নেমে আসছে। দশ ফুট দূরের কিছুই প্রায় এখন আর দেখা যাচ্ছে না। অবিরাম বৃষ্টির আড়ালে সব কিছু বিলীন হয়ে গেছে।
রেবতীমোহনের ঘরের দরজাটা বাইরে থেকে টেনে ভেজিয়ে দেয় সুতপা। তারপর প্যাসেজে, ব্যালকনিতে এবং একতলায় নামার সিঁড়িতে যেখানে যত আলো রয়েছে, সুইচ টিপে টিপে জ্বালিয়ে দিতে লাগল সে। যতক্ষণ না সে ফিরে আসে, আলো-গুলো জ্বলতে থাক।
নিচে এসে ভয়ানক দমে যায় সুতপা। সামনের দিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে লন। তারপর উঁচু কমপাউণ্ড ওয়ালের গায়ে ভারী লোহার গেট। লন-এ প্রায় এক ফুট জল দাঁড়িয়ে গেছে। রাস্তা থেকে এই বাড়িটা বেশ উঁচুতে। বাড়ির লন-এরই যদি এই হাল হয়ে থাকে, রাস্তাটা নিশ্চয়ই দেড় দু ফুট জলের তলায় ডুবে গেছে।
সুতপা লক্ষ্য করল, এ রাস্তায় কর্পোরেসনের আলোও জ্বলছে না। শুধু রাস্তাতেই নয়, খানিকটা দূরে দূরে বড় কমপাউণ্ডের ভেতর বাংলো টাইপের যে বাড়িগুলো রয়েছে সেসব জায়গাতেও আলোর চিহ্নমাত্র নেই। যতদূর চোখ যায়, নিরেট অন্ধকার

এবং অবিরাম বৃষ্টিপাত সব কিছু ঢেকে রেখেছে। রাস্তার জল আর জমাট অন্ধকার ঠেলে দেড় কিলোমিটার দূরে ডাক্তারের বাড়ি আদৌ পৌঁছুতে পারবে কিনা, সুতপা জানে না।
এ রাস্তায় প্রতিটি ম্যানহোলের মুখ খোলা। লোহার ঢাকনিগুলো কবেই চুরি হয়ে গেছে। অন্ধকারে জলের তলায় অদৃশ্য ম্যানহোলে পা পড়লে সুতপা কোথায় তলিয়ে যাবে, কে জানে।
কয়েক মুহূর্ত দ্বিধান্বিতের মতো দাঁড়িয়ে থাকে সুতপা। তারপর হঠাৎ অদম্য এক জেদ তার ওপর যেন ভর করে। যা হবার হোক, তবু ডাক্তারের কাছে তাকে যেতেই হবে।
সুইচ টিপে নিচের পোর্টিকোর আলো জ্বালে সুতপা। লন-এর দু'ধারে উঁচু পোস্টে দুটো ফ্লাড লাইটের ব্যবস্থা আছে। ও দুটো জ্বললে গোটা লন-এর এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত সবটা দেখা যায়।
ফ্লাড লাইটের বোতাম টিপেই চমকে ওঠে সুতপা। প্রবল বৃষ্টিপাতের মধ্যেও দেখতে পায়, কে যেন গেট টপকে লাফ দিয়ে এপারে নেমে পড়ল। তার মুখ-চোখ স্পষ্ট দেখা না গেলেও আবছাভাবে বোঝা যায় সে একটা মানুষই। কী উদ্দেশ্যে এই দুর্যোগের রাতে সে এ বাড়িতে ঢুকেছে তা জলের মতো পরিষ্কার। ভেতর দিক দিয়ে তালা লাগানো বলে লোকটাকে ওভাবে গেট পেরুতে হয়েছে।
ভয়ে আতঙ্কে শরীর আড়ষ্ট হয়ে যায় সুতপার। বৃষ্টির আওয়াজ তো আছেই, সেই সঙ্গে আকাশ ফাটিয়ে মেঘ ডেকে যাচ্ছে, কাছে দূরে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বাজও পড়ছে। এত শব্দের মধ্যে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করলেও কেউ শুনতে পাবে না। লোকটা বিনা বাধায় তাকে খুন করে নির্বিঘ্নে এ বাড়ির সব কিছু লুট করে নিয়ে যেতে পারে।
লোকটাও সুতপাকে দেখতে পেয়েছিল। এই সৃষ্টিছাড়া বর্ষার রাতে পৃথিবী যখন গাঢ় অন্ধকার এবং বৃষ্টিতে ডুবে যাচ্ছে, আচমকা কেউ ফ্লাড লাইট জ্বালিয়ে দেবে, এটা খুব সম্ভব সে ভাবতে পারেনি। গেটে পিঠ ঠেকিয়ে লোকটা নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকে। অনেকক্ষণ পলকহীন তাকিয়ে থাকার পর হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো একটা কিছু সুতপার মাথার ভেতর দিয়ে বয়ে যায়। লোকটা যেমনই হোক—খুনী, ডাকাত, ছিনতাইবাজ বা অন্য কোনো ধরনের সমাজবিরোধী—তবু একটা মানুষ তো। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে নিজের অজান্তেই সুতপা জোরে জোরে ডাকে, 'এখানে একটু আসবেন—'
বৃষ্টি বা মেঘের ডাক ছাপিয়ে সুতপার গলা লোকটার কানে ঠিকই পৌঁছে যায়। কিন্তু সে উত্তর দেয় না।
আরো বারকয়েক ডাকাডাকির পর লোকটা পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে। হয়ত ভাবে, একটা কম বয়সের তরুণী কতটা আর ক্ষতি করতে পারবে।
কাছাকাছি আসতে লোকটাকে স্পষ্ট দেখা যায়। বয়স ত্রিশ-বত্রিশ। চারকোণা চোয়াড়ে মুখ। গাল বসে গিয়ে হাড় বেরিয়ে পড়েছে। চোখ এক ইঞ্চ গর্তে ঢোকানো। কপালে গালে বসন্ত ছাড়াও প্রচুর কাটাকুটির দাগ। ওগুলো যে বেদম মারের চিহ্ন, বলে দিতে হয় না।

লোকটার পরনে তালিমারা খাটো ফুলপ্যাণ্ট আর হাত-কাটা কালো জামা, পায়ের কেডসটাতেও অগুনতি তালি। কোমরে ইঞ্চি আটেক একটা খাপে কিছু পোরা আছে। ওটা কী, সুতপা এক পলকে দেখে বুঝে নেয়। তেমন বুঝলে সে বেপরোয়া ছুরির চালিয়ে দিতে পারে। সে যে কোন স্তরের জীব, দেখামাত্রই টের পাওয়া যায়।
লোকটার সারা গা এবং জামা-প্যাণ্ট থেকে জল ঝরে ঝরে পোর্টিকোর তলাটা ভিজে যেতে থাকে। সে যে অনেকক্ষণ ভিজেছে সেটা তার সিঁটানো আঙুল এবং ঠোঁট দেখে বোঝা যায়।
পোর্টিকোর সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আছে সুতপা, নিচে লোকটা। সন্দিগ্ধ সতর্ক দৃষ্টিতে সে সুতপাকে লক্ষ্য করছে।
সুতপা ব্যাকুলভাবে এবার বলে, 'আমাদের ভীষণ বিপদ। দয়া করে একটু সাহায্য করবেন?'
এর জন্য লোকটা প্রস্তুত ছিল না। সে প্রথমটা হকচকিয়ে যায়। সুতপার ওপর চোখ রেখে চাপা গলায় বলে, 'কী সাহায্য?'
আমার শ্বশুর মশাই খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। বাড়িতে আমি আর আমার পাঁচ বছরের ছেলে ছাড়া আর কেউ নেই। টেলিফোনটাও ক'দিন ধরে অচল হয়ে আছে। এখনই একজন ডাক্তার না ডাকলে শ্বশুর মশাইকে বাঁচানো যাবে না।'
'তা আমাকে কী করতে হবে?'
'যদি কষ্ট করে আমাদের ফ্যামিলির ডাক্তারকে একটা খবর দেন—'
লোকটা চুপ।
সুতপা এবার প্রায় মিনতিই করতে থাকে, 'বিশ্বাস না হলে একবার ওপরে এসে আমার শ্বশুর মশাইকে দেখে যান—' ঝোঁকের মাথায় বলতে বলতে থেমে যায় সে। এমন জঘন্য ধরনের একটা লোককে কোনোভাবেই যে ওপরে নিয়ে যাওয়া উচিত না, সেটা মনে পড়তেই ভেতরে ভেতরে অস্বস্তি বোধ করতে থাকে।
লোকটা রুক্ষ গলায় বলে, 'নকশাবাজি ছাড়ুন। আপনার কথায় ওপরে যাই, আর আপনি ফাঁসিয়ে দিন। ও সব ধান্দা চলবে না মেম সাহেব।
এ ধরনের কথা আগে কখনও শোনে নি সুতপা। বুঝতে অবশ্য অসুবিধে হচ্ছে না। লোকটা তাকে একেবারেই বিশ্বাস করছে না। তার ধারণা ভুলিয়ে ভালিয়ে সুতপা তাকে দোতলায় নিয়ে গিয়ে ফাঁদে ফেলে দেবে। অসহায় ভঙ্গিতে সে বলে, 'আমি কী বিপদে পড়েছি, ওপরে না গেলে কেমন করে দেখাব!'
সুতপার মুখচোখ দেখে এবং কণ্ঠস্বর শুনে লোকটার হয়ত মনে হয়, সে সত্যিই বলছে। কিন্তু সে খুব সম্ভব জগতের কোনো মানুষকেই বিশ্বাস করে না। জলে ভিজে তার কাঁপুনি ধরে গিয়েছিল। সে বলে, 'যত ঝামেলাতেই পড়ুন, আমি ক্যাচাকলে পা ঢোকাচ্ছি না। যা বলার এখানেই বলে ফেলুন।'
সুতপা এবার হতাশই হয়ে পড়ে। যে লোকটা প্রথম থেকেই তাকে অবিশ্বাস করছে তার কাছ থেকে কোনোরকম উপকার বা সাহায্য পাওয়া যাবে কিনা, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। তবু নৈরাশ্যের একেবারে শেষ প্রান্তে পৌঁছে সুতপা বলে, 'আমাদের ফ্যামিলির ডাক্তারকে যদি একবার খবর দেন—' একটু থেমে আবার বলে, 'মানে, আমার মতো একটা মেয়ের পক্ষে একা একা এই ঝড়বৃষ্টিতে বেরুনো—' বলতে

বলতে চুপ করে যায় সে।
বাহাদুর প্রস্তাবটা ঠিক এই চেহারায় আসবে ভাবতে পারে নি লোকটা। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর সুতপার বিপন্নতা খানিকটা যেন আঁচ করতে পারে সে। বলে, 'ডাক্তারের কাছে আমাকে পাঠিয়ে ওপরে গিয়ে ফোন করে দিন। ডাক্তার আমাকে ধরে—' কথাটা আর শেষ করে না সে।
সুতপা বলে, 'আপনাকে তো আগেই বলেছি, আমাদের ফোন বেশ কিছুদিন খারাপ হয়ে আছে। ওটা ঠিক থাকলে আপনাকে কষ্ট দিতাম না।'
লোকটা একটু চিন্তা করে বলে, 'আপনাদের ডাক্তার কোথায় থাকে?'
সুতপা একটা রাস্তার নাম এবং বাড়ির নম্বর বলে। লোকটা প্রায় লাফিয়ে ওঠে, 'উরি শ্লা, ওখানে যেতে এখন ইস্টিমার লাগবে। রাস্তা ফাস্তার যা হাল হয়েছে! আপনি কি মেমসাহেব আমাকে যমের বাড়ি চালান করতে চান?'
এ কথার উত্তর হয় না। সুতপা চুপ করে থাকে।
সুতপার মুখের দিকে তাকিয়ে এবার হয়ত করুণাই হয় লোকটার। সে বলে, 'ঠিক আছে। আপনি যখন ঝামেলায় পড়েই গেছেন তখন দেখি কী করা যায়। ডাক্তারের ঠিকানাটা যেন কী বলছিলেন—'
সুতপা রাস্তার নাম এবং বাড়ির নম্বর আরেক বার জানিয়ে দেয়। লোকটা আর দাঁড়ায় না। পোর্টিকো পেরিয়ে গেটের দিকে পা বাড়ায়। হঠাৎ কিছু মনে পড়তে অত্যন্ত ব্যস্তভাবে সুতপা পেছন থেকে ডাকে, 'শুনুন—'
প্রবল তোড়ে বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে। ভিজতে ভিজতে থমকে দাঁড়ায় লোকটা। ঘাড় ফিরিয়ে বিরক্ত গলায় বলে, 'আবার কী?'
সুতপা বলে, 'একটু দাঁড়ান, আপনাকে একটা ছাতা এনে দিচ্ছি। আর গেটেও তালা লাগানো রয়েছে। ওটা খুলে না দিলে—'
এমন হাস্যকর অসম্ভব কথা বোধহয় লোকটা আগে আর কখনও শোনেনি। অদ্ভুত হাসে সে, একটি কথাও না বলে প্রচণ্ড বৃষ্টি মাথায় নিয়ে, লন পেরিয়ে, গেট টপকে বাইরের রাস্তায় নেমে যায়। পরক্ষণে তার সিলুয়েট হয়ে যাওয়া শরীরের ঝাপসা কাঠামো গাঢ় অন্ধকার এবং বৃষ্টির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়।
লোকটা চলে যাবার পর অনেকক্ষণ পোর্টিকোর তলায় দাঁড়িয়ে থাকে সুতপা। তারপর চারিদিকের সবগুলো আলো জ্বালিয়ে রেখেই রেবতীমোহনের ঘরে ফিরে আসে। এই ঘরের দক্ষিণ দিকের জানালা দিয়ে পুরো লন, গেট এবং সামনের রাস্তার অনেকটা অংশ দেখা যায়।
সুতপা লক্ষ্য করল, টুটুল আগের মতই অসাড়ে ঘুমোচ্ছে। আর রেবতীমোহন একই-রকম চিত হয়ে শুয়ে আছেন। চোখ তেমনই খোলা, গলার ভেতর থেকে আবছা ঘড়ঘড়ে গোঙানি বেরিয়ে আসছে। তবে মুখটা একদিকে আরো কিছুটা বেঁকে গেছে। খানিকক্ষণ আগে যেমন দেখে গিয়েছিল, তেমনই ঘামছেন।
একসময় রেবতীমোহন ছিলেন আশ্চর্য সুপুরুষ। দারুণ স্বাস্থ্য ছিল তাঁর। প্রথম স্ট্রোকটি হবার পর শরীর ভেঙেচুরে এখন ধ্বংসস্তূপ। আরেকটা স্ট্রোকের ধাক্কা সামলাতে পারবেন কিনা, কে জানে।
পাশে বসে তোয়ালে দিয়ে রেবতীমোহনের ঘাম মুছিয়ে দেয় সুতপা। তারপর রোগা

ফ্যাকাশে ডান হাতটি তুলে নাড়ি দেখে। তিরতির করে সেটা ওঠানামা করছে। বুকের ওপর হাত রেখে টের পায়, হৃৎপিণ্ড এখনও একেবারে বন্ধ হয়ে যায় নি।
রেবতীমোহনের শুশ্রূষা করতে করতে বার বার সুতপা গেটের দিকে তাকায়। লোকটা সেই যে গেছে, তারপর ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। কিন্তু এখনও ডাক্তার আসছেন না। চেহারা চালচলন দেখে লোকটাকে যেটুকু বোঝা গেছে তাতে তার কাছে কোনোরকম দায়িত্ববোধ আশা করা যায় না। হয়ত ডাক্তারকে সে খবর না দিয়েই চলে গেছে। রেবতীমোহনের যা অবস্থা, ডাক্তার না এলে কী হবে, ভাবতে সাহস হয় না সুতপার। আরো আধঘণ্টা অসীম উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটিয়ে সুতপা যখন বুঝতে পারে তার শেষ আশাটুকুও প্রায় বিলীন হয়ে এসেছে, সেই সময় গেটের কাছে একটা প্রাইভেট কারের হেড লাইটের জোরালো আলো এসে পড়ে। পরক্ষণেই সেই লোকটার চিৎকার শোনা যায়, 'মেমসাহেব, তালা খুলে দিন। ডাক্তারবাবুকে নিয়ে এসেছি।'
সুতপা টের পায়, ঝিমিয়ে আসা অবসন্ন হৃৎপিণ্ডে আচমকা হাজারটা ঘোড়া যেন ঝড়ের গতিতে ছুটতে শুরু করেছে। সে প্রায় লাফ দিয়েই খাট থেকে নেমে, গেটের চাবি নিয়ে, একসঙ্গে দু'তিনটে সিঁড়ি টপকে টপকে একতলায় এসে দৌড়ে গিয়ে তালা খুলে দেয়।
বৃষ্টি অঝোরে ঝরেই যাচ্ছে।
একটু পর একটা গাড়ি লন পেরিয়ে পোর্টিকোর তলায় এসে থামে। দরজা খুলে সুতপাদের পারিবারিক চিকিৎসক মধ্যবয়সী ডাক্তার সেন নেমে আসেন। তাঁর গায়ে রেন-কোট। হাতে ঢাউস মেডিক্যাল ব্যাগ। একটু দূরে সেই লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। তার সারা শরীর বেয়ে জলের স্রোত নেমে আসছে। বোঝাই যায়, মাথায় বৃষ্টি নিয়ে সমস্ত রাস্তা কোমর সমান জল ঠেলে ঠেলে সে ডাক্তারের কাছে খবর দিতে গিয়েছিল।
সুতপাও গেট খুলতে গিয়ে ভিজে গিয়েছিল। ডাক্তার সেনের গাড়ি পৌঁছবার আগেই সে পোর্টিকোর তলায় চলে এসেছে।
ডাক্তার সেন বলেন, 'কী ব্যাপার সুতপা? কী হয়েছে তোমার শ্বশুরের?'
সুতপা বলে, 'রাত্তিরে খাওয়া দাওয়ার পর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন মনে হচ্ছে, আরেক বার অ্যাটাক হয়েছে।'
ডাক্তার সেন চমকে ওঠেন, 'চল চল—' লম্বা পায়ে তিনি সিঁড়ি ভাঙতে থাকেন। তাঁর পাশাপাশি সুতপাও ওপরে উঠতে থাকে।
দোতলায় এসে ক্ষিপ্র গতিতে রেবতীমোহনের হার্ট টার্ট পরীক্ষা করে পর পর দুটো ইঞ্জেকসান দেন ডাক্তার সেন। মিনিট কয়েকের মধ্যে গোঙানি বন্ধ হয়ে যায়, মুখটা ফের স্বাভাবিক হতে শুরু করে।
রোগীর মুখচোখের পরিবর্তন দেখতে দেখতে টেনসান কেটে যেতে থাকে ডাক্তার সেনের। বলেন, 'ধাক্কাটা বোধহয় এবারেও কাটিয়ে উঠলেন তোমার শ্বশুরমশাই। তবে কাল ই সি জি না করে এর বেশি আর কিছু বলব না। পেশেণ্টের কাছে বাকি রাতটা আমাকে থাকতে হবে।' একটু থেমে বলেন, 'এখন এই ইঞ্জেকসান দুটো না পড়লে ফেটাল কিছু ঘটে যেতে পারত। লোকটাকে ঠিক সময়েই পাঠিয়েছিলে। কে লোকটা? আগে তো কখনও তোমাদের বাড়িতে দেখিনি।'

সুতপা হকচকিয়ে যায়। ডাক্তার আসার পর লোকটার কথা তার খেয়াল ছিল না। তার মাথা থেকে সে বেরিয়ে গিয়েছিল। জড়ানো গলায় কোনোরকমে সুতপা বলে 'আমাদের আত্মীয় বলতে পারেন।'

'খুব সিনসিয়ার লোক। দুর্দান্ত দায়িত্ববোধ। সারাটা রাস্তা ভিজে, জল ঠেলতে ঠেলতে গেছে। আমার ড্রাইভার তো ক'দিন ধরে জ্বরে পড়ে আছে। নিজেকেই গাড়ি চালিয়ে আসতে হল। এত জল যে খানিকটা আসতে না আসতেই ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল। তারপর বাকি রাস্তা ঐ ছেলেটা আমার গাড়ি ঠেলে নিয়ে এসেছে।'

ডাক্তার সেনের শেষ কথাগুলো যেন শুনতে পাচ্ছিল না সুতপা। উদ্‌ভ্রান্তের মতো সে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'ডাক্তার সেন, আপনি পেশেন্টের কাছে একটু বসুন। আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরে আসছি।'

নিচে পোর্টিকোর তলায় এসে থমকে দাঁড়ায় সুতপা। যার জন্য নেমে আসা তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। সুতপার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য সে অপেক্ষা করে নি। এই বিশাল মহানগরে অন্তহীন দুর্যোগের মধ্যে লোকটা কোথায় উধাও হয়ে গেছে, কে বলবে। কিছুক্ষণ পর ক্লান্ত ভঙ্গিতে সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠতে উঠতে সুতপার মনে হয়, মানুষ একেবারে নষ্ট হয়ে যায় নি। তার ওপর এখনও কিঞ্চিৎ ভরসা রাখা যায়।
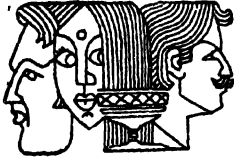
পুরোনো স্পর্শ

—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

প্রথম দর্শনে বুকটা খুব দমে যায়। মনে হয় যেন সম্পূর্ণ একটা অচেনা বাড়ি। লোহার গেটের দুপাশে দোকান ঘর, তারপর সরু এক চিলতে বাগান, তাতে কিছু চন্দ্রমল্লিকা নেতিয়ে আছে। একজন ছুতোর মিস্ত্রি চেয়ার সারাচ্ছে এক পাশে বসে। বাড়ির ভেতর থেকে একটি চোদ্দ পনেরো বছরের ছেলে বেরিয়ে এসে প্রায় ছুটতে ছুটতে চলে গেল গেটের বাইরে।

ভদ্রলোকটি বললেন, আসুন, ভিতরে আসুন।

বিকাশ থমকে দাঁড়িয়ে আছে। চার পাশ দেখছে। ঠিকানা ভুল হয়নি তো? সে কিছুই চিনতে পারছে না। এ বাড়িটাকেও তো খুব নতুন বলে মনে হয় না।

বিকাশ আপন মনে বলল, অনেক বড় বাগান ছিল, অনেক গাছপালা, দুটো পুকুর ছিল•• ভদ্রলোক বললেন, একটা পুকুর অবশ্য এখনও আছে। সে রকম বড় কোন বাগানের কথা আমার মনে পড়ে না।

বিকাশ লোকটিকে মনোযোগ দিয়ে দেখল। বিকাশের থেকে অন্তত পনেরো ষোল বছরের ছোট তো হবেই। সদ্য পাট ভাঙা ক্রিম সাফারি স্যুট পরা, মাথার চুল নিখুঁত ভাবে আঁচড়ানো, চোখে ফ্রেম ছাড়া চশমা, একটু বেশি বেশি ভদ্র ব্যবহার।

বিকাশ বলল, চলুন তো পুকুরটা একবার দেখি।

বাড়ির ডান পাশটায় কিসের যেন ছোটখাটো একটা কারখানা। ভেতরে লোহার সঙ্গে লোহা ঘষার কর্কশ শব্দ হচ্ছে।

হাঁটতে হাঁটতে বিকাশ জিজ্ঞেস করল, আপনার নামটা যেন কি বললেন?

—ইউসুফ রেজা। আপনি বোধহয় আমার বাবাকে চিনবেন। মাহবুব খান, দশ বছর আগে তাঁর ইন্তেকাল হয়েছে। তিনি কলকাতায় থাকতেন। তিনিই এই বাড়ি···

—অনেক কাল আগের কথা। আমারও ভাল মনে নেই সব কথা। কিন্তু কি জানেন। এই বাড়ির ছবি আমার চোখে যেন জ্বলজ্বল করত। গোলাপ বাগান, আমবাগান, একটা দোতলা বাড়ি, একটা পেয়ারা গাছের ডাল ভেঙে আমি পড়ে গিয়েছিলাম···সে সব কিছুই মিলছে না।

—অনেক কিছুই বদল হয়ে গেছে। বেশ কিছু জমি বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। আমার আব্বুরা ছিলেন তিন ভাই।

—আপনি কলকাতায় আসেন না?

—সেভেণ্টিটুতে একবার গিয়েছিলাম। তাও দুই/তিন দিনের জন্য।

—আমি ঢাকা এলাম, প্রায় তিরিশ বছর বাদে। এত কাছে, কলকাতা থেকে প্লেনে মাত্র

আধ ঘণ্টা লাগে, ইচ্ছে করলেই তো আসা যায়। তবু আসা হয়নি।
—আপনি হোটেলে উঠেছেন? ইচ্ছে করলে এখানে এসে থাকতে পারেন। একটা গেস্টরুম আছে আমাদের বাড়িতে। এটা আপনারও বাড়ি বলে মনে করতে পারেন।
—ধন্যবাদ। ধন্যবাদ! আমি এসেছি অফিসের কাজে, হোটেলে আমার সঙ্গে আরও দুজন কলিগ আছেন। আমার খুব শখ ছিল জন্ম ভিটেটা একবার দেখে আসার। এখানে জন্মেছি, খেলা করেছি! রেজা সাহেব, আপনার কলকাতার বাড়িটা দেখতে ইচ্ছে করে না।
—আমি তো কলকাতায় জন্মাইনি। আমার জন্ম এই ঢাকা শহরেই। শুনেছি, কলকাতায় আমাদের প্রপার্টি ছিল, আমার বাপ—দাদারা কোন হিন্দু ভদ্রলোকের সঙ্গে এক্সচেঞ্জ করেছিলেন।
—আমাদেরও ঢাকায় বিরাট প্রপার্টি ছিল, একান্নবর্তী পরিবার তো!
হঠাৎ কথা থামিয়ে বিকাশ প্রায় চিৎকার করে উঠল, আরে, এই তো সেই পুকুর!
ইউসুফ রেজা মৃদু হেসে বলল, তা হলে একটা কিছু চিনতে পেরেছেন।
বিকাশ দ্রুত এগিয়ে গিয়ে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই সেই ঘাটলা। এই আমগাছটা আমার বাবা নিজের হাতে লাগিয়েছিলেন। আমি গাছটাকে বেশ বড় অবস্থাতেই দেখি গেছি। খুব মিষ্টি আম হত।
—এটা বোধহয় সে গাছটা নয়। এ গাছের আম বেশ টক।
—তাই নাকি! সেই গাছটা নয়? তার জায়গায় অন্য গাছ হয়েছে, কিন্তু টক আম হবে কেন?
—আমি দাদা আম খাই না। আমের মর্ম বুঝি না।
—এই পুকুরে আমি সাঁতার শিখেছি। এখানে মাছ ধরেছি কত। বড় বড় কালিবউস মাছ ছিল।
—এই পুকুরটাও বুজিয়ে ফেলা হবে। এখানে একটা মাল্টি-স্টোরিড বাড়ি উঠবে।
বিকাশ আঁতকে উঠে বলল, অ্যাঁ? এই পুকুরটাও থাকবে না। কতকালের পুকুর! এখানে একদিন আমার মা…
ইউসুফ বলল, ঢাকা শহর এখন কত বড় হয়ে গেছে, জমির দাম বেড়ে গেছে সাংঘাতিক ভাবে। কলকাতায় কি অনেক বাড়িতে এখনও প্রাইভেট পুকুর আছে।
—সে প্রশ্নই ওঠে না।
—আপনারা যদি ঢাকায় থাকতেন, তা হলে আপনারাও এখন পুকুর বুজিয়ে বাড়ি তুলতেন।
—হয়তো তাই। পুরনো দোতলা বাড়ি ভেঙে পাঁচ তলা বাড়ি হত। আচ্ছা রেজা সাহেব, বাড়িটার পেছন দিকটা বেশি পুরনো মনে হচ্ছে না? বটের চারা গজিয়ে গেছে, একটা জায়গা ভাঙা!
ঠিক বলেছেন। এই অংশটা পুরনো। আমার ঠাকুমা থাকেন। এদিকটায় নতুন কনস্ট্রাকশন হয়নি।
—তার মানে এই দিকটা এখনো অরিজিনাল বাড়ি রয়েছে?
—খুব সম্ভবত।
বিকাশ একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করে পুকুরটার চারপাশ একবার ঘুরে এল। তার

বাল্যকালের স্মৃতিতে পুকুরটাকে যেন আরও অনেক বড় মনে হত। এখন আর সে রকম কিছু লাগছে না।
নিজেদের বসতবাড়ির ছবিটাও যেন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। যেখানে গোলাপের বাগান ছিল, সেখানে কারখানা।
এক সময় বিকাশ দেখল, ইউসুফ পাশে নেই। তাকে নস্টালজিয়ার সুখ ভোগ করতে দিয়ে সে কোথায় যেন চলে গেছে।
এখানে এলে যত রোমাঞ্চ হবে ভেবেছিল বিকাশ, তেমন যেন হচ্ছে না। একসময় এখানে তাদের বাড়ি গম গম করত, নিজেদের পরিবারেই দশ-বারজন মানুষ, তা ছাড়া বেশ কয়েকজন আশ্রিত ও দাস দাসী। পাড়া প্রতিবেশীরা আসত যখন তখন।
বিকাশ এখন একা পুকুর ধারে দাঁড়িয়ে আছে, কাউকেই চেনে না, বাড়ি-ঘর সব অন্য-রকম, একমাত্র এই পুকুরটাকেই আপন বলে মনে হয়। জলের রং কালো হয়ে গেছে। এই জলের কাছে মুখ ঝোঁকালে কি সে তার বাল্যকালের মুখচ্ছবিটা দেখতে পাবে ?
ইউসুফ আবার ফিরে এসেছে।
বিকাশ বলল, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, রেজা সাহেব। আপনি আমার জন্য এতখানি সময় নষ্ট করলেন। এবার আমি চলি।
ইউসুফ বলল, এর মধ্যে যাবেন কি ? বাড়ির ভিতরে আসেন, একটু চা খেয়ে যাবেন।
বিকাশ বলল, থাক, এখন আর চা খাব না। এরপর সন্ধ্যে হয়ে যাবে। আমি তো এতকাল পরে এসে ঢাকার রাস্তা ঘাটও চিনতে পারছি না। সন্ধের পর হোটেলে পৌঁছোতে অসুবিধে হবে।
ইউসুফ বলল, তার কোন সমস্যা নাই। আমার গাড়ি আপনাকে ছেড়ে দিয়ে আসবে। চায়ের ব্যবস্থা হয়ে গেছে।
বসবার ঘরটি অত্যন্তই সুসজ্জিত। দেওয়ালে বিদেশের আধুনিক শিল্পীদের ছবির কয়েকটি প্রিন্ট।
ইউসুফ রেজার অবস্থা বেশ সচ্ছল বোঝা যায়। ব্যবহারও অত্যন্ত মার্জিত ও ভদ্র। সোফায় বসার পর বিকাশের ক্ষীণ মনে পড়ল, তাদের বাড়ির বৈঠকখানায় তক্তপোশ আর তাকিয়া থাকত।
একটু পরে একজন মহিলা ঢুকে বললেন, আসসালাম আলাইকুম।
বিকাশ তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, নমস্কার।
মহিলাটিকে দেখলে প্রথমেই মনে হয়, এত সুন্দরী ?
এরকম সুন্দরীকে যেন শুধু সিনেমা টিনেমাতেই দেখা যায়। যেমন রং, তেমন শরীরের গড়ন। মুখে-চোখে সপ্রতিভ ভাব। দেখলেই বোঝা যায়, লেখাপড়া ভালই জানেন।
ইউসুফ বলল, আমার স্ত্রী হেনা।
হেনা একটু দূরে বসে বলল, এই বাড়ি, বাগান সব আপনাদের ছিল ? এইসব সম্পত্তি ফেলে রেখে কলকাতায় চলে গেলেন।
বিকাশ কিছু বলার আগেই ইউসুফ বললেন, না, না, ফেলে রেখে যাননি। ওনারা আমাদের কলকাতার একটা প্রপার্টির সঙ্গে একচেঞ্জ করেছেন। সেটা বোধহয় উনিশ শো পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন সালে, তাই না ?

বিকাশ বলল, অনেককাল আগের ব্যাপার, আমাদের বাবা-জ্যাঠারা এসব করেছিলেন। আমার সে-সব কিছুই মনে নেই। শুধু আমি এখানে জন্মেছিলাম, ছোটবেলায় এখানে খেলাধুলো করেছি। সেইসব একটু একটু মনে আছে।
হেনা বলল, নিজের জন্মস্থান অপরের হয়ে গেছে, এর জন্য কষ্ট হয় খুব, তাই না?
বিকাশ হেসে ফেলে বলল, আমার বাবা, জ্যাঠা মশাইদের কষ্ট হয়েছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু এতদিনে পরে…আমার যদি কষ্ট হয়, তবে সেটা নিছক মনগড়া। লোকেরা নিজেদের বাড়ি বিক্রি করে অন্য কোথাও আবার নতুন বাড়ি বানায় না? আমার কত বন্ধু উত্তর কলকাতা ছেড়ে দক্ষিণ কলকাতায় চলে এসেছে।
ইউসুফ বলল, হেনার বাপের বাড়ি টাঙ্গাইল। সেখানকার প্রপার্টি বেচে আমার শ্বশুর ধানমুণ্ডিতে নতুন বাড়ি করেছেন। হেনা, তোমার জন্মস্থানও তো এখন পরের হয়ে গেছে।
হেনা হেসে বলল, আমার জন্মস্থান একটা হাসপাতালের কেবিনে। বিকাশ মনে মনে বেশ অবাক হচ্ছে। ছোটবেলায় তাদের বাড়িতে সবচেয়ে সুন্দরী ছিল জ্যাঠতুতো দাদার স্ত্রী। তাকে বিকাশ বলত, নতুন বৌদি। তার সঙ্গে এই মহিলার খানিকটা মিল আছে।
কিন্তু নতুন বৌদি বাইরের লোকের সামনে বেরুতেন না। অচেনা কোন লোকের সঙ্গে কথা বলার প্রশ্নই ছিল না।
বিকাশের ধারণা ছিল, মুসলমান বাড়ির মেয়েরা পর্দানশীন হয়। কিন্তু হেনা কত সহজভাবে তার সঙ্গে আলাপ করছে, হাসছে। সময় কত বদলে গেছে।
শুধু চা নয়, তার সঙ্গে খাবার দাবারের এলাহি ব্যবস্থা। মস্ত বড় বড় সন্দেশ, অমৃতি কচুরি।
বিকাশ বলল, এত! না, না, আমি পারব না।
হেনা বলল, আপনি নিজের বাড়িতে এসেছেন, একটু মিষ্টি মুখ করবেন না?
বিকাশ বলল, নিজের বাড়ি? যাদের সত্যিকারের এ বাড়িটা নিজের বাড়ি ছিল, তারা কবে এ পৃথিবী থেকে চলে গেছে।
ইউসুফ বলল, আমার বাবাও বেঁচে নেই। তিনি গেছেন অনেকদিন, আমার মা-ও চলে গেলেন গত বছর।
বিকাশ বলল, আমার ছেলে-মেয়েরা আমার মুখে ঢাকার গল্প শুনলে হাসে। তারা বলে, বাবা, তুমি কতবার ওই একই গল্প বলবে! এখানে এসে বুঝতে পারছি, তাদের আমি মিথ্যে গল্প বলি। সে তো আমার একটা কল্পনার বাড়ির গল্প, সে রকম বাড়ি এখন ঢাকাতে কোথাও নেই। রেজা সাহেব, আপনিও কলকাতায় গেলে আপনার বাড়ি চিনবেন না।
ইউসুফ বলল, আমি সেখানে জন্মাইনি, সে বাড়ি কখনো দেখিনি, আমার চেনার কোন প্রশ্নই ওঠে না।
চা শেষ করবার পর বিকাশ বলল, শুধু আর একটা অনুরোধ। এ বাড়ির পেছন দিকটায় পুরোনো খানিকটা অংশ রয়ে গেছে। সে জায়গাটা একটু দেখতে পারি? যদি কিছু মনে পড়ে।
হেনা আর ইউসুফ দু'জনেই একসঙ্গে বলে উঠল, নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই!

নতুন বাড়ির পর একটা উঠোন, তারপর পুরনো মহল। একতলার ঘরগুলো ঘুরে বিকাশ উঠে এল দোতলায়। এখনও সে কিছু চিনতে পারছে না। এই দিকটা কি ছিল জ্যাঠামশাইয়ের অংশ! তার স্মৃতির বাড়ির দোতলায় যেন একটা টানা বারান্দা ছিল, এখানে তো বারান্দার কোন অস্তিত্বই নেই। আগেকার কালের নতুন খুপরি খুপরি ঘর।

একটা বেশ দরজা ওয়ালা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে বিকাশ বলল, হ্যাঁ, এইটা, মনে আছে। আমার ঠাকুমা থাকতেন। আমি এখানে দুপুরবেলা এসে ঠাকুমার কোলে মাথা রেখে ঘুমাতাম। ঠাকুমা আমাকে নারকোল নাড়ু খাওয়াতেন। এই ঘরের ভেতরটা একবার দেখা যায় না?

দরজার একটা পাল্লা খোলা, অন্য পাল্লাটাও ঠেলে খুলে দিল হেনা।

সঙ্গে সঙ্গে বিকাশের বুকের মধ্যে ধক্ ধক্ করে উঠল। মনে হল, সে চোখে ভুল দেখছে। রোমাঞ্চ হল তার সমস্ত শরীরে।

ঘরের মাঝখানে জোড়াসন করে বসে আছেন একজন বৃদ্ধা। সাদা ধপধপে কাপড় পরা চক্ষু বোজা। ঠিক যেন বিকাশের নিজের ঠাকুমা। ওই ভাবে বসে ঠাকুমা প্রত্যেক সন্ধ্যেবেলা পুজো-আহ্নিক করতেন। চল্লিশ বছর ধরে তিনি কি সেই একই জায়গায় বসে আছেন।

ইউসুফ ফিসফিস করে বলল, আমার ঠাকুমা। নামাজ পড়ছেন। এখন আর হাঁটু গেড়ে বসতে পারেন না। তবে স্মৃতি শক্তি খুব ভাল আছে। সবাইকে চিনতে পারেন।

বিকাশ জিজ্ঞেস করল, আমায় চিনতে পারবেন?

ইউসুফ আর হেনা উত্তর দিল না।

বিকাশের মনে হল, সে যদি এখন ওই বৃদ্ধার পাশে বসে পড়ে, তাহলে উনি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেবেন। পুরনো স্নেহের স্পর্শে বিকাশের শরীর জুড়িয়ে যাবে।

এই বৃদ্ধা তাঁকে আদর করতে করতে জিজ্ঞেস করবেন, এতদিন পরে এলি? তুই কেমন আছিস, বিকাশ?

গল্পের গল্প

—সমরেশ মজুমদার

॥ ১ ॥
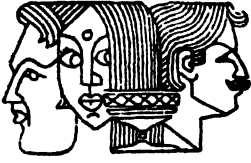
ছেলে বড় হচ্ছে, স্কুলে যাচ্ছে কিন্তু তার বেশি ওর সম্পর্কে মাথা ঘামায়নি অমর। কিছুদিন আগে স্ত্রীর মুখে শুনেছিল সে নাকি টেবিল-টেনিস খেলছে। স্কুলে। জীবনে কখনও অমর ওই খেলাটা খেলেনি। শুনে বলেছিল, 'দেখো, যেন পড়াশুনাটা নষ্ট না হয়।'

আজ সকালে ছেলে বায়না ধরেছিল তার খেলা দেখতে যেতে হবে। ইন্টার স্কুল টেবিল টেনিস টুর্নামেন্টে সে নাম দিয়েছে। জীবনের প্রথম কম্পিটিশন। প্রস্তাব শুনে একটু খুশি যে হয়নি সে তা নয়। শেষ পর্যন্ত হাজির হয়েছিল স্কুলে। এবং গিয়ে দেখল প্রতিদ্বন্দ্বী ছেলেটি তুখোড় খেলে তার ছেলেকে হারিয়ে দিচ্ছে। অমর প্রতি মুহূর্তে চাইছিল তার ছেলে মারগুলো ফিরিয়ে দিক, জোরে স্ম্যাস করাক কিন্তু হতভাগা কিছুই করতে পারছিল না। সেই সময় উপস্থিত দর্শকরা তার ছেলেকে দুয়ো দিচ্ছিল। প্রতিদ্বন্দ্বী রোগা ছেলেটিকে খুব উদ্দীপ্ত দেখাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত গোহারা হেরে গিয়ে মুখ চুন করে ছেলে একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। আর বিজয়ী ছেলেটি ছুটে গিয়ে এক প্রৌঢ়া মহিলাকে জড়িয়ে ধরে শব্দ করে কেঁদে উঠেছিল। আর দাঁড়ায়নি অমর। কিন্তু তারপর থেকে সে কিছুতেই তার ছেলের হেরে যাওয়া মুখ ভুলতে পারছিল না। কেমন দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছিল। ওর দ্বারা টেবিলটেনিস হবে না। আর হতে গেলে অনেকদিন অনুশীলন করতে হবে। কিন্তু এইভাবে হারতে আরম্ভ করলে ওর মন ভেঙে যাবে। তার প্রতিফলন পড়বে পড়াশুনায়। অমর স্থির করল স্কুলে গিয়ে গেমস টিচারকে বলবে যে আর ছেলে টেবিল টেনিস খেলবে না।

পরদিন স্কুলে গিয়ে অমর যখন গেমস টিচারের জন্যে অপেক্ষা করছে তখন অবাক হয়ে দেখল সেই প্রতিদ্বন্দ্বী ছেলেটির সঙ্গী মহিলা এলেন। খুব রাগ হচ্ছিল অমরের। নিশ্চয়ই ছেলের গৌরবে গৌরবান্বিত। গেমস টিচার আসতেই মহিলা এগিয়ে গেলেন। অমর শুনল তিনি বলছেন, 'স্যার, আমি ঠিক করেছি যে আমার ছেলে আর কখনই টেবিল টেনিস খেলবে না।'

গেমস টিচার অবাক, 'সেকি ? কেন ?'

মহিলা মুখ নিচু করলেন, 'আমি আর পারছি না। ওর বাপ মারা গিয়েছেন ছয় বছর হলো। তারপর প্রতিটি ভাল জিনিস করেই ও আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদে আর বলে, মা, বাবা যদি দেখতে পেত ! কালও বলেছে ওই জেতা ভাল লাগে না বাবা দেখতে

পেল না বলে। ওর কষ্ট আমি সহ্য করতে পারছি না।'
অমর চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। গেমস টিচার তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কিছু বলবেন?'

॥ ১০ ॥

জিনসের প্যান্ট পরা মেয়েটি ছলবলিয়ে হাঁটছিল। তার দশহাত পেছনে একটি লোক। লোকটির পরণে ওভার কোট, টুপি চোখের ওপর নামানো। হাতে ভাঁজ করা খবরের কাগজ। রাস্তা পেরিয়ে মেয়েটি একটি দশতলা বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়তেই লোকটি তাকে অনুসরণ করল। মেয়েটি লিফটের বন্ধ দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই লোকটি খবরের কাগজ খুলে চোখের সামনে ধরল। কাগজে মোটা অক্ষরে হেডিং লেখা, 'গত রাতেও পার্ক স্ট্রিটের বারের মহিলা শৌচাগারে যুবতী হত্যা।' লোকটি কাগজের আড়াল রেখে মেয়েটিকে দেখছিল। এক জায়গায় স্থির থাকা ওর স্বভাব নয়। এই সময় একজন বৃদ্ধা হাতে বাস্কেট নিয়ে উঠে এলেন সিঁড়ি ভেঙে লিফটের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে তার গলা পাওয়া গেল, 'এই যে লিজা, খবরের কাগজে পড়েছ? কাল রাতেও খুন হয়েছে একটা মেয়ে। উঃ কি কান্ড। তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, সন্ধের মধ্যেই বাড়ি ফিরে এসো।' মেয়েটি খিলখিল করে হাসল, 'আমার কিছু হবে না আন্টি।'
'বাজে বকোনা। দেখে দেখে যুবতী মেয়েদের মারছে। এই নিয়ে তিনটে হল।'
লিফট এসে যেতেই ওরা ভেতরে ঢুকল। সেই সঙ্গে লোকটি সে মুখ থেকে কাগজ না সরিয়ে এক কোণে দাঁড়াল। বুড়ি ক্রমাগত মেয়েটিকে সাবধান হবার উপদেশ দিয়ে তিনতলায় নেমে যেতেই লোকটা পকেটে হাত ঢোকাল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একজন প্রৌঢ় লিফটে উঠলেন, 'ওঃ লিজা। কাল অত রাত্রে ফিরলে দেখলাম। শহরে যে কান্ড শুরু হয়েছে তাতে কাজটা ভাল করছ না।' লিজা হাসল, 'না, না, আমাকে কেউ কিছু বলবে না।'
ওরা কথা বলছিল। লোকটা হতাশ হল। সাততলায় মেয়েটি নেমে গেল প্রৌঢ়ের সঙ্গে। লোকটা হতাশ হল। তারপর বোতাম টিপে লিফট নামিয়ে আনল নিচে।

॥ ১১ ॥

ষাট বছরের ভদ্রলোক নাতির হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে রেল লাইনের ধারে এলেন। তিনি তাঁর চাকরি জীবনের গল্প বলছিলেন। সবে অবসর নিয়েছেন। এতদিন রেলে চাকরি করে সবার ভালবাসা পেয়েছেন। সবাই তাকে খুব খাতির করে। বালক নাতি সেইসব গল্প শুনছিল। এমন সময় একটা ট্রেনকে ছুটে আসতে দেখা গেল। বালক দেখল ইঞ্জিনের ড্রাইভার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় হাসি মুখে তার দাদুকে দেখে হাত নাড়ল। ট্রেন পেরিয়ে যাওয়ার আগে গার্ডের কামড়া থেকে গার্ড হাত নেড়ে চিৎকার করে দাদুকে কিছু বললেন আর এই পুরো সময়টা দাদু তাঁর হাত নেড়ে গেলেন। ট্রেন চলে গেলে নাতি বলল, 'দাদু, তোমাকে কত লোক চেনে, না?' ভদ্রলোক হাসলেন। তৃপ্তির হাসি। কিছু বললেন না।
পঁচিশ বছর কাটল। ভদ্রলোকের বয়স এখন পঁচাশি। নাতির সন্তানের বয়স এখন পাঁচ। অনেকদিন বাদে ভদ্রলোক তার হাত ধরে এলেন রেল লাইনের ধারে। আসার পথে তিনি নিজের চাকরি জীবনের গল্প বলছিলেন। শিশু অবাক হয়ে শুনছিল। এই

সময় একটি ট্রেনকে আসতে দেখা গেল। ভদ্রলোক তাঁর ডান হাত আকাশে নাড়তে লাগলেন। কিন্তু ড্রাইভার তাঁকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিল। ট্রেন চলে যাওয়ার আগে গার্ডের কামরা এল। গার্ড বাইরের দিকে তাকিয়ে নির্লিপ্ত মুখে সিগারেট টানতে টানতে চলে গেলেন। ভদ্রলোকের আন্দোলিত হাত শূন্যেই থেমে গেল। সেটা এখন খুব টনটন করছিল। হঠাৎ শিশুটি বলে উঠল, 'ওমা, দাদু, তুমি হাত নাড়ছিলে কেন?'

॥ ১২ ॥

পঞ্চাশ বছর বয়সে পৌঁছে ননী মাধবের মনে হত যে সংসার থেকে সে কিছুই পায়নি। বাবা পড়াশুনা করিয়েছেন চাকরি করে সংসার বাঁচাতে পারবে সে তিনি অবসর নিলে। সেটা হল। বিয়ের পরে স্ত্রী কয়েক মাস নিরীহ ছিলেন। আহা, বড় সুখের সময় ছিল সেটা। তারপর তার হুকুমমত চলতে চলতে আজকাল নিজেকে বিনি পয়সার চাকর ছাড়া কিছুই মনে হয় না। ননী মাধব মাসে সাড়ে তিন হাজার হাতে পায়। তা থেকে তার মাসিক বরাদ্দ একশ টাকা। এদিয়েই যাতায়াত এবং টিফিন সারতে হয়। পুজোর সময় দু জোড়া সার্ট প্যান্ট কিনে দেন স্ত্রী। তার নিজস্ব কোন ঘর নেই যেখানে দুদণ্ড একা কাটাতে পারে। নিজস্ব বিছানা নেই যেখানে গড়াতে পারে। রোজ ছটার আগে বিছানা ছাড়তে হয় তাকে। তারপর দুধ আনা, বাজার করা থেকে সপ্তাহের রেশন, মাসের গ্যাস, ইলেকট্রিক বিল যাবতীয় কাজ রুটিন বাঁধা। ননী মাধবের দুই পুত্র কন্যা। দুজনই কলেজে পড়ে। তাদের পড়াশুনার চাপ এমন যে এসব কাজ করতে সময় পায় না। করতে বললে স্ত্রী বাধা দেন, 'আহা, ওরা যদি ওসব করে তাহলে পড়বে কখন?'

ননীমাধব হিসাব করে দেখেছে তার পেছনে সংসারের বরাদ্দ দৈনিক আট টাকা। এই অঙ্কের মধ্যেই তার খাওয়া হয়ে যায়। সকালে এক কাপ চা পঞ্চাশ পয়সা, অফিস বেরুবারআগে ভাত তরকারি মাছ পাঁচ টাকা। বিকেলে এক কাপ চা পঞ্চাশ রাত্রে দুটো রুটি আর তরকারি দুটো টাকা। অর্থাৎ এই অঙ্কের সঙ্গে হাত খরচের টাকা যোগ করলে মোট তিনশ চল্লিশ সে উসুল করে মাসে তিন হাজার দিয়ে। সংসারের কোন ব্যাপারে তার সিদ্ধান্ত অনুসরণ করা হয় না। মতামত দিলে উড়িয়ে দেওয়া হয়। ছেলে মেয়েরা জানে মায়ের হাতে ক্ষমতা আছে তাই তারা তার পক্ষে আছে। মাঝে মাঝে মনে হয় বিপ্লব করবে। কিন্তু বেড়ালকে প্রথম রাত্রে না মারলে যে আর কিছুই করার থাকে না তা টের পেয়ে গেছে এতদিনে। এখন বাঘিনীর সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা নেই তার।

অতএব চোরের মত সে গৃহত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেয়। কাউকে না জানিয়ে সে এই সংসার থেকে চলে যাবে। এখনও আট বছর চাকরি আছে। স্বেচ্ছা অবসর নিলেও একগাদা টাকা পাওয়া যাবে। গোমুখের আগে হিমালয়ে গুহা ভাড়া পাওয়া যাচ্ছে, সঙ্গে খাওয়া দাওয়া, মোট পাঁচশো টাকা মাসে, তাই দিয়েই সে আরামে থাকবে। নিজেরটা নিজে বুঝে নেবে। স্ত্রীর রক্ত চোখের পরোয়া করবে না সে।

কিন্তু এখন মাসের আটাশ তারিখ। হাত শূন্য। এক তারিখ ছাড়া উপায় নেই। মোটে দুদিন। সেই সন্ধ্যায় বাড়ি গিয়ে সে হুঙ্কার দিল, 'আমি আজ একা শোব। শরীর খারাপ। খোকা তুই মায়ের ঘরে যা।'

ছেলে গলা শুনে অবাক হয়ে গেল। সে গেল মাকে রিপোর্ট করতে। জামা কাপড় খুলে লুঙ্গি পরে ননীমাধব বিছানায় গড়াগড়ি করল ঘরের দরজা ভেজিয়ে। আহা, কি আরাম। মনে মনে বলল, 'এই তো সবে শুরু।'

[৯, ১০, ১১, ১২ এই চারটে গল্পগুলোর শেষ অনেকরকম হতে পারে। তার একটি নমুনা]

গল্প ৯

গেমস টিচারের প্রশ্নের জবাবে অমর মাথা নাড়ল না। তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল স্কুল থেকে। বিজয়ী ছেলেটির মুখ মনে পড়ল তার, এবং কান্নাও। তার হেরে যাওয়া ছেলে খেলতে খেলতে নিশ্চয়ই একদিন না একদিন জিততে পারবে। আর সেই বিজয়ের মুহূর্তে বাবা হিসেবে সে যদি উপস্থিত থাকে তাহলে তার মুখে হাসি দেখতে পাবে। যা ওই ছেলেটি কখনও পাবে না। মনটা হালকা হয়ে গেল তার।

গল্প-১০

ওভারকোট পরা লোকটি রাস্তা পেরিয়ে উল্টো দিকের একটা দোকানে ঢুকে ফোন করতে চাইল। অনুমতি পেলে সে ডায়াল করল। ওপাশ থেকে সাড়া পেলে সে উত্তেজিত গলায় বলল, 'স্যার, পেয়েছি। ঠিকানাটা বলছি, তাড়াতাড়ি চলে আসুন ফোর্স নিয়ে।'

ওখান থেকে ভারি গলা শোনা গেল, 'প্রুফ পেয়েছ কিছু ?' ওভারকোট পরা লোকটি বলল, 'একেই আমি কাল রাত্রে বার থেকে বেরুতে দেখেছিলাম। তারপরেই বডি আবিষ্কৃত হয়। এখন পাঁচজনে ওকে ভয় দেখাচ্ছে অথচ ও ভয় পাচ্ছে না। আর বলছেও না ওই বারে ছিল।'

'ছেলে না মেয়ে ?'

'মেয়ে স্যার।' বলে ওভারকোট পরা লোকটি মেয়েটির নাম ঠিকানা জানাল। ওপাশ থেকে হাসির তুবড়ি ছুটে এল, 'এই জন্য তোমার আজ পর্যন্ত প্রমোশন হয়নি। যার কথা বলছ সে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরের একজন অফিসার। সবে ঢুকেছে।'

গল্প-১১

বৃদ্ধ কথা বলতে পারলেন। পঁচিশ বছর বড় দীর্ঘ সময়। এর মধ্যে কখন তিনি বস্তু জগৎ থেকে হারিয়ে গিয়েছেন তা তিনি জানতেন না। গত বছর বেঁচে থেকে নিজের জানাটাকে কত কম আবিষ্কার করে তিনি দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন। শিশুটি সেই সময় বলল, 'দাদু, আমি বাড়ি যাব।' বৃদ্ধ বলতে পারলেন, আমিও।'

গল্প-১২

সেই সন্ধ্যায় এবং রাত্রের প্রথমার্ধে ঘরে কেউ এল না। মধ্যরাত্রে ঘুম ভেঙে ননীমাধব দেখল স্ত্রী পাশে এসে বসেছেন, 'তোমার কি হয়েছে গো ? ছি, এমন করো না। আমি কি তোমার পর ? বল কি হয়েছে ?'

ননীমাধব ঢোক গিলল, 'আমি-আমি-হিমালয়ে যাব।'

'ওমা এই কথা। শুনে ফেলেছ বুঝি ? আমি তো আজই চারজনের জন্যে টিকিট কাটিয়ে এনেছি। এই গরমের ছুটিতে আমরা হরিদ্বার-কেদার-বদ্রী যাব। রুটি তরকারি নষ্ট করো না; ওঠো, খেয়ে নাও।'
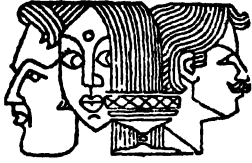
চুনাওট এবং ইতোয়ারিন্

—বুদ্ধদেব গুহ

এক

ইতোয়ারিনকে দূর থেকে দেখতে পেয়েই খুব জোরে দৌড়ে যাচ্ছিলো উদ্বিগ্ন মুঙ্গলি। তার মোটা সস্তা নোংরা লাল শাড়িটা ফুলে উঠছিলো জোলো হাওয়ায়।

কালো মেঘে আদিগন্ত আকাশ ঢেকে ছিলো। জুগুগি পাহাড়ের ওপার থেকে বৃষ্টি-ভেজা হাওয়া ছুটে আসছিলো দমকে দমকে দূরাগত বৃষ্টির ছাট বয়ে। এক ঝাঁক সাদা বক দূরের হোন্দা বাঁধের জলা থেকে উড়ে আসছিলো সাদা কুন্দ ফুলের মালারই মতো দুলতে দুলতে।

এখানেও বৃষ্টি আসছে। মোরব্বা ক্ষেতের মধ্যে মাথা উঁচিয়ে পাটকিলে রঙা একটা ধাড়ি খরগোশ দ্রুত দৌড়ে গেলো মুঙ্গলির পায়ে পায়ে। ভিজে হাওয়ায় নিমের ফলের গন্ধ ভাসছে। একটা মস্ত গহুমন সাপ ধীরে ধীরে ঢুকে গেলো উই-ঢিবির পাশের ইঁদুরের গর্তে। একবার নাক তুলে গন্ধ নিলো ষোড়শী মুঙ্গলি। জোলো হাওয়ার, নিমফলের খরগোসের এবং সাপের।

সুরাতিয়া দিদিদের ক্ষেতের বেড়ার এ-পাশের কদমবনে কদমফুল ভরে রয়েছে। তার গন্ধও ছিলো হাওয়াতে। নানা রকম মিশ্র গন্ধ। ঝিম ধরে আসে তাতে।

একদিন ঐ কদমবনের নিচে মুঙ্গলি কাড়ুয়া চাচার ব্যাটা পুনোয়ার সঙ্গে রাধা-কৃষ্ণ খেলেছিলো গত বছরের আগের বছর। হঠাৎই মনে পড়ে গেলো ওর। এক ঠ্যাঙে দাঁড়িয়ে বাঁশি বাজাতে গিয়ে পুনোয়া পড়ে যাচ্ছিলো বার বার। আর মুঙ্গলির কী হাসি।

পুনোয়া গত বছর এমনই এক বর্ষার দিনে জুগুগি পাহাড়ে মূল কুড়োতে গিয়ে গহুমন সাপের কামড়ে মারা গেছিলো। মুখ দিয়ে ফেনা বেরিয়েছিলো। নীল হয়ে গেছিলো সারা শরীর। মনে পড়তেই মনটা খারাপ হয়ে গেলে মুঙ্গলির। ওদের জীবন এবং মরণ এমনই। কোনো তাপ-উত্তাপ নেই। মানুষ-মানুষীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই আছে শুধু। একচল্লিশ বছর দেশ স্বাধীন হয়েছে অথচ দেশের অধিকাংশ মানুষই ওদের মানুষের মর্যাদা দিলো না।

অনেকদিন আসে না মুঙ্গলি এদিকটাতে। এই অবাধ্য অসভ্য ইতোয়ারিনটাই তাকে ছুটিয়ে নিয়ে এলো ভুল করে, ভুল পথে; আজ এই ভেজা দুপুরে।

পিচের রাস্তা ধরে নিপাসিয়া থেকে খুব জোরে পর পর তিন-চারটে ট্রাক ও একটা বাস সারি বেঁধে দৌড়ে আসছিলো। ইতোয়ারিন তো কিছুই বোঝে না। বুদ্ধু একটা। যদি চাপা পড়ে মরে। সেই ভয়েই দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে চলেছে মুঙ্গলি।

তার আঁচল এই দৌড়ে সরে যাওয়াতে তার নবীন পেলব মসৃণ স্তন দুটির বৃন্তের বৃন্তে ভিজে হাওয়া সুড়সুড়ি দিচ্ছে। কিন্তু শাড়ি সামলাবার সময় এখন আর নেই। ট্রাকগুলো আর বাসটা এসে পড়লো বলে। ইতোয়ারিনও উদোম টাঁড়টা পেরিয়ে গিয়ে প্রায় পিচ রাস্তায় ওঠার মুখে। সর্বনাশ হবে এখুনি।
প্রথম ট্রাকটার নিচে প্রায় পড়ে ইতোয়ারিন্, ঠিক এমনই সময় রাস্তার পাশের চাপ-চাপ নরম সবুজ ঘাসের ঢাল্-এর মধ্যে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েই মুঙ্গলি জাপটে ধরলো ইতোয়ারিন্কে। তারপর দুজনে মিলে জড়াজড়ি করে গড়াতে গড়াতে ঢাল গড়িয়ে নেমে এলো উদোম টাঁড়ে। হাঁটু গেড়ে বসে ইতোয়ারিন্কে তার দু-উরুর মধ্যে চেপে ধরে দু'হাতে ওর দু'কান ধরে আচ্ছা করে মুলে দিয়ে বললো, "ট্রাকোয়াকা নিচে যা কর্ অ্যাইসেঁহি এক রোজ মরেগী তু!"
ইতোয়ারিন্ ঘুচুক-ঘুচুক, ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে আওয়াজ করলো মুঙ্গলির কথার জবাবে। সোহাগ জানালো। মাদী শুয়োরের সোহাগের রকমই আলাদা। "বেলুনের মতো পটাং করে ফেটে যাবি তুই একদিন তা বলে দিলাম।" আবার স্বগতোক্তি করলো মুঙ্গলি। রাগের ও অনুযোগের গলায়। কোনো উত্তর না দিয়ে ওর হেঁড়ে মাথাটা মুঙ্গলির উরুতে শুধু একবার ঘষে দিলো ইতোয়ারিন্ আদরে।
মুঙ্গলি উঠে দাঁড়িয়ে বললো, চল হঠ্।
বলে বস্তির দিকে রওয়ানা হলো। ইতোরিয়ান্ চলতে লাগলো ওর পায়ে পায়ে। বড় রাস্তা থেকে একটু ডান দিকেই লালমাটির কর্দমাক্ত কাঁচা রাস্তা বেয়ে কিছুটা গেলেই ভাঙ্গী বস্তী। মানে, ধাঙ্গরদের বস্তী। বস্তীর লাগোয়া একটি তালাও। বর্ষার জল পেয়ে তিন ধার থেকে লালমাটি ধুয়ে এসে পড়েছে সেই তালাওতে। এখন যেই চান করুক সেখানে, মানুষ অথবা শুয়োর; তার গায়ের রঙ লাল হয়ে যাবে। এই তালাওটিই ভাঙ্গী বস্তীর প্রাণ।
তালাওর তিনপাশে জলের উপরে ঝুঁকে পড়েছে ঝাঁটি জঙ্গল পবং পুটুসের ঝাড়। কটুগন্ধ গাঢ় কমলা-রঙা ফুল এসেছে পুটুসের ঝাড়ে ঝাড়ে। পাড়টা উঠে গেছে তিন-দিকে উঁচু হয়ে। তারপর জুগ্গি পাহাড়ের পাদদেশে গিয়ে মিশেছে সেই চড়াই।
এক সময়ে ঘন শালের বন ছিলো এই চড়াইয়েই। সে বন গিয়ে মিশে গেছিলো জুগ্গি পাহাড়ের বনের সঙ্গে। ও'রাও মুণ্ডারা তখনকার দিনে জেঠ-শিকারের পরবে ভালুক কুট্‌রা অথবা হরিণ শিকার করতো। কখনও কখনও শিয়াল, সাপ অথবা খরগোসও। মুঙ্গলি তখন শিশু ছিলো। তবু স্পষ্ট মনে আছে।
জঙ্গল এখন আর নেই। কেটে সব সাফ করে দিয়েছে ঠিকাদারেরা। ভাঙ্গী বস্তীর কাছের দুই বস্তীর লোকেরা। বাড়ি বানাবার জন্যে। জ্বালানী কাঠের জন্যে। মুঙ্গলিরা নিজেরাও কেটেছে কিছু। এখন কিছু বুনো পলাশ, যাদের প্রাণশক্তি আর বাড় এই ভাঙ্গী বস্তীর শুয়োরদেরই মতো; আর ঝাঁটি জঙ্গল এবং পুটুসই শুধু আছে।
দু-একটি খরগোস, বুনো শুয়োর এবং কিছু বটের তিতির ওরই মধ্যে ইতিউতি ঘোরা-ঘুরি করে। ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে, অথবা বৃষ্টির ঠিক পরে যখন এক আশ্চর্য নরম হলুদ আলোয় বন-প্রান্তর ভরে যায় এবং সূর্য পাহাড়ের ওপাশে ডুবে যাওয়ার ক্ষণটিতে মাথা তুলে, গলার শির ফুলিয়ে বার বার ডেকে তারা জানান্ দেয়

যে তারা এখনও আছে।
বড় রাস্তাটা পিচের। মাঝে মাঝেই গড়হরি অথবা নিপাসিরার দিকে মাসিডিস ট্রাক এবং সার্ভিসের বাস চলে যা জেঠ-শিকারীর তীর-খাওয়া বড়কা দাঁতাল-শুয়োরের মতো প্রচণ্ড জোরে গোঁ-গোঁ শব্দ করতে করতে।
রাস্তাটা ব্রিটিশদের আমলে বানানো। তখন অবশ্য পিচ ছিল না। লাল মাটির রাস্তাই ছিলো। কিন্তু পোক্ত ছিল। বর্ষায় ভাঙতো না। চুরি হতো না তখন সরকারী কাজে। মুঙ্গলি শুনেছিলো তার নানার কাছে।
রাস্তাটার দু'পাশে বড় বড় অনেক প্রাচীন গাছ ছিলো। মেহগনি, শিশু নানারকম কেসিয়া। কিছু জ্যাকারাণ্ডাও। সাহেবরাই লাগিয়ে গেছিলো।
শুধু আশে-পাশের বনের আর পাহাড়ের গাছ কেটেই মানুষের খিদে মেটেনি। এখন পথপাশের বড় বড় গাছগুলোর গা থেকে পুরু ছালও তারা তুলে নিচ্ছে। তাই দিয়েই ফুলবাগ শহর আর গড়হরি আর নিপাসিরা বাজারের হালুইকরেরা উনুন ধরায়। মানুষের মতো আগ্রাসী খিদে খুব কম জানোয়ারেরই আছে। শুয়োরদের হার মানে এই খিদেরই কাছে।
কোনোরকম বাছ বিচার না করে শুয়োরগুলো সব কিছুই খায়। মানুষের ময়লা থেকে যা কিছুই মাটি কুড়িয়ে পায়। আর ওদের অন্য কাজ বংশ বৃদ্ধি করা। রাক্ষসের মতো সর্বক্ষণ খাওয়া আর রমণ করাই হলো শুয়োরদের একমাত্র কাজ।
বড় রাস্তার বাঁদিকে মুসলমানদের মস্ত বস্তী আছে একটি। মাইল খানেক দূরে। ডানদিকেও আরেকটি আছে। গিরিয়া পাহাড়ের নিচে।
ভাঙ্গী বস্তী থেকে পিচ রাস্তায় উঠলেই কয়েকটি দোকান। একটি পুরোনো পিপুল গাছের নিচে দোকানগুলো গজিয়ে উঠেছে। একটি মুদিখানা, পানবিড়ির দোকান। একটি চায়ের দোকান। তার সামনে শালকাঠের তক্তা দিয়ে খুঁটি পুঁতে বেঞ্চমতো বানানো। বৃষ্টিতে, রোদে ফেটে-ফুটে গেছে। তার উপরে চা খেতে খেতে আড্ডা মারে ভাঙ্গী বস্তীর মানুষ এবং ঐ দুই বস্তীর মানুষও। ঐ দোকানগুলোর উল্টো-দিকে টাঁড়ের মধ্যে দিয়ে লালমাটির পায়ে-চলে গেছে এঁকে বেঁকে দূরে। সেখানে কাহারদের বস্তী আছে। এই পিপুল গাছের উল্টোদিকে কাহার বস্তীতে যাবার পথেই শুক্রবারে শুক্রবারে হাট বসে। হাটের নাম জুগুগি হাট। শুঁড়িখানা আছে। হাটের দিনে ঢালাও মহুয়া খায় মুঙ্গলিদের বস্তীর সকলে শালপাতার দোনায়। সারা সপ্তাহের রোজগার ওখানেই চলে যায়।
আগে হাট বসতো রবিবারে রবিবারে। তবে শুক্রবার "জুম্মা বার" বলে এবং এই এলাকা মুসলমান-প্রধান বলে গরিষ্ঠদের সুবিধার জন্যে রবিবারের বদলে আজকাল শুক্রবারেই হাট বসে।
ভাঙ্গী বস্তির ভগলু আর ফুলবাগের দিকের মুসলমান বস্তীর গিয়াসুদ্দিনের বয়স হয়েছে প্রায় সত্তরের মতো। দুজনেই ব্রিটিশের হয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে লড়াই করেছিলো। গিয়াসুদ্দিন লড়াই করেছিলো বার্মাতে আর ভগলু মধ্যপ্রাচ্যে। যদিও তারা আলাদা আলাদা রেজিমেন্টে ছিলো কিন্তু এখন অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু হয়ে গেছে। যুদ্ধে যখন যোগ দেয় তখন দুজনেই কিছুদিন একসঙ্গে ছিলো রাণীক্ষেত ক্যান্টনমেন্টে। শিকারের দোস্তী, যুদ্ধের দোস্তী একবার হলে জীবনভর তা

অটুটই থাকে।

চায়ের দোকানের আড্ডাতে বীর্হানগরের প্রাইমারী স্কুলের মাস্টারও সাইকেল নিয়ে আসে। থাকে বীর্হানগরেই। ফুলবাগের পথে। এখান থেকে প্রায় পাঁচ মাইল পথ। বয়স হবে মাস্টারের কুড়ি-একুশ। সবে বি. এ. পাশ করেছে। অনেক খবরাখবর রাখে সে। চেহারাটিও ভারী সুন্দর। জাতে সে ভূমিহার। কিন্তু তার স্বভাবের জন্যে এ অঞ্চলের মুসলমান, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, চামার, ভোগ্তা, কোল্হো, ওরাঁও, মুণ্ডা সকলেই ভালোবাসে তাকে। মুঙ্গলিও ভালোবাসে। মাস্টারকে দেখলেই মুঙ্গলির বুকটা ধুক্ধুক্ করে ওঠে। সারা শরীরে একটা অনামা ব্যাখ্যাহীন রিকিঝিকি ওঠে। এমনটি আর কাউকে দেখলেই হয় না। তেমন রিকিঝিকির কথা শুধু মুঙ্গলির বয়সী মেয়েরাই জানে।

সপ্তাহের তিন-চারদিন সন্ধ্যেবেলা বীর্হানগরের নবীন মাস্টার, নাম তার সরজু, প্রবীণ ভগলু আর গিয়াসুদ্দিনের সঙ্গে বসে চায়ের দোকানের সামনে আড্ডা মারছিলো। দুপুরে খুব বৃষ্টি হয়ে যাবার পর এখন আকাশ পরিষ্কার। সন্ধ্যে হতে দেরী আছে এখনও ঘণ্টাখানেক। মাস্টার নবীন বলেই এমন অনেক কিছুর খোঁজ রাখে যা প্রবীণেরা আদৌ জানে না। আবার ঐ দুই প্রবীণ তাদের অভিজ্ঞতার ভাঁড়ারে এতো কিছু জমিয়ে রেখেছে, পৃথিবী ঘোরার অভিজ্ঞতা, যে নবীন মাস্টার হাঁ করে তাদের কথা শোনে। যৌবনের বিকল্প বার্ধক্য নয়। বার্ধক্যের বিকল্পও নয় যৌবন। যাদের শেখার ইচ্ছা ও মন আছে তারা একে অন্যের কাছে অনেকই শিখতে পারে।

সকলেই এক ভাঁড় করে চা খাবার পর ভগলু বুড়ো গিয়াসুদ্দিন বুড়োকে বিড়ি এগিয়ে দিয়ে বলে, "বোলো ইয়ার।"

॥ দুই ॥

ইতোয়ারিন্ মুঙ্গলির বড় আদরের মাদী শুয়োর। রবিবারে জন্মেছিলো তাই তার নাম দিয়েছিলো মুঙ্গলি ইতোয়ারিন্। ইতোয়ারিনের চার ভাই-বোন ছিলো। তারা সবাই বিক্রি হয়ে গেছে জুগ্গির হাটে। এইবার পাল খাওয়াবে মুঙ্গলি ইতোয়ারিন্কে। এক পাল বাচ্চা দেবে। সম্পত্তি বাড়বে মুঙ্গলির। বাচ্চাগুলোকে বেচে দেবে জুগ্গির হাটিয়াতে কিন্তু মুঙ্গলিকে বেচবে না।

মুঙ্গলি রোজ দিনশেষের আবছা অন্ধকারে, নিজে যখন তালাওতে চান করতে নামে, তখন ইতোয়ারিন্কেও চান করায় নিজে হাতে। জলে নেমেই আশ্চর্য কায়দাতে সাঁতার কেটে তালাওর গভীরে চলে যায় ইতোয়ারিন্। মুঙ্গলিও সাঁতরে গিয়ে তার পিঠে চড়ে। দুই অরমিতা কুমারীর এই এক খেলা। একজন নারী একজন শুয়োরী। শুয়োরী হলেও ইতোয়ারিন্কে সব সময় পরিষ্কার রাখে মুঙ্গলি। পোষা পাখির মতো। তারপর রাতে কাঁচামাটির সোঁদা-গন্ধ ঘরে ইতোয়ারিন্কে কোলবালিশ করে করে মুঙ্গলি শুয়ে থাকে। বাবা ঝড়ু ওকে বকে খুব। কিন্তু শেষমেষ থেমে যায়। মা-মরা মেয়ে। তাছাড়া মুঙ্গলিও বা আর কতদিন থাকবে ঝড়ুর কাছে : মেয়ে বড় হয়ে উঠেছে। আগেকার দিন হল তো আট-ন' বছরেই বিয়ে হতো। তারপর গওনা হলে শ্বশুরবাড়ি যেতো। দিন পাল্টে গেছে। প্রতিদিনই পাল্টাচ্ছে দিন। তবু এবারে তার বিয়ে-থার কথা ভাবতে হবে। ভাবে ঝড়ু।

মঙ্গলিও কানাঘুষোয় এসব কথা শোনে। গা-শিরশির করে বিয়ের কথায়, অনামা ভালো লাগায়। জীবনের এখনও অনেকই বাকি আছে। অনেক ভালো লাগা বাকি আছে এখনও। দারিদ্র্যই শেষ কথা নয়। দরিদ্রদেরও বড়লোকী থাকে। এ সব কথা শুনে মঙ্গলির কেবলই সরজু মাস্টারের কথা মনে হয়। ওর বিয়ের কথা তাই উঠলে মনখারাপও লাগে। সরজুকে তো মঙ্গলি কোনোদিনও পাবে না।
মাইল সাতেক দূরের শহরের ফুলবাগ মিন্যুসিপ্যালিটির মতির ছেলেকে ঝড়ুর পছন্দ। মতি ঝড়ুর বন্ধুও বটে। অনেক দিনেরই বন্ধু। মতির ছেলে জগ্নু এ বছরই মতি রিটায়ার করলে মতির জায়গায় চাকরি পাবে। কাজটা যদিও বাজে। এখনও খাটা পায়খানা আছে অনেকই ফুলবাগ শহরে। নামেই শহর। ব্রিটিশদের সময়ে যেমন ছিলো তা থেকেও অনেক ঘনবসতিপূর্ণ এবং নোংরা হয়ে গেছে। উন্নতি কিছুই হয়নি। অবনতিই হয়েছে। তবু ঝড়ু ভাবে, মরদের কাজের আবার খারাপ ভালো কি? যার যা কাজ। নিজেকে বোঝায় ওই সব বলে। তাছাড়া কজন মানুষই বা কাজ পায়? পাঁচ বছর বাদ বাদ ভোটের আগের বক্তৃতা তো অনেকেই শুনলো। লাশকাটা ঘরের ডোমেদের কাজের থেকে তা এ কাজ অনেকগুণে ভালো। সারাদিন খাটা-খাটনি করে দুটি মকাই বা বাজরার রুটি আর হিং-দেওয়া খেসারির ডাল গরম গরম খেতে যদি পায় মঙ্গলির ভাবী স্বামী এবং মঙ্গলি তাই তো অনেক পাওয়া। বেশি লোভ নেই ঝড়ুর। তার মেয়ে মঙ্গলি যে রাজরাণী হবে এমন আশা করে না সে।

॥ তিন ॥

দুপুরবেলা। এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। মাটি থেকে সোঁদা-সোঁদা গন্ধ উঠছে। মঙ্গলি ইতোয়ারিনকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে ঈদ্গার দিকে চলে গেছিলো। সারা বছর এই পুরো অঞ্চলটা ফাঁকাই পড়ে থাকে। দুই সম্প্রদায়েরই ভিখিরী, নেশা-ভাঙ করনেওয়ালারা, হিন্দু এবং মুসলমানদের ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, গরু, ছাগল, মুরগী চরে বেড়ায়। তবে শিশুকাল থেকে মঙ্গলি দেখে আসছে যে ঈদের আগে ও জায়গাটার চেহারাই যায় পাল্টে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়। ঝাঁট দেওয়া হয়। সাদা চাদর পাতা হয় তিনদিকে দেওয়াল-ঘেরা জায়গাটাতে। মোল্লা সাহেবের জন্যে উঁচু পাটাতন বাঁধা হয়। ইদের সময়ে ভাঙ্গী বস্তীর ডানদিকে-বাঁদিকের দুটি গাঁয়ের মুসলমানেরা নতুন জামা পরে টুপি মাথায় চড়িয়ে ঈদের নামাজ পড়তে আসে ঈদ্গাতে।
যখন ছোট ছিলো, একবার মঙ্গলি তার বাবা ঝড়ুর সঙ্গে অনেকদিন আগে এসে বাবার হাত ধরে বড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখেছিলো ঈদের নামাজ পড়া। বড় হবার পর আর এদিকে আসে না ঈদের দিনে। বস্তীর বড় মেয়েরা বারণ করে দিয়েছে। কোনো মেয়েরাই আসে না হিন্দু বস্তীর।
প্রতি বছরই ঈদের দিন সন্ধ্যেবেলায় গিয়াসুদ্দিন নানা টিফিন ক্যারিয়ারে করে বিরিয়ানি, পোলাউ, মুরগীর চাঁব আর ফিরনি নিয়ে আসে তার বন্ধু ভগলু নানার জন্যে। জাফরান দেওয়া বিরিয়ানির স্বাদ প্রতি বছরই পেয়ে আসছে মঙ্গলি আর ঝড়ু ভগলু নানার দয়ায়। বড় সোহাগভরে চেটেপুটে খায় ঝড়ু, ভগলু নানা আর ও। গিয়াসুদ্দিন নানাও ওদের আনন্দ দেখে খুশি হয় খুব। বিরিয়ানীতে যে

জাফরান দেয় তা নাকি আসে কাশ্মীরের উপত্যকা থেকে।

ঈদ্‌গার ওপাশে একটি ছোট মসজিদ আছে। মোল্লা রমজান হাজী থাকেন সেখানে। প্রতিদিন কাক ডাকারও আগে মসজিদে নামাজ পড়েন রমজান হাজী। তারপর দিনে রাতে বিভিন্ন প্রহরে। ওদের নামাজের ভাষা বোঝে না মুঙ্গলি অথবা মুঙ্গলিদের বস্তীর অন্য কেউই। ভাষাটা উর্দু বোধ হয় নয়। হিন্দুস্থানের ভাষা নয়। গিয়াসুদ্দিন চাচারাও পুরো বোঝে কিনা তা জানে না। তবে শুনতে বেশ লাগে। আল্লার প্রশংসা থাকে কি সেই সব নামাজে? কে জানে? ইদানীং মসজিদের সবদিকে লাউডস্পীকারও লেগেছে। ফুলবাগ, নিপানিয়া, গড়্‌হি সব জায়গার মসজিদেই। আজানের সময় বহু দূর থেকে শোনা যায় তা মাইকের জন্যে। জুগ্‌গি পাহাড়ের পাদদেশে ধাক্কা মেরে আওয়াজ হা-হা করে ফিরে আসে।

পিপ্পল্‌ গাছের নিচের চায়ের দোকানে সেদিনও আড্ডা হচ্ছিলো। গিয়াসুদ্দিন চাচা আসেনি সেদিন। সরজু মাস্টার বললো, বুঝলে ভগলু নানা, শোনা যাচ্ছে মধ্য-প্রাচ্যের পয়সাওয়ালা সব দেশ থেকে নাকি প্রচুর টাকা আসছে ভারতবর্ষে। আরবদের স্বপ্ন নাকি সমস্ত পৃথিবীকেই একটি মাত্র ইসলামিক রাষ্ট্র করে তোলা। প্লেন যারা ছিনতাই করলো সেদিন সেই গেরিলারা বলেছিলো না!

পাকিস্তান ও বাংলাদেশও কি এই অঢেল টাকার লোভেই ইসলামিক রাষ্ট্র হয়ে গেলো? ব্যাপারটা ভালো নয়। বললো ভগলু নানা। ভারতবর্ষকেও ইসলামিক রাজ্য করে তোলার চক্রান্ত চলছে চারদিকে। বিদেশী রাষ্ট্রদের মদত তো আছেই। চোখ কান খুলে না রাখলে একদিন বড়ই বিপদ হবে।

সরজু মাস্টার বললো।

তা কেন হবে? আর হবেই বা কি করে? ভগলু চাচা বলেছিলো অবিশ্বাসের গলায়।

হিন্দুস্থানের মধ্যেই পাকিস্তান হবে?

মুঙ্গলির বাবা ঝড়ুও সেদিন চা খেতে গেছিলো। তাই জিগগেসও করেছিলো ভগলু নানাকে। ঝড়ু সোজা লোক। লেখাপড়াও জানে না। ও নিজেই বললো, ধ্যাত্‌। তাও কখনও হয়! যেমন এখন আছি সকলে মিলেমিশে তেমনই থাকবো চিরদিন।

সরজু মাস্টার বলেছিলো, সবই হতে পারে।

॥ চার ॥

ঈদ্‌গার চারপাশে বড় বড় গাছ। বেশিই তেঁতুল। পথের পাশে পিপুল ছাড়াও একটা বড় নিমগাছ আছে। কিন্তু ঈদের নামাজ গিয়াসুদ্দিন চাচারা কখনই ছায়াতে পড়ে না। যেখানে একটুও ছায়া পড়ে না সেখানেই সার সার করে হাঁটু গেড়ে বসে সকলে নামাজ পড়ে। সাদা নতুন কাপড় বিছিয়ে নেয়। নামাজ পড়তে কিন্তু হিন্দু-দের পুজোটুজোর মত আদৌ সময় লাগে না বেশি। নামাজের তিনটি ভাগ আছে। মুঙ্গলি তো শুনেছেই, দেখেওছে। বড় বড় জায়গাতে ইমাম এবং ছোট ছোট জায়গাতে মোল্লা সাহেব কোরাণ থেকে কিছু পড়ে শোনান। তাকে বলে "খুট্‌বা"। প্রত্যেকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে তা শোনেন। তাতে মিনিট পাঁচেক সময় যায় বড় জোর। তার পরেই সকলে একসঙ্গে দু'হাত তুলে "দুয়া" মাঙ্গেন। এক মিনিট কী দু মিনিট।

তারপরই নামাজ শেষ হয়ে যায়। তারপর হিন্দুদের দশেরার মতো প্রত্যেকের সঙ্গে কোলাকুলি করেন। এই বিরাদরী দারুণই ভালো। হাসিমুখে একে অন্যকে বলেন "ঈদ মুবারক"। প্রত্যেকের বাড়িতেই সেদিন ভালোমন্দ খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্তও থাকে। যার যেমন অবস্থা। কানে থাকে তুলোর মাখানো আতর।

মেয়েরা কেউই আসে না নামাজে। মেয়েরা সব কিছু থেকেই বাদ। এইটা ভেবেই ভারী খারাপ লাগে মুঙ্গলির। মুসলমানদের কাছে মেয়েরা মানুষ বলেই গণ্য হয় না কি? পরদা আর বোরখার মধ্যেই থাকে কি আজীবন তাদের বেশির ভাগই? সতীনের সঙ্গে ঘর করা আর স্বামীর দাসীবৃত্তি ছাড়া অন্য কোন অধিকার কি মেয়েদের নেই? বাইরের পৃথিবী পুরোপুরিই বন্ধ কি ওদের কাছে? বেচারারা। যেহেতু ঐ দু বস্তীর বড় মেয়েরা বাইরে একেবারেই আসে না, ওদের সুখ-দুঃখের কথা জানারও উপায় নেই কোনো মুঙ্গলিদের।

সরজু মাস্টারের কথাগুলো কানে বাজে মুঙ্গলির। গিয়াসুদ্দিন চাচাদের সমাজে মেয়েদের যে আসন, ছেলেদের সঙ্গে যা ফারাক, তা তো হিন্দুদের জাত-পাতেরও অধম। নিজের জাতের মেয়েদেরই যারা সমান মানুষের মর্যাদা দেয় না, মানুষ বলেই মনে করে না, তাদের বিরাদরীর রকমটা বড় আশ্চর্যই বলতে হবে। পৃথিবী শুধু পুরুষদের ভোগেরই জন্যে? মেয়েদের কোনো কথাই বলার নেই? মতামত নেই? দেশ বা সমাজের উপর তাদের কোনোই নিয়ন্ত্রণ থাকবে না? এ কী অন্ধকারের জীবন তাদের? কী বড়লোকের আর কী গরীবের মেয়ের!

মুঙ্গলি ভাবে, ভাগ্যিস মুঙ্গলি ভাঙ্গী ছাড়া অন্য গাঁয়ে জন্মায়নি। জন্মালে ও আত্মহত্যা করতো। ওর স্বাধীনতাকে বড়ই ভালোবাসে মুঙ্গলি। প্রাণ গেলেও এই স্বাধীনতা, এই ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়ানো, এই বৃষ্টিতে ভেজা, জুগাগি পাহাড়ের পায়ের কাছে বসে রোদ পোয়ানো, সেজে গুজে হাটে যাওয়া, শুক্কুরবারে শুক্কুরবারে; দুর্গাপুজো দেখতে যাওয়া ফুলবাগ শহরে। ঝুমুরী গিলাতে দশেরার মেলাতে গিয়ে গরম জিলাবি খাওয়া আর কাঁচের চুরি কেনা—এ সব কিছুকেই বড় ভালোবাসে ও। মেয়েদের পায়ের নিচে দাবিয়ে রেখে পুরুষদের যে "বিরাদরী" তার প্রতি মুঙ্গলির অন্ততঃ কোনো শ্রদ্ধা নেই। কোটি কোটি এমন সব মেয়েদের জন্যে দুঃখে মুঙ্গলির বুক ফেটে জল আসে।

এলো-মেলো পায়ে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়ানো মুঙ্গলি হঠাৎ চোখ তুলে দেখলো আকাশ আবারও কালো করে আসছে।

মুঙ্গলি বললো, চল্‌রে ইতোয়ারিন্। ঘরু লওট্ যাবু।

ইতোয়ারিন সায় দিলো।

বললো, ঘোৎ ঘোৎ।

॥ পাঁচ ॥

আজ ঈদ। ট্রাকে করে, বাসে করে দলে দলে মুসলমানেরা আসছে দুদিক থেকে ঈদ্গাতে। অনেকগুলো মাইক লাগানো হয়েছে। পথের পাশে দোকান বসেছে অনেক। মেলার মতো দেখাচ্ছে দূর থেকে পুরো জায়গাটা। দোকানে নানারকম মিষ্টি বিক্রি হচ্ছে। ফল, মোরুগা, আণ্ডা, বকুরীর বাজার বসেছিলো গতকাল। গরু কাটা হয়েছে দুগ্রামেই। পিঁজরাপোলের গরু নয়। নধর গরু।

প্লিশ এসেছে এক ট্রাক। পাছে, নামাজ পড়ার সময়ে নামাজীদের কোনোরকম অস্বিধে হয় তাই। প্রতিবারই আসে নামাজ পড়ার ঘণ্টাখানেক আগে। নামাজ পড়া শেষ হলে আবার ফিরে যায় কোতোয়ালিতে। পথের দোকানে চা-পান খেয়ে। চলে-যাওয়া তাদের উঁচু গলার গাল-গল্প চলন্ত-ট্রাক থেকে উড়ে আসে ভাঙ্গী বস্তীর মান্ষদের কানে।

মুঙ্গলির বাবা ঝড়ু সকালেই বলে গেছিলো, বাড়ি ঘর সব পরিষ্কার করে রাখতে। ঝড়ু গেছে এক বোঝা শালপাতার দোনা নিয়ে ফুলবাগ শহরে বেচতে। ভাঙ্গী বস্তী নামেই ভাঙ্গী বস্তী। আজকাল ধাঙ্গড়ের কাজ করে খুব কম মানুষই। সাহেবী "সিসটেম" "কমোড" হয়ে গিয়ে ধাঙ্গড়দের প্রয়োজন কমে গেছে। শহরের মানুষেরা নিজেরাই বা তাদের বাড়ির কাজের লোকেরাই কমোড পরিষ্কার করে নিতে পারে। এসিড পাওয়া যায় বোতলে। কমোড পরিষ্কার করার। বাজারে নানা রকম ব্রাশও কিনতে পাওয়া যায় লম্বা বেঁটে হাতল-ওয়ালা।

বাড়ি ঘর পরিষ্কার করতে বলে গেছে বাবা কারণ কাল নাকি ফুলবাগ শহর থেকে মেহমান আসবে। তার ভাবী শ্বশুর।

শ্বশুর কেন? মুঙ্গলি নিজেকে শুধিয়েছিলো। সেই মতি না ফতির ছেলে যে সে নিজে আসবে না কেন? যার সঙ্গে মুঙ্গলির সারাজীবন দুঃখে-সুখে ঘর করতে হতে পারে তাকে একবার চোখের দেখাও দেখবে না পর্যন্ত নিজে বিয়ের আগে? মুঙ্গলির কি কোনো ইচ্ছে-অনিচ্ছে নেই? বাবা কি তাকেও পরাধীন করে দিল?

আর মাস্টার? সরজু মাস্টার? কত কী জানে শোনে সে। একদিন মাস্টারের সঙ্গে একাই আলাপ করবে মুঙ্গলি। ঠিক করেছে মনে মনে। অনেক কথা বলবে তাকে। পলাশ বনে বসন্তদিনে একা একা চড়া বেলায় ঘুরতে ঘুরতে কি বলবে তার মহড়া দিয়েছে অনেকবার। কিন্তু বলা হয়নি কোনোদিনও। ধাঙ্গড় বলে কি চিরদিন এই সমাজেই থাকতে হবে মুঙ্গলিকে? ভারী রাগ হচ্ছে মুঙ্গলির একথা ভেবেই। মাস্টারের মুখটা কেবলই বার বার মনে আসে। চান করার সময়, ঘুম আসবার আগে, স্বপ্নের মধ্যে, বৃষ্টির মধ্যে জুগুগি পাহাড়ের ঢালে ঝাঁটি-জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়িয়ে কাক-ভেজা ভিজতে ভিজতে।

একটা বড় দীর্ঘশ্বাস পড়ে মুঙ্গলির। ও জানে যে এ স্বপ্নও ওর অনেক স্বপ্নরই মতো। সত্যি হবে না। মুঙ্গলি এও জানে যে প্রত্যেক মেয়ের মনের মধ্যে যে মানুষ থাকে তার সঙ্গে ঘর করার বরাত ভারতের সাধারণ মেয়েদের হয় না। কী হিন্দুর! কী মুসলমানের!

বাবা বলেছে, শুয়োরের মাংস নিয়ে আসবে গামারিয়ার হাট থেকে। আর ছোলার ডাল। আটাও আনবে কলে-পেষা। কাল ভালো করে রাঁধতে হবে মুঙ্গলিকে। ফুলবাগের মতি না ফতি, হবু শ্বশুর না ফসুর। তার জন্যে।

ইতোয়ারিনকে মুঙ্গলি বস্তীর অন্য শুয়োরদের সঙ্গে কোনোদিনই মিশতে দেয়নি। সে যে তার পোষা প্রাণী। তার সখী। আজেবাজে জিনিসও খেতে দেয় না। ওরা যা খায়, তার থেকেই একটু দেয়। তাছাড়া, জঙ্গল পাহাড়ে বা টাঁড়ে এইজন্যেই তো সঙ্গে করে নিয়ে ফেরে রোজই যাতে ইতোয়ারিন মূল খুঁড়ে খেতে পারে। মহুয়ার সময়ে মহুয়া, আমলকির সময়ে আমলকি, আমের সময়ে জংলী আম। তেঁতুল একেবারেই

খতে পারে না বেটী। মুখে দিলেই মুখ যা ভ্যাটকায়। হেসে বাঁচে না মুঙ্গলি দেখে।
মারম্বার দড়ি দিয়ে বাড়ির সামনের খোঁটাতে ইতোয়ারিনকে সকাল থেকেই ভালো
রে বেঁধে রেখে যত্ন করে উঠোন নিকোচ্ছিলো মোষের গোবর দিয়ে মুঙ্গলি। ঠিক
সই সময়ই ঈদ্গা থেকে মাইকগুলো সব একসঙ্গে গম্‌গম করে উঠলো। মোল্লা
াহেবের গলা। এ তো "খুট্‌বা" নয়। এ তো বড় উত্তেজিত ক্রুদ্ধ গলা। তার উপরে
বজাতীয় ভাষা। মরুভূমির গন্ধ আছে এই ভাষায়। কী ভাষা কে জানে? নামাজের এই
ংশকেই তো "খুটবা" বলে। এর পরেই "দুয়া" মাঙ্গার কথা। তারপরই নামাজ শেষ।
াইকের আওয়াজ গম্‌গম্‌ করে চতুর্দিকে ছড়িয়ে যাচ্ছিলো। "খুট্‌বা" শুনতে
ুনতেই হঠাৎ মাইকে একটা প্রচণ্ড শোরগোল উঠলো। সেই শোরগোল বিরক্ত ক্রুদ্ধ
়ে অসংখ্য মাইকের মধ্যে দিয়ে অনেক জোরে ভেসে এলো এদিকে।

পাশের ঘরের সুরাতিয়া দিদি চেঁচিয়ে বললো, আরে এ মুঙ্গলি, ইতনি হল্লাহুল্লা
ওন্‌ চি কি?

ুঙ্গলির উঠোন নিকোনোর সামান্যই তখনও বাকি ছিল। তার হাতে গোবর।
বরক্তির গলায় বললো সে, কওন্‌ জানে, কঁওন্‌ চিকি?

ুরাতিয়া দিদি বোধহয় ঘরের বাইরে গিয়ে শিমুলগাছটার নিচের কালো পাথরের
তূপের উপর গিয়ে উঠে দাঁড়ালো. ব্যাপার কি তা ভালো করে দেখবার জন্যে। তার
লার অপস্রিয়মাণ আওয়াজেই বুঝলো মুঙ্গলি। শিমুলতলিটা উঁচু। ওখান থেকে
পচ রাস্তা, মসজিদ আর ঈদ্গা সবই দেখা যায়।

পরক্ষণেই সুরাতিয়া দিদির আতঙ্কগ্রস্ত চিৎকার শোনা গেলো, পুলিশোয়াকে মার
দল্‌ হো। পাত্থল ফেক্‌তা হ্যায় ঢেরসা উনলোকোনে সবে।

াহে লা?

ুঙ্গলি শুধোলো আরও বিরক্তি কিন্তু উদাসীনতারই সঙ্গে, ঘর নিকোনো শেষ করতে
রতে। ঘরের মধ্যে থেকেই শুধোলো। সামান্য কাজ তখনও বাকি ছিলো।
্যায় জানু ক্যায়সি? উত্তেজিত গলায় সুরাতিয়া দিদি বললে।

এবার গোবর হাতেই মুঙ্গলি বাইরে এসে শিমুলতলিতে সুরাতিয়া দিদির পাশে
াঁড়ালো। দেখলো নামাজীরা ফটাফট্‌ পাথর মারছে পুলিশদের। পুলিশদের মধ্যে
ুজন পড়ে গেলো। অনেক পুলিশেরই মাথা ফেটে রক্ত বেরোচ্ছে। লাল রক্ত।
ফনুকি দিয়ে। তখন একজন পুলিশ রাইফেল ভীড়ের দিকে তুলে গুলি করলো।
ুড়ুম্‌ করে শব্দ হলো।

ুরাতিয়া দিদি অত্যন্ত ভীত এবং আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে বললে, ভাগ্‌ ভাগ্‌। জল্‌দি ঘর
াগ্‌ যা মুঙ্গলি। বলতে বলতেই সুরাতিয়া দিদিও দৌড়তে দৌড়তে নামলো নিচে।
ুঙ্গলি কিন্তু তখনও দাঁড়িয়েই ছিলো। পুলিশের সঙ্গে জনতার মারামারি কখনও
দখেনি আগে। ততক্ষণে বস্তীর মেয়েদের মধ্যে কান্নাকাটি পড়ে গেছে। মরদরা
কউই নেই এখন বস্তীতে। একমাত্র বুড়ো রিটায়ার্ড বউ-মরা নিঃসন্তান ফৌজী ভগলু
ানা তার ঘরের সামনের মাটির দাওয়াতে বসে তখন দাড়ি বানাচ্ছিলো মুখের সামনে
ায়না ধরে। সেও গুলির শব্দ শুনে দৌড়ে এসে মুঙ্গলির পাশে দাঁড়ালো। এমন
ময় হঠাৎ মুঙ্গলি দেখলো, ইতোয়ারিন্‌ ঐ ভীড়ের মধ্যে থেকে ভীষণ ভয় পেয়ে
দৌড়ে আসছে লাফাতে লাফাতে ভাঙ্গী বস্তীর দিকে। ইতোয়ারিন্‌ যে কখন মোরম্বার

দড়ি ছিঁড়ে ওদিকে চলে গেছিলো টেরই পায়নি মঙ্গলি। অন্য কেউও না। ঈদের নামাজের জন্যে অনেকই দোকান-পাট বসেছিলো ওখানে আজ। কিছু খাবার লোভেই কি চলে গেছিলো? কিন্তু দড়িটা ছিঁড়েই বা গেল কি করে? মোরব্বা মানে সিসাল্-এর দড়ি।

মঙ্গলি ভাবলো, সাধে কি আর মুসলমানেরা শুয়োরকে হারাম বলে। শুধু হারামই নয়, ইতোয়ারিন্ একটি নিমক-হারামও বটে। এতো তাকে যত্নে রাখে তবুও খাবার লোভে গেলো। হারামজাদী।

জলদি আ। জলদি আ। আ। আজ তেরা টেংরি তোড়ব্।

চরম বিরক্তিতে চেঁচিয়ে উঠলো ক্রুদ্ধ হতচকিত মঙ্গলি। যদি পুলিশের গুলি বা পাথর লাগে ইতোয়ারিনের গায়ে এই ভয়ে ও সিঁটিয়ে ছিলো।

টেংরী ভাঙ্গার ভয়ের চেয়েও রাইফেলের গুলির শব্দে অনেক বেশি ভয় পেয়ে ইতোয়ারিন্ প্রাণপণে থপ্‌থপ্ করে দৌড়ে আসছিলো। পুলিশদের উপরে শয়ে শয়ে পাথর পড়ছিলো তখন। নামাজ বন্ধ হয়ে গেছিলো। এবারে আবারও গুলির শব্দ হলো। পরপর কয়েকবার। পাথরবৃষ্টির মধ্যে প্রাণ বাঁচাবার জন্যে গুলি করছে পুলিশরা।

ইতোয়ারিন্ বস্তীতে না পেঁছানো অবধি মঙ্গলি অপেক্ষা করছিলো। এমন সময় নামাজীদের ভীড়ের মধ্যে থেকে কয়েকজন আঙ্গুল তুলে দেখালো ইতোয়ারিন্ আর মঙ্গলির দিকে। এবং তার সঙ্গে সঙ্গেই একদল মানুষ পাগলের মতো দৌড়ে এলো ইতোয়ারিনের পিছু পিছু।

এক গালের দাড়ি কামানো, অন্য গালে সাবান নিয়ে ভগলু দানা আতঙ্কগ্রস্ত গলায় বললো, ভাগ্ বেটি। ভাগ্ যা সব্বে বস্তী ছোড়্কর্। তুরন্ত্। ভাগ্ সুরাতিয়া! ভাগ্ মঙ্গলি। সব্বে ভাগ্।

কিন্তু অত তাড়াতাড়ি কি পালানো যায়? যৎসামান্য সম্বল, তা সে যত সামান্যই হোক না কেন, তা ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া অত সোজা নয়। মেয়েদের পক্ষে তো নয়ই। মঙ্গলি প্রথমে নিজেদের ঘরের দিকে দৌড়ে এলো। কিন্তু নিজেদের ঘরে ঢুকতে-না-ঢুকতেই একটি তীব্র আর্তচিৎকার শুনলো ভগলু নানার। কী হলো দেখতে না পারলেও বুঝলো যে সাংঘাতিক কিছু ঘটে গেলো। পরক্ষণেই রে-রে-রে করে শয়ে শয়ে নামাজীরা ভাঙ্গী বস্তীর ঘরে ঘরে ঢুকে পড়লো। পালাতে মেয়েরা একজনও পাবলো না।

মঙ্গলির উপরে অনেকগুলো দাড়ি-গোঁফওয়ালা পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ-ভরা রাগী কামার্ত কুৎসিত মুখ নেমে এলো। নেমে এলো অনেকগুলো হাত ওর সারা শরীরের আনাচে-কানাচে। সুরজ মাস্টারের মুখটা হঠাৎ ভেসে উঠলো একবার এক ঝলক চোখের সামনে। তারপর মুহূর্তেই তার শাড়িখানি ফালাফালা করে ছিঁড়ে তাকে মাটির মেঝেতে চিৎ করে শুইয়ে ফেললো মানুষগুলো।

সুরাতিয়া দিদি তীব্র চিৎকার করে ককিয়ে কেঁদে উঠলো। বললো, হায় রাম!

সুরাতিয়া দিদির বয়স হবে তিরিশ। ছেলেমেয়ে নেই কোন। প্রতি ঘর থেকেই বিভিন্ন বয়সী নারীর আর্তচীৎকারে পুরো বস্তী খান্‌খান্ হয়ে গেলো। তালাও এর জল ভয়ে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো। বাইরে থেকে শিশুদের আর্তনাদ

তীব্র, তীক্ষ্ম যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে যেতে যেতে মঙ্গলি শুনলো একজন নামাজী ওকে বলেছে, হারাম ভেজিন্ থী নামাজ মে? শালী। হারামজাদী।
দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে যাওয়া একটি অবলা অবোধ যুবতী শুয়োরী ইতোয়ারিনের হাতেই যে একটি বিশ্বব্যাপী ব্যাপ্ত প্রাচীন ধর্মের পুরো সম্মান নির্ভরশীল ছিলো এই জটিল এবং অবিশ্বাস্য কথাটা মঙ্গলির মোটা মাথায় কিছুতেই ঢুকছিলো না। হতভম্ব, স্তব্ধ হয়ে গেছিলো ও।

॥ ছয় ॥

জ্ঞান যখন ফিরলো মঙ্গলির, তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। রাত নেমে এসেছে। তার বাবা তখনও ফেরেনি। বস্তীর অন্য পুরুষেরা যদিও ফিরে এসেছে। বস্তীর বেশির ভাগ ঘরই আগুনে পুড়ে গেছে। মঙ্গলিদের ঘরও। তার ভাবী শ্বশুর না ফসুর মতি না ফতির আসা হলো না।
চোখ মেলে দেখলো মঙ্গলি যে, জুগুগি পাহাড়ের নিচে ঝাটি-জঙ্গল-ভরা জমিতে শুয়ে আছে সে। আরও অনেকের সঙ্গে। দুই পা রক্তে ভেজা। ভেজা শাড়ি। গায়ে অনেক জ্বর, বড় ব্যথা। ধাইমা তাকে কী সব জড়ি-বুটি করছেন। ধাইমাকে মানুষগুলো ছোঁয়নি। সাদা চুলের অশীতিপর বুড়ী।
ভগলু নানার উদার বুকটা কসাই-এর গরু-কাটা ছুরি দিয়ে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়ে গেছে ওরা। তার ওপর অন্য একজন পেটে একটা ছুরি ঢুকিয়ে মোচড় দিয়ে নাড়িভুঁড়ি সব বের করে দিয়েছে। শিমুলতলিতে শকুন পড়েছে ভগলু নানার উপরে। শেয়ালে-শকুনে ঠুকরে খাচ্ছে তার মৃতদেহ।
পুরুষরা ছিলো না বলেই প্রাণে বেঁচে গেছে। যদিও মানে মরে গেছে মেয়েরা। চতুর্দশীর রাত আজ। আলো আছে। সদরের লাশ-কাটা ঘরে যখন ভগলু নানাকে নিয়ে যেতে আসবে পুলিশ তখন তার লাশের বোধহয় আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। বস্তীর ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে দশ-বারোজনকে ঐভাবেই কুপিয়ে কেটেছে ওরা। শকুন বসে আছে চাঁদভাসি আকাশের পটভূমিতে জুগুগি পাহাড়ের ঢালের পলাশবনের ডালেও। চারধারে কান্না, বিলাপ আর আর্তনাদ।
মঙ্গলির বাবা ফিরলো হাতে শুয়োরের মাংস আর ছোলার ডাল নিয়ে ফুলবাগ থেকে হেঁটে। যানবাহন সব বন্ধ।
মঙ্গলি শুনতে পেলো সরজু মাস্টার কথা বলছে দূরে পুরুষদের জটলার মধ্যে বসে। তার গলা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে মঙ্গলি। বড় কষ্ট হতে লাগল ওর। বড় কষ্ট। পুজোয় লাগার আগেই দলিত, পিষ্ট, গলিত হয়ে গেলো ফুল।
দশরথ চাচা বললো, মঙ্গলি শুনলো, শুয়োর ওদের কাছে "হারাম"। মঙ্গলির ইতোয়ারিন্ যদি ঘুরতে ঘুরতে ওখানে না যেতো…।
শুয়োরও তো ঈশ্বরেরই সৃষ্টি। মঙ্গলি তো ইতোয়ারিনকে ইচ্ছে করে পাঠায়নি। সে গেলেও তো লাথ্ মেরে তাকে তাড়িয়েও দিতে পারতো ওরা। তাহলেই তো মামলা মিটে যেতো। সরজু মাস্টার বললো।
না। তা তাড়ায়নি। ওদের ধর্মে আঘাত লেগেছিলো বলে…। হঠাৎ গিয়ে-পড়া শুয়োরীর মতো একটা বদবু, সুরতহারাম মাদী জানোয়ার অতগুলো সুস্থ স্বাভাবিক এবং অসংখ্য শিক্ষিত মানুষকেও পাগল করে দিলো। পুলিশদের না মেরে সকলে

পাথর মেরে ইতোয়ারিন্‌কেও না-হয় মেরেই ফেলতো। মুঙ্গলি না-হয় কাঁদতো খুবই। আর কী হতো? তাছাড়া পুলিশদেরই বা মারলো কেন? কোনো যুক্তি...কোনো যুক্তি কি?

পুলিশদের মারলো, পুলিশরা শুয়োরটাকে অ্যারেস্ট করেনি বলে। আটকায়নি বলে। ওদের ধারণা, পুলিশরা চক্রান্ত করেই নাকি নামাজের মধ্যে শুয়োর ঢুকিয়ে দিয়েছিলো। এ চক্রান্তর মধ্যে ভাঙ্গী বস্তীর মানুষেরাও ছিলো। দশরথ চাচা বললো। সরজু মাস্টার বললো, ক্যা বাৎ!

দশরথ চাচা বললো, ইতোয়ারিন্‌কে তো মুঙ্গলি বেঁধেই রেখেছিলো। ঈদের নামাজ তো আর ঈদ্‌গাতে এই প্রথম বারই হলো না। এতো বছর ধরে হচ্ছে। কোনোদিনও এমন ঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটেনি। ওরা ভাবলো কি করে যে চক্রান্ত ছিলো এর পিছনে। এতো বদমেজাজ কিসের ওদের? ভাবে কি ওরা নিজেদের? মানুষ এমন অন্ধও হতে পারে? গিয়াসুদ্দিন চাচার মতো মানুষও তো সেখানে ছিলো। সেও কি বোঝাতে পারলো না? এমন অবুঝপনা। ভাবা যায় না। সত্যিই ভাবা যায় না।

গিয়াসুদ্দিন চাচা পুলিশের গুলিতে মারা গেছে।

কে বললো?

সমস্বরে অনেকেই বলে উঠলো অবিশ্বাসের গলায়।

সরজু মাস্টার বললো, হ্যাঁ, তাই।

ইসস্‌। তাই? স্তব্ধ হয়ে গেলো সকলে।

হ্যাঁ। পুলিশেরা তো আর দেখে দেখে গুলি করেনি। দশরথ চাচা বললো, নিজেদের প্রাণ বাঁচাতেই করেছিলো।

সরজু মাস্টার বললো, ভগলু নানা যেমন ওদের ছুরিতে ফালা-ফালা হয়ে গেছে তেমন গিয়াসুদ্দিন চাচাও পুলিশের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা কতগুলো মাথামোটা ধর্মান্ধ লোকই চিরদিন লাগিয়ে এসেছে। কী হিন্দু, কী মুসলমান। আর তাতে মারা গেছে চিরদিনই ভাগলু নানা আর গিয়াসুদ্দিন চাচাদের মতো, বিজ্ঞপ্রাজ্ঞ, যুক্তিসম্পন্ন, বুদ্ধিমান, হৃদয়বান মানুষেরাই। এই হচ্ছে এসবের নতীজা।

এসব আলোচনা আস্তে করো। কে শুনে ফেলবে। তারপর পুলিশ এসে আমাদের ধরবে। গরীবের সহায় তো কেউই নেই।

কে যেন বললো।

ঝড়ু বললো, আবার যদি ওরা আমাদের কোতল করার জন্যে ফিরে আসে? কি হবে?

দশরথ বললো, আবারও যদি আসে তবে আমরা তো আর মেয়ে নই, এসেই দেখুক না। আপোয়া, তীরধনুকগুলো?

সব আছে হাতের কাছে।

দোষটা তো আসলে এই ভোটের কাঙাল বদমাশগুলোরই। বেয়াল্লিশটা বছর চলে গেছে। এখনও মুখ বুজে থাকবো? ফিরে এসেই দেখুক না হারামীরা।

সরজু মাস্টার বললো, ঠিক বলেছো। হিন্দুস্তানে বাস করেও ন্যায্য কথা যদি না বলার সাহস থাকে ঐ শিমুলগাছে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়ো ঝড়ু চাচা। প্রত্যেক

অন্যায়েরই একটা সীমারেখা থাকে। সেই সীমান্তে অন্যায়কে যদি আটকাতে না পারো তবে আর কোনোদিনও অন্যায়কে আটকাতে পারবে না।

ঝড়ু বললো, রিলিফ আসবে না সদর থেকে? এই বস্তীর জন্যে?

দশরথ বললো, এসেছে তো। তবে এ বস্তীর জন্যে কিছুই নয়। রিলিফ-টিলিফ ঐ দুই বড় বস্তীর জন্যে। পাঁচ ট্রাক খাবার-দাবার। এক ট্রাক ওষুধও এসেছে। লঙ্গর-খানাও খোলা হয়েছে। গুলিতে আহতদের অ্যাম্বুলেন্সে করে নিয়ে গিয়ে সদরের হাসপাতালে ভর্তিও করা হয়ে গেছে। মারা গেছে ন'জন। আহত দশ। তার মধ্যে পুলিশের দুজন আর পাঁচজন। পুলিশ ভাঙ্গী বস্তীতেও আসছে শুনে এলাম।

কেন? মুঙ্গলিকে অ্যারেস্ট করবার জন্যে। মুঙ্গলিই নাকি দাঙ্গা বাধাবার মূলে। সত্যিই এস. পি. নিজে আসছেন অনেক ভ্যান পুলিশ সঙ্গে নিয়ে সদর থেকে। গাগারির পুলিশ চৌকি নামাজীরা আক্রমণ করে পুড়িয়ে দিয়েছে। অনেক পুলিশ মরেছে নাকি সেখানে।

পুলিশ হাতে রাইফেল নিয়েও মরে গেলো? রাইফেল হাতে নিয়ে পাথর খেয়ে কি করে মানুষ মরে তা জানি না।

হিন্দুস্থানের পুলিশের রাইফেলের ট্রিগার থাকে রাজনৈতিক নেতাদের আঙুলে। পুলিশেরা সব পুতুল। গতজন্মের অনেক পাপ থাকলে তবেই কোনো ভদ্রলোক মহান ভারতীয় গণতন্ত্রে পুলিশের চাকরি করতে আসেন।

রিলিফ আসেনি। কেন আসবে? ওখানে এলো আর এই গ্রাম কি দোষ করলো? আসোয়া শুধোলো।

এত দুঃখেও সরজু মাস্টার হেসে ফেলে বললো, সে সব কোনো কারণই নয় আসোয়া। ওরাও মানুষ, আমরাও মানুষ।

তবে? ঝড়ু বললো হতবাক হয়ে, তবে এই তফাতটা কেন? কিসের জন্যে?

হাঃ! এ দুটি বস্তী মিলিয়ে যে ছটি হাজার ভোট। আর ঝড়ু চাচা, তোমাদের এখানে মাত্র তিনশো ভোট। শুয়োরদেরও যদি ভোট থাকতো তা ধরেও। তোমাদের জন্যে কাদের মাথাব্যথা আছে বল? এখন ইতোয়ারিনের মতো শুয়োরীরাই এই দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তারাই এখানে দাঙ্গা বাধায়। ভোট আনে অথবা ভাঙ্গায়। মুঙ্গলি তার কানের কাছে ঘোৎঘোৎ শব্দ শুনলো একটা। হাত বাড়িয়ে গা ছুঁলো ইতোয়ারিনের। ইতোয়ারিনও তো জাতে মেয়েই। বে-ইজ্জৎ হওয়ার ভয়ে, সেও বুঝি তখনও থরথর করে কাঁপছিলো। মুঙ্গলি তার হাত দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরলো ইতোয়ারিনের।

সুখরাম

—শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

সুখরামের জীবনে কোনও সুখ নেই।

সুখরামের একটাই মাত্র নেশা, মাটি দিয়ে নানারকম মূর্তি গড়া। খেয়ালখুশিমতো যা মনে আসে তাই সে চটপট গড়ে ফেলে। তার মূর্তিগুলো বেশ বিক্রিও হয়। আবার যা বিক্রি হয় না তাও অনেক জমে থাকে তার বাড়িতে। মূর্তি গড়া ছাড়া সুখরামের আর কোন কাজ নেই, নেশা নেই, ধান্ধা নেই।

সুখরামের আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধবও বিশেষ কেউ নেই। তাতে অবশ্য সুখরামের কোনও অসুবিধেই হয় না। মূর্তি গড়তে গড়তে সে সেইসব মূর্তির সঙ্গেই আপনমনে কথা বলে। মূর্তিরা তো আর কথা কয় না, সুখরাম একাই একতরফা কথা বলে যায়। ওইভাবেই তার বুকের ভার লাঘব হয়।

তা বলে সুখরামের যে গুণগ্রাহী বা সঙ্গীসাথী নেই এমন নয়। পাড়া প্রতিবেশী বা শহরের লোকদের মধ্যে কেউ কেউ আসে। অনেকে মূর্তি গড়া দেখতে, অনেক আসে এমনিই। তা তাদের সঙ্গেও কথা বলতে হয় বটে সুখরামের, কিন্তু কথা বলে জুৎ পায় না সে।

ধনঞ্জয় এসে বলে, তুমি বাপু, কেমন যেন শুকনো মানুষ। রসকষ নেই হে তোমার?

সুখরাম কথার পিঠে কথা কইতে জানে না। সে বলে, কথা টথা আমার আসে না। সে তো বুঝলুম, কিন্তু নিজের গড়া পুতুলের সঙ্গে তো বাপু সারাদিন মুখের ফেকো তুলে বকবক করো। তা সেই কথাগুলোই না হয় আমাদের পুতুল ভেবে কইলে।

সুখরাম বলে, ওরা তো প্রশ্ন করে না, তাই কথা কইতে আটকায় না। অন্যেরা বড্ড কথা কয়। জিজ্ঞেস করে।

ধনঞ্জয় খুব হাসে। বলে, ওরে বোকা, কথা কয় বলেই তো মানুষ। কথা কয়, হাসে, ঠাট্টা ইয়ার্কি করে, ঝগড়া কাজিয়াও করে, তবে না জ্যান্ত মানুষ। তোমার ওইসব মরা পুতুলের সঙ্গে কি জ্যান্ত মানুষের তুলনা হয়?

সুখরাম অবশ্য তফাৎটা তেমন বোঝে না।

তবে ভাবে।

লামডিঙে যারাই বেড়াতে টেড়াতে আসত তারাই একবার করে সুখরাম কারিগরের পুতুল গড়ার আশ্চর্য কৌশল দেখে যায়। অনেকে বেশ চড়া দামে পুতুল কিনেও নেয়। সুখরামের আশ্চর্য সব পুতুলের মধ্যে মানুষ আছে, জন্তু জানোয়ার আছে, পাখি কীটপতঙ্গও আছে।

সুখরাম যা দেখে তাই গড়ে ফেলতে পারে। এটাই তার আশ্চর্য ক্ষমতা।
লামডিঙ এক আশ্চর্য জায়গা, সবাই জানে। এখানেই একমাত্র খাঁটি ধানীরঙের রোদ দেখা যায় সকালে। এখানকার জ্যোৎস্না এক বিখ্যাত জিনিস। এরকম সবুজ জ্যোৎস্না পৃথিবীর কোথাও ফোটে না। আর প্রতি রাতেই জ্যোৎস্না লামডিঙ ছাড়া আর কোথায় দেখতে পাবে মানুষ? লামডিঙের ঘাসে লেবুপাতার মৃদু গন্ধ আছে। গাছপালার রঙ এমন উজ্জ্বল সবুজ যে, মনে হয় কোন পটুয়া সদ্য রং লাগিয়ে গেছে। গাছে এত ফুল ফোটে যে, ফুলের মধু খেয়ে খেয়ে মৌমাছি আর মধুভুক পতঙ্গদের দিনরাত মাতাল অবস্থা। ফুলের গন্ধে বাতাস সর্বদা ভারী হয়ে থাকে। আর ফল? মানুষের তো ফল খেয়ে খেয়ে অরুচি হয়েছেই, পাখি পক্ষীরা অবধি ফল খেয়ে খেয়ে হেঁদিয়ে পড়ে থাকে। আর ঋতুর কথা উঠলে বলতেই হবে যে, লামডিঙে শীত গ্রীষ্ম বর্ষা বলে কিছু নেই।
এখানে যেন সর্বদাই শরতের একটা ভেজা ভেজা অথচ উজ্জ্বল ভাব। দরকার মতো বৃষ্টি হয়, কিন্তু মেঘলা হয়ে থাকে না।
তা এই লামডিঙে ঘুরে ঘুরে সুখরাম যা দেখে তাই গড়ে ফেলতে দেরী করে না।
তা সুখরাম একদিন লামডিঙের এক কুঞ্জবনে কয়েকজন মেয়েকে চড়ুইভাতি করতে দেখতে পেল। এরা সব বাইরে থেকে আসা মানুষ।
লামডিঙের সবাইকেই সুখরাম চেনে। এরা তার অচেনা। মেয়েরা নদী থেকে জল আনছিল, কাঠকুটো জ্বেলে ভাত রান্না করছিল, আর হৈ হৈ করে হাসছিল। তাদের মধ্যে একটা মেয়েকে দেখে সুখরাম একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল। এমন সুন্দর মেয়ে সে কখনও দেখেনি। সবুজ রঙের একখানা শাড়ি পরা মেয়েটা যেন স্বর্গরাজ্য থেকে নেমে এসেছে। মুখখানা নিখুঁত।
সুখরাম সরল মানুষ। তার ভারী ইচ্ছে হল মেয়েটার সঙ্গে গিয়ে একটু কথা হয়। কিন্তু কথা কইতে সে মোটে জানেই না। তার ওপর কারিগর মানুষ, তার পোশাক টোশাক মোটেই ভাল নয়। তার হাতে পায়ে মুখে সর্বদা মাটি লেগে থাকে। কস্মিনকালে দাড়ি কামায় না সুখরাম। চুলও আঁচড়ায় না। জামাকাপড়ও নোংরা। তাকে দেখে কারও বিশ্বাসই হবে না যে, সে এত বড় একজন শিল্পী মানুষ।
সুখরাম মুগ্ধ হয়ে মেয়েটাকে দেখতে দেখতে সম্মোহিতের মতো উঠে তার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। তাকে দেখে সব মেয়েই কাজকর্ম থামিয়ে হাঁ করে চেয়ে থাকে। সুখরামকে তারা তো চেনে না। ভাবে, পাগল-টাগল বুঝি।
সুখরাম তোতলাতে তোতলাতে বলে, তোমার নামটি কি?
মেয়েটা একটু গম্ভীর আর কঠিন হয়ে বলে, তা দিয়ে আপনার কী দরকার?
সুখরাম এরপর এত তোতলা হয়ে গেল যে আর কোনও কথাই তার মুখ দিয়ে বেরোলো না। তার সেই সঙ্গীন অবস্থা দেখে মেয়েগুলোর সে কী হাসি।
সুখরাম লজ্জায় অপমানে লাল হয়ে পালানোর পথ পায় না।
পালিয়ে এলেও সে মেয়েটাকে কিছুতেই আর ভুলতে পারে না। চোখ বুজলে দেখতে পায়, চোখ খুললেও দেখতে পায়। তার দুটি হাত আপনা থেকেই এঁটেল মাটি মাখতে লাগল।
তার দুটি নিপুণ হাতে ধীরে ধীরে মাটির প্রতিমা হয়ে মেয়েটি ফুটে উঠল। যতদূর

পারে নিখুঁত করেই গড়ল তাকে সুখরাম। খুব যত্ন করে, খুব ভালবাসা দিয়ে। একদিন যখন সত্যিই শেষ হল সেই মূর্তি, সেদিন সুখরাম নিজের সৃষ্টি দেখে নিজেই অবাক। সে এতকাল ধরে মূর্তি গড়ছে, কিন্তু এতটা জীবন্ত যেন আর কোনটাই নয়। মেয়েটি যেন চোখের পাতা ফেলবে এক্ষুনি। এখনই যেন হেসে উঠবে। বা কথা কইবে।
ধনঞ্জয় এসে মূর্তিটা খুব ভাল করে নিরিখ করার পর বলল, বাঃ, খাসা হয়েছে তো! তোমার বাহাদুরি আছে বটে। এই মূর্তি ভাল দামে বিকোবে হে।
ওটা বেচব না।
সুখরাম মূর্তিটার সঙ্গে যথারীতি কথা কয়। ভালবাসার কথা, সুখের কথা, আবার মানে নেই এমন কথাও।

দিন যায়। রাত যায়। লোকে আসে, সুখরামের মূর্তি দেখে ভীড় করে ফেলে, সাধুবাদ দেয়। সুখরাম গা করে না। কারও দিকে ফিরেও চায় না। সেই মেয়েটার মূর্তি সুখরাম একটু সরিয়ে একটা পর্দার আড়ালে রেখেছে, যাতে পাঁচ জনের নজর না পড়ে।

কিন্তু নজর পড়ল ঠিকই। সুখরামের ওই মূর্তির কথা ধনঞ্জয় জানে, আরও কয়েক-জন খবর রাখে। তারাই বলে বেড়ায়, ওফ, সে যা একখানা মূর্তি তার কাছে কিছুই লাগে না।
এইভাবে কথাটা পাঁচকান হল। লোকে আসে, সেই মূর্তিটার খোঁজ খবর নেয়। অনেকে দেদার টাকাও দিতে চায়। সুখরাম অবশ্য রাজি হয় না।
একদিন সুখরাম দুপুরবেলা আপনমনে একটা রোগা ছাগলের মূর্তি তৈরি করছে। হুঁশ নেই। হঠাৎ তার নজর পড়ল তার সামনে দু'খানা সুন্দর পা। সে চোখ তুলল। তার সামনে মূর্তিটা দাঁড়িয়ে। সুখরাম হাঁ হয়ে চেয়ে দেখল, মূর্তির চোখের পলক পড়ল। মূর্তি একটু হাসলও। তারপর মূর্তি বলল, তোমার জন্য পুতুল থেকে প্রাণ পেয়ে জ্যান্ত হয়ে আসতে হল।
সুখরাম তোতলাতে লাগল, কথা বেরোলো না মুখ দিয়ে।
মূর্তি বলল, আমার একটা নাম দেবে না? কী নাম হবে আমার বলো তো!
সুখরামের কথা এমন বেধে গেল যে, সে লাল হয়ে উঠল, বিষম খেল। কাশতে লাগল।
দু'খানা পেলব হাতে তাকে ধরে তুলল মূর্তি। বলল, আমার নাম দাও মনোরমা, নামটা আমার খুব পছন্দ।
সুখরাম ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।
মূর্তি বলল, আমি তোমার কাছে কি হিসেবে থাকব বলো তো? একটা তো সম্পর্ক চাই, নাকি?
আড়াল থেকে ধনঞ্জয় বলল, ও বাবা, এ যে সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড, যাই গিয়ে পুরুত-মশাইকে ডেকে আনি।
তারপর সুখরামকে দাড়ি কাটতে হল, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হতে হল, ভাল জামাকাপড়

পরতে হল। দেখা গেল, সুখরাম আসলে অতি সুপুরুষ এক যুবক। মনোরমা কনের সাজে যখন বিয়ের পিঁড়িতে বসে তার চোখে চোখ রাখল তখন সুখরামের রূপ দেখে তারও চোখের পলক পড়ে না।
রাত্রিবেলা মনোরমা এক ফাঁকে তার কানে কানে বলল, সেদিন ওরকম পাগলে পাগলে চেহারায় দেখেছিলুম বলে তোমার সঙ্গে কথা কইনি।
তুমি যে এত সুন্দর তা জানলে কি আর অবহেলা করতুম?
সুখরাম অবাক হয়ে বলে, কোন্‌দিন বলো তো?
মনোরমা অবাক হয়ে বলে, কেন, আমাদের সেই চড়ুইভাতির দিন।
সুখরাম চমকে উঠে বলে, তুমি তাহলে আমার সেই মূর্তি নও?
মনোরমা হেসে ফেলে, মূর্তি হতে যাবো কোন দুঃখে, ঠাট্টাও বোঝো না? তোমার মূর্তি যেমনকে তেমন আছে।
সুখরাম গিয়ে দেখল, বাস্তবিকই তাই। সেই মূর্তি যেমন ছিল তেমনই রয়েছে।
মনোরমা পরে তাকে বলল, চড়ুইভাতির দিন থেকেই কেন যেন মনটা খারাপ। বাড়ি ফিরে গিয়ে শান্তি পেলুম না। বারবার মনে হচ্ছিল পাগলটাকে নিয়ে ওরকম হাসাহাসি উচিত হয়নি। তারপর একদিন তোমার নাম শুনে তোমার গড়া মূর্তি দেখতে এলুম। তুমিই যে সুখরাম কি করে জানবো বলো। তোমাকে দেখলুম, তোমার গড়া আমার মূর্তি দেখলুম। তারপর ঠিক করলুম, আমাকে যে এত ভালবাসে তাকে ছেড়ে আমি থাকব কি করে?
সুখরাম বলল, তুমি আমাকে খুব ভালবাসো?
খুব। আমার চেয়ে কেউ তোমাকে বেশি ভালবাসে না।
হঠাৎ ঘরের বাইরে থেকে তৃতীয় একটা কণ্ঠস্বর বলে উঠল, মিথ্যে কথা। ওকে আমিই সবচেয়ে ভালবাসি।
মনোরমা চমকে উঠে বলে, মেয়েটা কে গো?
সুখরাম গিয়ে দরজা খুলে অবাক। মনোরমা। ঘরের মধ্যেও মনোরমা, দরজার বাইরেও মনোরমা। এ কী কাণ্ড।
বাইরের মনোরমা ঘরে এসে ঘরের মনোরমার দিকে চেয়ে বলল, খুব যে সোহাগ দেখাচ্ছো, এতদিন কোথায় ছিলে বাপু? ও যে তিল তিল করে আমাকে গড়ল এত ভালবাসা দিয়ে, যত্ন দিয়ে, কত গোপন কথা বলল আমার কানে কানে সে সব মিথ্যে হয়ে যাবে?
মনোরমা আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠে বলল, কে তুমি?
আমি ওর মনোরমার সেই মূর্তি। তোমাদের আদিখ্যেতা দেখে আর থাকতে পারলুম না। এরপর যা হল তা সাংঘাতিক কাণ্ড। দুই মনোরমায় প্রচণ্ড ঝগড়া। এ ওকে স্বীকার করতে চায় না, ও একে মানুষ বলেই গণ্য করতে নারাজ।
সুখরাম ভারী বিপাকে পড়ে গেল। সে কোনও মনোরমাকেই অস্বীকার করতে পারে না।
সেই থেকে সুখরামের সুখ বলতে আর কিছু নেই। বাড়িতে দু-দুটো মনোরমা দিনরাত খেয়োখেয়ি, ঝগড়া করে। সুখরামের আবার দাড়ি গজাল, জামাকাপড় নোংরা হল, হাতে পায়ে সবসময়ে মাটির দাগ। সে পুতুল গড়ে আর পুতুল-

দের সঙ্গে কথা কয়।
বুড়ো একটা মূর্তি হঠাৎ বলে উঠল, নাঃ আর তো সহ্য হয় না।
সুখরাম খুব অবাক হয়ে বলে, কী সহ্য হয় না?
বুড়োটা খ্যাঁক করে উঠে বলে, তোমার বাড়িটায় আগে বেশ শান্তি ছিল। কেন যে বিয়ে করতে গেলে সেটাই বুঝলুম না। না হে, এখানে আর পোষাচ্ছে না। যাই গিয়ে অন্য জায়গায় ব্যবস্থা দেখি।
সুখরামের চোখের সামনে দিয়ে বুড়োটা হেঁটে চলে যেতেই একটা যুবতী মেয়ে পিছন থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠল, তোমাকেও বলিহারি যাই বাপু। কবে থেকে হা-পিত্যেশ করে তোমার জন্য বসে আছি, আর তুমি হঠাৎ আমাকে ছেড়ে আর একজনের সঙ্গে আশনাই শুরু করে দিলে। কেন, আমি কি ফেলনা? একসময় তো আমার সঙ্গেও অনেক ভাব ভালবাসার কথা বলেছো!
কোণ থেকে একটি কিশোরীর মৃন্ময় মূর্তি একটা লাফ মেরে বেদী থেকে নেমে এসে মুখ ভেঙিয়ে বলল, ইঃ রে, সুখরাম গেছে তোমার মতো গেছো মেয়ের সঙ্গে ভাব করতে!
তোমাকে চিনিনা নাকি বিদিশা? এই তো ক'দিন ধরে দেখছি ওই বলরামের সঙ্গে গুজগুজ ফুসফুস করতে। তোমার মতো নষ্ট চরিত্র দুটি আছে? সুখরামের সঙ্গে যদি সত্যিকারের কারও ভালবাসা থেকে থাকে তবে সে হল আমি।
বলরাম নামের মূর্তিটাও বিরক্ত হয়ে বলে, বাস্তবিকই বিদিশা, তুমি কিন্তু আমার সঙ্গে বিরাট বিশ্বাসঘাতকতা করছো।
এই গণ্ডগোলে আরও কয়েকটা মূর্তি এগিয়ে এল। বেশ চেঁচামেচি এবং হৈ চৈ হতে লাগল। চুলোচুলি, কিল চড়ও চলতে শুরু করল।
সুখরাম একটা ন্যাড়ামাথাওয়ালা দৈত্যের মূর্তি তৈরি করেছিল অনেকদিন আগে। হাতে প্রকাণ্ড মুগুর। এতক্ষণ সেটা চুপচাপ ছিল। হঠাৎ প্রাণ পেয়ে জেগে উঠে সে মুগুর নাচিয়ে হুংকার দিল, ওরে বোকারা তোরা ঝগড়া করে মরছিস কেন? এইসব গণ্ডগোলের মূলে হল ওই সুখরাম। চল সবাই মিলে ওটাকে ধরে ঠ্যাঙাই।
এই বলে দৈত্যটা মুগুর তুলে তেড়ে এল। সঙ্গে অন্য সবাই।
সুখরাম হঠাৎ বিপদের গন্ধ পেয়ে চোঁ চোঁ দৌড়তে লাগল।
লামডিঙ জায়গাটা সুখরাম বিলক্ষণ চেনে। সে নানা পথে, নানা কায়দায় পালিয়ে বেড়াতে লাগল।
কিন্তু মুশকিল হল, পুতুলেরা সংখ্যায় অনেক। তারা নানা পথে তাকে ধাওয়া করতে থাকে। বিভিন্ন পথের মোড় তারা আটকাতে লাগল, যাতে সুখরাম পালাতে না পারে।
পালাতে পালাতে এসে সুখরাম বুঝতে পারল, আর পালানোর পথ নেই। সামনেই সেই কুঞ্জবন, যেখানে সে বসে থাকতে ভালবাসে। সে কুঞ্জবনে ঢুকে পড়ল।
সামনেই একটা বেদী। বোধহয় সুখরামেরই কোনও মূর্তিকে এখানে বসানোর জন্য পূর্বপিতারা বেদীটা তৈরি করিয়েছেন।
সুখরামের মাথায় চড়াক করে একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সে এক লাফে বেদীর ওপর উঠে সটান মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে গেল।

ওদিকে সুখরামকে খুঁজতে তার মূর্তিরাও সেই কুঞ্জবনে এসে হাজির। তাদের মধ্যে এই মনোরমাও আছে।
সুখরামকে বেদীর ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সবাই চেঁচিয়ে উঠল, ওই তো সুখরাম, চলো ওকে ধরে জিজ্ঞেস করি কোন আক্কেলে ও আমাদের বানাতে গিয়েছিল।
দৈত্য সবার আগে এসে সুখরামের সামনে দাঁড়াল। তার পেটে একটা খোঁচা দিয়ে দৈত্যে বলল, কি হে সুখরাম, কেমন বুঝছো? এবার পালাবে কোথায়?
সুখরাম জবাব দিল না।
সবাই চেঁচাল, ও ভান করছে! ওকে টেনে নামাও।
দৈত্য হঠাৎ ঝুঁকে সুখরামের চোখ নাক মুখ শরীর সব পরীক্ষা করে মাথা নেড়ে বলে, না হে, ভান করছে না।
তার মানে?
দৈত্য একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, সুখরাম সত্যিই মূর্তি হয়ে গেছে। প্রাণ নেই।
একথা শুনে চারদিকে একটা কোলাহল উঠল। তবে কোলাহলটা আস্তে আস্তে থেমেও গেল। কারণ সবাই একে একে পরীক্ষা করে দেখল, বাস্তবিকই সুখরাম আর সুখরাম নেই। সে মূর্তি হয়ে গেছে।
সুখরামের গড়া পুতুলেরা সবাই বিজয়-উল্লাসে চারদিক ছড়িয়ে পড়ল। তারা আর পুতুল নেই. সবাই আসল মানুষ এবং জীবজন্তুতে রূপান্তরিত হয়েছে। আশ্চর্য জায়গা লামডিঙে তারা মহা সুখে বসবাস করবে। দুই মনোরমাও দিব্যি তাদের সঙ্গে ভিড়ে গিয়ে আনন্দ করতে লাগল।
বেচারা সুখরাম নট নড়ন নট চড়ন দাঁড়িয়ে রইল বেদীর ওপর।
পরদিন লামডিঙ ভেঙে পড়ল সুখরামের মূর্তি দেখতে। সবাই একবাক্যে বলল, হ্যাঁ, সুখরাম নিজের যে মূর্তিখানা বানিয়েছে সেখানাও তার সারা জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ। এরকম মূর্তি দুনিয়ায় কেউ কখনও দেখেনি। কিন্তু কবে বানাল, কবে এসে চুপিচুপি মূর্তিখানা এখানে রেখে গেল তা কেউ বলতে পারল না। সুখরামের হাঁটুতে একটা মশা এসে বসল, মাথায় একটা কাক। সুখরাম তাদের তাড়ানোর জন্য হাতখানাও তুলতে পারল না। প্রস্তরীভূত সুখরাম মনে মনে শুধু বলল, শ্রেষ্ঠ কাজ না কচু!

নিজের ঠেলা নিজেই ঠেলা

—সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

আমরা কি কম বুদ্ধিমান। আমরা দুটোই রেখেছিলুম। মটর গাড়ি আর ঠেলা গাড়ি। বৈদ্যুতিক পাখা আর হাতপাখা। গ্যাস আর তোলা উনুন। গোবর আমাদের নৈবেদ্য। ঘুঁটে আমাদের শ্রেষ্ঠ কারুশিল্প। আমরা ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। আর হবই বা না কেন? যে দেশে এত ঋষি মহাপুরুষ জন্মেছেন, যে-দেশের মোড়ে মোড়ে জ্যোতিষীদের আখড়া, এ-পাশে, ও-পাশে দুটো লাইন, কেরোসিন তেলের আর হাত দেখাবার, সে-দেশের মানুষ নিজেদের দূর ভবিষ্যৎ দেখতে পাবে না তো কে পাবে। আমরা জানতুম পেট্রল নামক পদার্থটি একসময় আর পাওয়া যাবে না। দিনে দিনে দাম বাড়বে। অবশেষে মধ্যপ্রাচ্যে তেল নিয়ে একটা ধুন্ধুমার কান্ড হবে। আর তেলের মালিকরা নিজেরাই নিজেদের পায়ে কুড়ুল মেরে বসে থাকবে। কুয়েতের তৈল-কূপে ইরাকিরা আগুন দিয়ে গেছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন—বছর তিনেক ধরে জ্বলবে। পেট্রল হল তরল সোনা। সোনার লড়াই কোনও দিন শেষ হবে না। আমরা সাত্ত্বিক, শান্তিপ্রিয় জাতি। দু'চারটে কৃষ্ণের জীব রোজই খুনটুন হয়। পাঞ্জাবে, কাশ্মীরে কি অসমে, অথবা পশ্চিমবাংলার নানা জেলায়, কলকাতায়, হাওড়ায়। সে হল গীতার প্র্যাকটিকাল ক্লাস। মানুষ মরেও না, জন্মায়ও না। আত্মা ফুটো করা যায় না, ফাঁসানো যায় না, পোড়ানো যায় না, গলানো যায় না। সেই বোধে বোধি হবার জন্যেই রোজ আমরা দু'দশটা লাশ ফেলি। যুদ্ধ, বিগ্রহের মধ্যে আমরা নেই। যারা কেরোসিনই পায় না, তারা আশা করবে পেট্রল! আমাদের শাস্ত্র আমাদের শিখিয়েছেন অর্জন নয় বর্জন। একসময় মহাহট্টগোল হয়েছিল এই শহরে, ঠেলা, রিকশা, গরুর-গাড়ি, এইসব চলবে কেন! মডার্ন হচ্ছে। আমেরিকা অ্যাটম ফাটিয়েছে। চাঁদে চক্কর মারছে। মহাকাশে যাচ্ছে পিকনিকে। আমেরিকার নিউজার্সি'র টার্নপাইক রোডে একসঙ্গে বিশ সারি গাড়ি ছোটে। মসৃণ রাস্তা বেগে ধাবমান অটোমোবিল, এই তো হল উন্নত সভ্যতার আদল। আমরা কম কীসে। আমরা নিউক্লিয়ার পাওয়ার-স্টেশান করব। প্রতিটি গ্রামে বৈদ্যুতিক আলোর ফোয়ারা ছোটাব। ব্যস্ত শহরের চওড়া রাজপথ ধরে সত্তর কি. মি. বেগে ছুটবে মটর, বাস। টাইম ইজ মানি। এমনকি এ-ও শোনা গেল, ট্রামকেও বিদায় করা হবে। কলকাতার মতো শহর। সেই শহরে টিকির-টিকির গাড়ি চলতে পারে না। নিউইয়র্ক'র পরেই কলকাতা, না কলকাতার পরে নিউইয়র্ক, এই নিয়ে সেমিনারও হয়ে গেল।

অলক্ষ্যে হাসলেন ভাগ্যদেবতা। তিনি জানতেন, এ-দেশের ভাগ্য কী। বেশি লপচপাবি ধাতে সইবে না। টেমির আলো, রাম-রাবণের যুদ্ধ, হরিনাম সংকীর্তন, জন্ডিসের মালা, ভূতে ধরা, ওঝার ঝ্যাঁটা, বর্ষার কাদা, মশার ভ্যান ভ্যান, ম্যালেরিয়া, বয়েল গাড়ি, তেচাকার রিকশা, পঞ্চায়েতের ঘোঁট, বধূ নির্যাতন, পরস্পরের কাছা ধরে টানাটানি। এই হল যুগপ্রবাহ। এরই নাম, চলছে, চলবে। এই পরিবেশে কোন ধরনের যানবাহন মানাবে? অবশ্যই গরুর গাড়ি। ঠেলা। সাইকেল ভ্যানও বেমানান। মহাভারতের যুগের রথ কোনওমতেই নয়; কারণ তা রাজশক্তির প্রতীক।

তাছাড়া ঘোড়ার প্রয়োজন। প্রয়োজন উন্মুক্ত প্রান্তরের। রাজশক্তিকে আমরা যখন বিদায় করেছি, রাজবাহন আমরা ফেরাই কোন আক্কেলে।
একটা হতে পারে, রাজ্যের যাঁরা শাসকবর্গ তাঁরা তো রাজন্যগোষ্ঠীর। তাঁরা রথে চাপতে পারেন। রথে চেপে রাইটার্সে, কি অ্যাসেমব্লিতে। মুখ্যমন্ত্রীর রথের মাথায় থাকবে সোনার তবক মোড়া ছাতা। টুল টুল করে দুলবে। লাল পতাকা উড়বে পতপত করে। সাইরেনের বদলে বাজবে রামশিঙ্গা। কে বাজাবেন? নিজের শিঙ্গা নিজে বাজালে ক্ষতিটা কি? নিজের ঢাক নিজে পেটানোর মতো। আর একটা শব্দ আছে—শিঙ্গা ফোঁকা। শিঙ্গা ফুঁকে দাও, মানে সব শেষ। তা প্রায় সেইরকম একটা অবস্থাই তো এসে গেছে। বক্তা আর প্রবক্তা ছাড়া কারই বা ফুসফুসের তেমন জোর! ফুঁয়ের জোর। ফুঁ মেরে যাঁরা সব উড়িয়ে দিতে পারেন, তাঁরাই ফ্রন্ট-র‍্যাঙ্কার। সমস্যা, সমাধান, মারো ফুঁ। ঝাড়ফুঁক। পদযাত্রা তো প্রায়ই হবে, তখন মন্ত্রিমণ্ডলীর বিভিন্ন আকারের রথ, সেই মহামিছিলের শোভা বর্ধন করবে। এমনও মনে হতে পারে, রামরাজত্ব বুঝি এসেই গেছে। আমরা সব মহাবীরের দল। পাঁউরুটির বদলে চাঁপা কলা খেতে খেতে মিছিলে সামিল হব মাঝে মাঝে বলব; রাম নাম সত্য হ্যায়। দূরদৃষ্টি কাকে বলে? একেই বলে। মটর তো আর পথে থাকবে না, থাকবে ঘুগনিতে। পরিকল্পনাটা না জেনেই চিৎকার, চেঁচামেচি, বিক্ষোভ, লেখালিখি। কী অভিযোগ! রাস্তার এই হাল কেন? কেন সারানো হয় না। কী আশ্চর্য কথা। রাস্তার কোনও প্রয়োজন আছে? গরুর গাড়ির দুলকি চলনের জন্য যা যা, প্রয়োজন তা-ই করা হচ্ছে। ভুল করে দক্ষিণ কলকাতার দিকের পাতাল-রেলটা হয়ে গেছে। দুর্ভাগ্য সেই অঞ্চলের মানুষের। আমেরিকার প্রাচুর্যে অসুস্থ মানুষের উদ্দাম গতির পীড়ায়। তবে কথা এই, ব্যাধি সেরে যাবে। ডাক্তার বদ্যির অভাব নেই। অসুখের মূলে তাঁরা পেঁছে যাবেনই। অসুখের উৎস হল পাওয়ার প্ল্যান্ট। প্ল্যান্ট মানে আগাছাও হতে পারে। সেই আগাছা নির্মূল করতে পারলেই আরোগ্য। উত্তরে আমরা ঠিক সময়ে চেপে ধরতে পেরেছি। খেল খতম! মাটির তলায় ধনতন্ত্র ঢুকছিল। ধনতন্ত্রের হর্টিকালচার। সুড়ঙ্গ পর্যন্ত আমরা সহ্য করেছি। তারও কারণ ছিল। আমাদের দূরদৃষ্টি। এক নম্বর, আমেরিকা যদি আমাদের বারোটা বাজাবার জন্যে নাপামের সম্ভার নিয়ে তেড়ে আসে, তাহলে আমরা উত্তর কলকাত্তাইরা সব সিঁধিয়ে যাব। ওইখান থেকে আমরা আমাদের স্কাড ছাড়ব। আমাদের স্কাড হল বক্তৃতা আর শ্লোগান। মাঝে মধ্যে ওপরে উঠে এসে, একটা করে কুশপুত্তলিকা দাহ করব। পেট্রলের অভাব থাকলেও খড়ের অভাব নেই। নাটকও করব, যুদ্ধবিরোধী নাটক। আমাদের অস্ত্র হল গর্ত আর সংস্কৃতি। আর বলদ আমাদের আদর্শ। কলুর বলদ, সংসারের বলদ, হালের বলদ। সেই কারণেই আমরা বলদর্পী। দুনম্বর, ওই সুড়ঙ্গে আমরা খাটাল করব। খাটা পায়খানা করব, মাছের বাজার, স্মাগলড্ গুডসের বাজার বসাব। গরুরগাড়ি বা ঠেলায় চেপে যখন অফিস যাব তখন গায়ে একটু বিলিতি সেন্টের ফ্যাস-ফোঁস লাগবে। বলদের গায়ে একটু স্প্রে করে ভাবব-বিলিতি বলদ। আমাদের 'ফো'
প্রীতি কে না জানে। আমাদের সংবিধান বিদেশি, আমাদের মতাদর্শ বিদেশি
মান্য চিন্তাবিদ, রাজনীতিবিদরাও বিদেশি। দেশের ঠাকুর কক্কে পায়
আর মাত্র কয়েকটা দিন। তলানি তেল যে-টুকু পড়ে আছে শেষ হ'

মজা। একটু বড় মাপের প্যারাম্বুলেটার মন্দ হবে না। ম্যানেজিং ডিরেক্টর অফিসে যাবেন, কি কোনও আই এ এস সেক্রেটারি। অফিসের গাড়ি এসেছে, না বলে, বলা হবে প্যারাম্বুলেটার এসে গেছে। কে ঠেলবে? ঠেলার লোকের অভাব হবে না। দেশে উমেদার আর চামচার অভাব নেই। লাইসেন্স আর পারমিটের লোভে অধিকর্তার প্যারাম্বুলেটার ঠেলবেন, টনটনিয়া, ঠনঠনিয়া, অগ্রবাল, কোই বাত নেহি। কাম কে লিয়ে। ইনকামট্যাক্সের বড়কর্তার প্যারাম্বুলেটার ঠেলবেন ট্যাক্সপেয়ার। সারাটা পথ একই বুলি—একটু দেখবেন স্যার, একটু দেখবেন। সেকালের পালকি বেহারারা সর্বক্ষণ মুখ করত, হুঁহুম না, হুঁহুঁম্ না। সেই শব্দটাই বদলে গিয়ে হবে—একটু দেখবেন, একটু দেখবেন স্যার—এই তো আমাদের পেট্রল। এই তো আমাদের তেল। অন্যের তেলেই তো আমাদের গাড়ি চলে। দাদাদের প্যারাম্বুলেটার ঠেলবেন চামচারা। কোই বাত নেই। আর ট্রাক ড্রাইভারদের ঠেলবেন ট্রাফিক-পুলিশ। তাঁদের জন্যেই তো সর্বাধিক ভাবনা। রোজগার একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে।

লরিই তো মা লক্ষ্মী। দেখতে দামড়ার মতো। চালকের ইয়া গোঁফ। মাথাটা মানুষের মতো, কিন্তু বুদ্ধিতে দানব। সবই মানছি; কিন্তু মা লক্ষ্মী। যত জ্যাম তত কামাই। লরি গেলে রইলটা কী। আর যখন আমরা বয়েল গাড়ি নিয়ে পথে নামবো তখন কি ট্র্যাফিক পুলিশের প্রয়োজন হবে?

আমি সেই দিনের কথা ভাবছি—ক্যালকাটা ক্লাবে পার্টি, মিস্টার মিটার আসছেন উত্তর কলকাতা থেকে। মিস্টার অ্যান্ড মিসেস। আসছেন গরুর গাড়িতে। তখন হয়তো মটর-বিলাসিতার মতো গরুরগাড়ির বিলাসিতা চালু হবে। পয়সা আছে আমার, গাড়িকে সেইভাবে সাজাব। বাঁশের বদলে পলিথিনের পাইপ দিয়ে তৈরি হবে চালি। ছই বোনা হবে। বহুবর্ণের প্লাস্টিক কেস দিয়ে। রাজস্থানের শিল্পী এসে নকশা তুলবে। চালির ওপর রবার ফোম, তার ওপর মখমল। সেলফ ড্রাইভিং-এর মতো মিস্টার মিটার নিজেই বুলক কার্ট ড্রাইভ করবেন। পিছনে কম্পিউটার নাম্বার 02-469/B. C. বি সি মানে বুলক কার্ট। এইচ, সি মানে হ্যান্ডকার্ট। স্ট্যাটাস দেখাবার জন্যে বাবুরা গরুর গাড়ির চাকায় মনোনিবেশ করতে পারেন। ভাল মিস্ত্রি এনে কোনারকের চাকার মডেলে চাকা তৈরি করাতে পারেন। কারুকার্যমণ্ডিত। টায়ারের দামও তো কম ছিল না। টায়ার আর টায়রার দাম তো প্রায় একই। এমনও হতে পারে বড় বড় টায়ার কোম্পানি উঠে না গিয়ে নানা ডিজাইনের গরুর গাড়ির চাকা তৈরি করবেন! তারই বিজ্ঞাপনে টিভি মাত হবে। বিদেশি টিম আসবে ফুটবল খেলতে।

দৃশ্যটা ভাবলেই পুলকিত হয়ে যাচ্ছি। তলায় একটি বাহারি লণ্ঠন দুলছে। শহর কলকাতায় কোনও পথঘাট নেই। নেই কোনও স্ট্রিট, রোড, লেন। শুধু কাপ-কোদলানো প্রান্তর। মিস্টার অ্যান্ড মিসেস ড্রাইভ করে যাচ্ছেন। নতুন মডেলের বুলক কার্ট বি. সি. টেন। পয়সা আছে। তাই গরুকে মারার ছপটির হাতল হাতির দাঁতের [illegible]। মাঝে মাঝে গরুর লেজ মলতে হবে। গাড়োয়ানরা যা করেন আর কি। সেই [illegible] গরুর লেজ শ্যাম্পু করা। ক্যাটল শ্যাম্পু বিশেষ এক ধরনের কণ্ডিশনার [illegible] চুলেও শ্যাম্পু গরুর লেজেও শ্যাম্পু। কোই বাত নেহি।